বান্দা

সমরেশ বসু

পরিবেশক :

মডার্ণ কলাম

১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

তৃতীয় সংস্করণ ঃ অক্ষয় তৃতীয়া, বৈশাখ '৬৪/১লা মে '৫৭
নিতাই দাস। অমৃতধারা
৩৫ ডি, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬
দুলালচন্দ্র জানা। নিউ গঙ্গামাতা প্রিণ্টিং,
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬
বিভূতি সেনগুপ্ত

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

ইতিহাস থেকে কোন চরিত্র বা ঘটনা নিয়ে লিখলেই তা ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় কি না, তা জানি না। তবে 'বান্দা' উপন্যাসের উৎপত্তি একটি ইতিহাস বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতেই।

একদা শান্তিনিকেতনে, বন্ধু বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকেতনে, অবসর যাপনের অলস দুপুরে, তাঁর বইয়ের আলমারি থেকে, একটি ইতিহাসের বই বেছে নিয়ে পড়ছিলুম। শান্তিনিকেতনেরই বাঙলার অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়-এর লেখা, 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর। স্বাধীন সুলতানদের আমল।' সময়কে চিহ্নিত করা হয়েছে, খ্রীষ্টাব্দ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮।

অনেক চমকপ্রদ ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে, বিশেষ করে, এই উপন্যাসের যে নায়ক, মাহমুদশাহী বংশের সুলতান জলালুদ্দীন ফতে শাহ্-এর খাওয়াজা সেরা, খোজা প্রধান বারবক আমাকে বিশেষভাবে কৌতূহলিত করে তোলে। ইতিহাসের লেখা থেকে মনে হয়, লোকটা সম্ভবত বাঙালী ছিল। কারণ তাকে 'বারবক বাঙালী' বলা হত। সে ছিল অসুরের মতো বিশাল স্বাস্থ্যের অধিকারী। অথচ খোজা। তার কোন পিতৃপরিচয় বা জন্ম বৃত্তান্ত জানা যায় না। প্রাসাদের সমস্ত চাবি থকেতো তার কাছে। নিয়মানুযায়ী পাঁচ হাজার নায়েক বা পাইক তার অধীনে কাজ করতো।

এই নায়েকদের সঙ্গে, এবং আরো অনেক বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী অসামাজিকদের সহযোগিতায়, একদিন রাত্রে সে সুলতান ফতেহ্ শাহ্‌কে খুন করে। নিজেকেই সুলতান বলে ঘোষণা করে।

লোকটা ক্লীব, অথচ ক্ষমতালোভী, কিন্তু ভীরুও বটে। ফলে, যা সে অর্জন করে, তা ধরে রাখতে পারে না। অন্যান্য ক্ষমতালোভীদের হাতে তাকেও নিহত হতে হয়। এই সব মিলিয়ে, ইতিহাসের সত্যের থেকেও, চরিত্র ও ঘটনার, একটা অন্য অর্থপূর্ণ দিক যেন ভেসে ওঠে। একটা অন্য সংকেত এবং ইশারা, যা আমাকে, আমার যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করায়। এ লোকটাকে যেন বর্তমান যুগেও দেখতে পাই। চেনা চেনা মনে হয়। শুধু পরিস্থিতি পরিবেশ সময় চেহারা পোষাক ইত্যাদি বদলে গিয়েছে।

সেই জন্যেই, ঐতিহাসিকতার চেয়েও অন্য দিকের সংকেতকেই মনে মনে বড় করতে চেয়েছি, পেরেছি কি পারিনি সেটা বিচার্য।

স. ব.

শুয়োরের বাচ্চাটা যেন মনে লাগে জিম্মিই ছিল বা।

গাজীয়াতলীর জংলা মাঠে, গাছে ঝোলানো মৃতদেহটাকে লক্ষ্য করে, ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বলে উঠল। তার সন্দেহ, মৃতদেহ যার, সে হয়তো হিন্দু ছিল।

গাজীয়াতলীর এ জংলা মাঠ, গৌড় শহরের বাইরে। গঙ্গা নদীর দিকে যাবার একটি রাস্তার ধারে। যে রাস্তার দু-পাশেই; কাছাকাছি বিশেষ লোকালয় নেই। বরং অরণ্যের নিবিড়তা লক্ষিত হয়। আজ শহর এবং শহরের বাইরে থেকে, সকলেই গাজীয়াতলীর মাঠের দিকে ছুটে আসছে। সকাল থেকেই আসছে। মানুষের মন যেন এইরকম, তারা একটা ঘটনার গন্ধ পেলে, ছুটে দেখতে আসে। নিহত মানুষ, সে যদি রক্তাক্ত হয়, বীভৎস দেখতে হয়, তাকে দেখবার জন্যেই, ভয় ও ঘৃণাসহ কৌতূহলই যেন মানুষের বেশী। নইলে এই দুরন্ত রৌদ্রে উত্তপ্ত বাতাসের আগুনের ঝাপটা পেয়েও এত লোক কেন ছুটে আসছে। আজ কি সারা গৌড়-রাজ্যের বাদশাহী সীমানায় আর কেউ মরে নি? রোগে-শোকে, দুঃখে-জরায়, আজ কি কেউ মরে নি?

মরেছে নিশ্চয়। এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ আছে, যেখানে একটা দিনও মৃত্যুহীন গিয়েছে? কোন দেশ আছে, যেখানে সমাধিভূমি ও শ্মশানক্ষেত্র তার প্রত্যহের পাওনা পায় নি? দিল্লী থেকে শুরু করে আরবে, পারস্যে, মিশরে, চীনে এবং আরো দূরান্তে, তুরস্কে, রোমে, রাশিয়ার সুলতানদের দেশে। যেমন জন্মহীন দিন যায় না, তেমনি মৃত্যুহীন একটা দিনও কাটে না। কিন্তু সব মৃত্যু দেখতে লোকে ছোটে না। কারণ এই মৃতদেহ শুধু একজন, নিষ্ঠুরভাবে নিহতের নয়, শুধু রক্তাক্ত নয়। এই মৃতের হত্যার মধ্যে একটা অভিনবত্ব ছিল। এই মৃতের নাম গৌড়রাজ্যের সকলেই জানত, কেউ কেউ তাকে বেঁচে থাকতে চোখেও দেখেছিল,

তার সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত আর বিচিত্র সংবাদ রাখত। তাই এই মৃতদেহ দেখবার জন্যে সকলের মধ্যে শুধু কৌতূহল নয়, প্রবল উত্তেজনাও ছিল।

——আটশো নিরানব্বুই হিজরায়, এই এক গ্রীষ্মের দিনে, গৌড়ে এরকম একটা রক্তপাতের ঘটনা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা, দম্ভ আর ষড়যন্ত্রে, রাজকীয় হত্যা তো সাধারণ ঘটনা মাত্র। নিহতের রক্ত কোথায় নেই এই গৌড়ে। গৌড় রাজ্যের সীমানায় ফতেহাবাদ থেকে নশরতাবাদ, সোনারগাঁ থেকে সাতগাঁ, পান্ডুয়া থেকে ঘণ্টেশ্বর, কোথায় নেই? রাজপ্রাসাদ থেকে রাজপথের ধুলায়, রক্তের দাগ সর্বত্র। একটু মন খুঁটিয়ে দেখলেই হয়, রক্তের দাগ চোখে পড়বেই। সেই সাতশো উনচল্লিশ হিজরায়, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের সময় থেকে (১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ), পিতা-পুত্র-ভ্রাতা, আমীর, ওমরাহ, উজীর, অমাত্য, ক্রীতদাস ও হাবশী, দেশের এবং বিদেশের সৈন্য সকলের প্রাণ নিয়েছে, রক্তপাত করেছে! গৌড়ের সবখানেই রক্ত গৌড়ের গঙ্গা থেকে বুড়িগণ্ডকের স্রোতে তা ভেসে গিয়েছে। শুধু সাতশো উনচল্লিশ হিজরা কেন লক্ষ্মণাবতীতে বক্তিয়ারের প্রথম কোপ থেকেই রক্তের ফিনকি ছুটছে। রাজনীতি আর রক্ত, এ তো একনিশ্বাসের উচ্চারিত শব্দ। নারী আর পুরুষের মত দুজনের সম্পর্ক। দুয়ের মধ্যে গভীর গাঢ় প্রেম। দুঁহু দোহার একই অঙ্গ, রাজনীতি আর রক্ত। আর আজকের এই গাছে লটকানো মৃতের রক্তই শেষ রক্ত নয়। মানুষের ক্ষমতার উচ্চাশার শেষ, এই পৃথিবীর মহাকালের কোন লগ্নে লেখা আছে, কে জানে।

কিন্তু মৃতদেহ একটা নয়, আরো তিনটি মৃতদেহ কাছাকাছি গাছে একরকম ভাবেই ঝোলানো রয়েছে। সেগুলিও রক্তাক্ত এবং দেখেই বোঝা যায়, তার মধ্যে দুটি দেহ হাতি দিয়ে থেঁতলানো। এমনভাবে ফেটে চেপটে দলা পাকানোর মত হয়ে গিয়েছে, ওগুলো হাতি লেলিয়ে মারারই লক্ষণ। গৌড়ের লোকেরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। এখন, কাকে কী ভাবে মারা হয়েছে, ওরা দেখলেই বুঝতে পারে।

কিন্তু একটি মৃতদেহের দিকেই সকলের লক্ষ্য বেশী। যাকে দেখে ভিড় থেকে বলতে শোনা গেল, 'শুয়োরের বাচ্চাটা যেন মনে লাগে জিম্মি ছিল বা।'

আর একজন জবাব দিল, 'জিম্মি না, বান্দাটার ছুন্নত হয়েছিল দেখা যাচ্ছে।'

—ঠিক ঠিক। তাই তো, তাই তো।

একসঙ্গে কয়েকজন বলে উঠল। মৃতদেহটি প্রায় উলঙ্গই হয়ে গিয়েছে। তার কোমরের নিচে থেকে কোন আবরণই ছিল না। উরতের কাছ থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটি তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের আঘাতের দাগ। রক্ত শুকিয়ে সেখানে জমাট বেঁধে গিয়েছে, রক্তের রং কালো হয়ে উঠেছে। ঊর্ধাঙ্গও আবরণহীনই বলতে হবে। কেবল কোমরের কাছ থেকে রুপোর একটা বিছেহার বন্ধনীর সঙ্গে সেলাই করা রেশমী কাপড়ের একটি টুকরো, বাঁ কাঁধের ওপর পর্যন্ত জড়ানো। দেখে মনে হয়, রেশমী পোশাকটায় সোনার কাজ করা ছিল, কিংবা মণি-মুক্তো গাঁথা ছিল। ছেঁড়া সুতো আর ফুটো ফুটো দাগ রয়েছে। পোশাকটা এমনভাবে ছিঁড়ে নিয়েছে, মৃতের বিশাল স্বল্প রোমশ বুক নাভিস্থলের মাঝখান থেকে যেন ভাগ-করা, মেদহীন পেশল পেট সবই খোলা। যেন হিংস্রভাবে কেউ দু হাত দিয়ে খামচে তার পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছিল, কিংবা তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে টেনে নিয়েছিল। মৃতের শরীর শুধু প্রকাণ্ড নয়, মজবুত এবং বলিষ্ঠ। গোটা শরীরটা যেন রক্তিম মাকড়া পাথরে গড়া। বুকে এত বেশী রক্ত জমে আছে, ঠিক কতগুলি অস্ত্রাঘাত হয়েছে, বোঝা যায় না। সম্ভবত অনেকগুলি। কারণ, বুকের মাঝখানটা একটা মস্ত ক্ষতের মত দেখাচ্ছে। গোঁফ-দাড়িবিহীন মুখেও ছোট-খাট অস্ত্রের দাগ রয়েছে। হাতেও অস্ত্রের দাগ রয়েছে। সম্ভবত লোকটা মরার পরে, বা মৃতবৎ অবস্থায় কেউ অস্ত্র দিয়ে খুঁচিয়ে উল্টেপাল্টে দেখেছিল।

লোকটার গায়ের রঙ দেখে বোঝা যায় না সে পাঠান বা আফগান ছিল কি না। পাঠান বা আফগান হলে, আর একটু উজ্জ্বলবর্ণ হত। লোকটা হাবশীও নয়, কারণ সে কালো নয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলতে যা বোঝায়, তাই। অনেকটা গৌড়ের মানুষের মতই তার রঙ। বড় বড় চুলের রঙ কালো। নিষ্প্রাণ স্থির চোখ তার খোলা। চোখদুটি আয়ত ছিল, মণিদুটিও কালো। কাছ থেকে দেখলে নাকে একটি বিঁধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন মেয়েদের থাকে নাকছাবি পরবার জন্যে। চোখে সুরমার দাগও আছে। মুখে অস্ত্রের দাগ থাকলেও বোঝা যায়, দেখতে সে মন্দ ছিল না। কানেও তার ফুটো রয়েছে, এবং সম্ভবত কানে সে কোন আভরণ পরত। হয়তো দামী মুক্তো কিংবা হীরে ছিল, যা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। কারণ তার কানের ছিদ্রদুটি ছেঁড়া রক্তাক্ত। দু হাতের কনুইয়ের ওপরে দুটি শাদা দাগ রয়েছে। বোধহয় চওড়া সোনার আভরণ সে ব্যবহার করত। খুলে নেওয়া হয়েছে তাই দাগ দেখা যাচ্ছে। যেমন অনেকদিনের পরা আংটি খুলে নিলে, আঙুলে দাগ পড়ে। আঙুলে তার একটি আংটি এখনো রয়েছে। কিন্তু তা সোনা নয়। দামী

পাথরখচিতও নয়। নিতান্তই তামা বা পিতলের ওপর একটি কালো পাথর রয়েছে। কালো পাথরের বুকে কিছু যেন খোদাই করা রয়েছে।

গাজীয়াতলীর উত্তপ্ত বাতাসে মৃতদেহটি দুলে দুলে উঠছে। বড় বড় চুলগুলিও উড়ছে। বাতাসে ধুলো উড়ছে। মৃতদেহে ধুলো পড়ছে। কনুইয়ের কাছে যেখানে অলঙ্কারের দাগ রয়েছে, দুই কনুইয়েরই সেখানে লোহার কড়ায় দড়ি বেঁধে, দু দিকের ডালে টেনে বেঁধে দিয়েছে।

কিন্তু লোকটা যে খোজা ছিল, ওর দেহ দেখে, সেটাও অনুমিত হয়।

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বলে উঠল, 'বান্দাটা কার ছেলে ছিল ?'

—কে জানে ? ওর বাপের নাম কেউ জানে না।

—ওকে কি সুলতান রুকনুদ্দিন শা বাইরের থেকে আনিয়েছিল ?

—তা কী করে হবে, ও তো হাবশী নয়। আমাদের সেই পেয়ারে সুলতান তো হাজার হাজার হাবশী আনিয়েছিল।

কে একজন বলে উঠল, 'কিন্তু ও যে বাঙালী সেটা সবাই জানত।'

আর একজন বলল, 'হ্যাঁ, ওকে সবাই "সুলতান শাজাদা বাঙালী" বলত।'

—কিন্তু মুর্দাটার বুকের ছাতি দেখেছ, শালা বুড়ো বটের গুঁড়ির চেয়ে মোটা।

—আর লম্বা ? যেন হাবশীদেরও ছাড়িয়ে যায়।

এইভাবে নানান জনে নানান কথা বলছে, আর দেখছে। কিন্তু বেশী কাছে কেউই যাচ্ছে না। কারণ কয়েকজন অশ্বসওয়ার হাবশী সেনানী চারিদিকে চক্র দিয়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে; ঘোড়ার দুলকি চালে তারা গাছে ঝোলানো মৃতদেহ গুলির কাছে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছে; আর মৃতদেহের গায়ে থু-থু করে থুতু ছিটিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জনতা চীৎকার করে হাততালি দিয়ে উঠছে। চীৎকার করে বলছে 'ওই কুত্তার বাচ্চাটা আমাদের ফতে শাকে খুন করেছিল। ওর হাতগুলোন এখনো কেন আস্ত রাখা হয়েছে ?

কে একজন আর্তনাদের মত চীৎকার করে উঠল, শাহ সুলতান জলালুদ্দীন আবুল মুজঃফর ফতে শা অল্-দুনিয়া ওয়াল-দীন! তিনি আমাদের কত সুখে রেখেছিলেন।'

আর একজন চীৎকার করে বলল, 'তিনি ছিলেন খলীফৎ আল্লাহ !'

তিনি আল্লার প্রতিনিধি ছিলেন। আবার একজন বলে উঠল, 'জিল্-আল্লাহ ফি অল্-আলামিন !'

ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্তির জন্যে আগের সুলতানকে ধার্মিকেরা এই উপাধি

দিয়েছিলেন। তারপরে সবাই জলালউদ্দীন ফতে শার আলোচনায় মেতে গেল। তাঁর সময়ে কী রকম চাষআবাদ হয়েছে, ফসলের দরের ওঠা-নামা কেমন গিয়েছে, কার্পাসের ফলন কী পরিমাণ হয়েছে, এই সব নানারকম কথা। তাঁর সময়ে সুদিন গিয়েছে, সবাই সুখেই ছিল, এই তাদের বক্তব্য। তাতে প্রমাণ হয়, তিনি সত্যি পুণ্যবান সুলতান ছিলেন।

একজন বলে উঠল, 'দু সাল আগে, মাত্র একবার খোদার বে-দোয়া হয়েছিল। শুধু একবারই, ফতে শার আমলে আসমানে পানি ছিল না, জমিনে কিছু পয়দা হয় নাই। মড়ক হয়েছিল, আদমি জানোয়ার বেবাক হালাল হয়েছে। দু সাল আগে আমার চারটে গাই খড়-খইল না পেয়ে মরে গেছিল, বড় ব্যাটার তিন বিবিই খতম হয়েছিল।'

এক দাড়িওয়ালা বুড়ো বলল, 'আর তারপরেই তো নওদ্বীপের জিম্মিদের ঘরে সেই ছেলেটা জন্মাল। আমি তখন নওদ্বীপে ছিলাম। পণ্ডিতের নাম জগরনাথ মিশির। তার ছেলে, নাম দিয়েছে বিশ্বম্ভর। কেউ বলে নিমাই, নিমগাছের তলায় জন্মেছে বলে। জিম্মিদের গণকেরা বললে, এই ছেলে রাজা হবে। এই ছেলে ভগবানের অংশ, সে জগৎ উদ্ধার করবে, তাই নাম দিলে বিশ্বম্ভর। চারি-দিকে জিম্মিরা সব বলে বেড়াতে লাগল, এবার নাকি পানি হবে, চাষ-আবাদ হবে, আর গৌড়ে কাফের রাজা হবে। খবরটা আমিই গিয়ে দিয়েছিলাম নওদ্বীপের ওয়ালিকে। ওয়ালি খবর-টবর নিয়ে জানিয়েছিল সুলতানকে।'

একজন বলল, 'তার সাজাও পেতে হচ্ছে কাফেরগুলোকে। কাজীর মার খেয়ে শালারা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে।'

সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো আবার বললে, 'আর ফুলিয়ার সেই হরিদাস, জিম্মিরা বলে জবন হরিদাস, তার কথা তোমরা শুনেছ বাপজানেরা?'

কয়েকজন এক সঙ্গে বলে উঠল, 'খুব, খুব। ব্যাটাকে তো মুলুকপতি বাইশ-বাজারে নিয়ে গিয়ে বেজায় পিটিয়েছিল। ব্যাটা মুসলমান হয়ে কি না হিন্দুদের মত কিষ্ট কিষ্ট হরি হরি বলে, আবার কাঁদে।'

বুড়ো বলে, 'তবু দেখ, কাজীর কথায় মুলুকপতি যখন হরিদাসকে মোর দরিয়ার পানিতে ফেলে দিল, তাতেও লোকটা মরল না। আবার ফিরে এসে কিষ্ট নাম করতে লাগল। তাতেই তো মুলুকপতির টনক পড়ল। হরিদাসকে বললে, তোমার কিষ্ট নাম সচ্চা নাম। তোমাকে আর আমি কোন দিন কিছু বলব না। তুমি আমাকে মাপ করে দাও।'

শ্রোতারা অবাক হয়ে শুনল। একজন বলল, 'আচ্ছা, এরকম হয় কী করে?'

বুড়ো বলল, 'পুণ্যিতে। এরা সুলতানী চায় না, সুলতানশাহী বোঝে না। এরা সুলতানের সুলতানকে পেয়েছে! কাজীর বিচারই সব নয়।'

এবার সবাই বুড়োর দিকে একটু সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। সুলতানের সুলতান বলে কাউকে তারা বলতে চায় না। বলা যায় না, কে কী শুনবে, আর গর্দানটা যাবে।

আর একজন বলল, 'কিন্তু সাচ কথা, নওদ্বীপের ছাওয়ালটা হবার পরে পানি হয়েছিল গত সালে, ময়দান থৈ-থৈ, বহুত দানা তুলেছে সবাই।'

একজন বিদ্রূপ করে বলে উঠল, 'তার জন্যে জিম্মির ছাওয়াল জন্মাবার দরকার হয় না। এটা আল্লার দোয়া। সুলতানের পুণ্যি।'

ইতিমধ্যে হঠাৎ ঘোড়সওয়ার হাবশীরা ধুলো উড়িয়ে জনতার গায়ে এসে পড়ল প্রায়। একজন চুপিচুপি বলে উঠল, 'এই দেখ, বাঁদীর বাচ্চারা আসে কোথায়।'

কিন্তু হাবশীরা থামল না। কোমরবন্ধের সঙ্গে তলোয়ার খাপের ঝনঝন শব্দ তুলে ওরা জনতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল। জনতা সরে দাঁড়াল, দুদিকে সরে গিয়ে পথ করে দিল। কালো হাবশীরা আরক্ত চোখে সকলের দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেল। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল, 'কাকে খুঁজছেন হুজুর?'

হাবশীরা জবাব দিল না।

একজন ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, 'চাঁদমুখী বিবিকে।'

কয়েকজন হেসে উঠল। একজন বলল, 'জরুর ওই নোকরাটার কোন দলের লোককে খুঁজছে।'

অর্থাৎ সেই মৃতের, যাকে ওরা সুলতান শাজাদা বাঙালী বলছিল, যে মৃতদেহ-টির কাছেই ভিড় বেশী। একজন বলল, 'আমি শুনেছি, ইবরাহিম ডাকাতটা নাকি গোলামটার দলে ঢুকেছিল।'

—ডাকাত ছাড়া কাদের সঙ্গেই বা মিশবে ও? কোনদিন হয়তো দেখতাম ইবরাহিম শালা আমীর হয়ে বসেছে।

—কিন্তু ওর সাহস হল কি করে ফতে শাকে মারবার?

—আমি জানি, ওমরাহেরা ওকে অনেক মাথায় তুলেছিল।

—অথচ কুত্তাটা তো ছিল খাওয়াজা-সেরা। সুলতানের বেবাক মহলের চাবি থাকত ওর কাছে, রাত্রে পাঁচ হাজার নায়েক নিয়ে, সুলতানকে পাহারা দিত। যদি আমীর ওমরাহ হত, তা হলেও একটা কথা ছিল।

—ও তো একটা বান্দা ছিল। গোলাম।

—ওকে সবাই বারবক বলে ডাকত। ওই নাকি ওর নাম ছিল।

একজন খিস্তি করে বলল, 'শালা বারবক না ইয়ে বক। বারবক একজনই ছিল. সে আমাদের রুকনুদ্দিন বারবক শা। ইয়া আল্লা! অমন সুলতান আর হয় না।'

—কিন্তু রুকনুদ্দিন শা একটু জিম্মি-ঘেঁষা ছিল। শুনেছি, হারেমে নাকি খুবসুরৎ একটা জিম্মি-বিবি ছিল, সে মন্তর তন্তর জানত। বাদশাহকে সে গুণ করেছিল।

একজন বলল, 'আচ্ছা, এই গোলামের বাচাটার তো হারেমে যাবারও হুকুম ছিল?'

—ছিল বৈ কি! ও তো খোজা।

—এঃ, শালা অনেক কিছু দেখেছে। আমি যদি একবার সুলতানের হারেমটা দেখতে পেতাম। ওঃ দুনিয়ার সবসেরা খুবসুরৎ বিবিতে নাকি সেখানে গিজগিজ করছে। পাঠানী. আফগানী. পারসী. আরবী. তুর্কী, আর হিন্দুস্তানীর তো কথাই নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। একজন জবাব দিল. 'তবে যা, হবি মিঞার কাছে যা, খোজা করে দেবে তোকে. তারপর হারেম পাহারা দিতে পাবি।'

হাসাহাসি করল সবাই। বারবকের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে একজন বলল, কিন্তু ওকে ঠিক খোজা বলে যেন মনে হচ্ছে না আমার। আমি তো দেখছি. সবই আমাদের মত। অবিশ্যি একটু অন্যরকম আছে।

কিন্তু সুলতান অত বোকা ছিলেন না। সব খোজাকে মাসে একদিন করে দেখা হত, ব্যাটা খোজা আছে না আবার মরদ হয়ে গেছে। কভি কভি নাকি ওরা আবার পয়দা করবার ক্ষমতা ফিরে পায়। হয়ে গেল তো, জান খতম। নিজে থেকেই তোমাকে আগে কবুল করে দিতে হবে।'

গাজীয়াতলীর মাঠে ছুটে আসা এইসব লোকের গালগল্প আলোচনার কোন স্থিরতা ছিল না। এক এক দল. গুচ্ছে গুচ্ছে হয়ে এক একরকম আলোচনা করছিল। গাজীয়াতলীর জংলা মাঠের আকাশে শকুনেরা উড়ছিল। মানুষের ভিড় দেখে, তারা মৃতদেহ চারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না। জীবজন্তুকে তাদের ভয়, মৃতরা তাদের আহার। কিন্তু কাকগুলি মানুষ-ঘেঁষা। ওরা মাঝে মাঝে এসে মৃতদেহগুলির মাথায় বা কাঁধে কিংবা লোহার কড়ার সঙ্গে টেনে বাঁধা ডানার ওপরে

বসেছিল। কাকেরা বোধহয় চোখ খেতে ভালবাসে, অথবা নাক বা কানের ছিদ্র। ওদের লক্ষ্য সেদিকেই। মৃতদেহগুলির ঘাড় সামনের দিকে নুইয়ে পড়েছে। বুকের কাছে একেবারে গুঁজড়ে পড়ে নি। বোধহয় অনেকক্ষণ পড়েছিল বলে, সমস্ত গ্রন্থি ও সন্ধি শক্ত হয়ে গিয়েছে। সমস্ত শরীরগুলিই শক্ত হয়ে গিয়েছে। কবর দেবার সময় যেমন হয়। ভিতরে রক্ত জমে গেলেই, মানুষের শরীর আর কাঠ, একই কথা। কিন্তু গাজীয়াতলীর খোলা মাঠের দুরন্ত বাতাসে যেহেতু মৃতদেহগুলি দুলে দুলে উঠছে, কাকগুলি সেইহেতু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ঠোকরাতে পারছে না। দোলা লাগলেই ভয় পাচ্ছে। অথবা গায়ে এসে বসলেই একদল লোক চেঁচিয়ে উঠল 'খা খা, নফরাকে খা।' কাকেরা মানুষের উৎসাহের ভাষা বুঝতে পারছে না বলেই ভয় পাচ্ছে, আর উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসছে। কাছের গ্রাম থেকে অনেক কুকুরও এসেছে। কিন্তু মানুষের ভিড় ডিঙিয়ে, মৃতদেহগুলির কাছে যেতেও পারছে না। যেতে পারলেও অবিশ্যি লাভ নেই কারণ দেহগুলি তাদের নাগালের থেকে অনেক উঁচুতে।

একজন বলল, 'আচ্ছা ফতে শাকে ও কীভাবে খুন করেছিল ? বিষ দিয়ে নাকি ?'

—হতে পারে, ও তো খাওয়াজা-সেরা ছিল, দরবার হারেম, গোটা সুলতানি ইমারতের সবখানেই তো ওর যাবার হুকুম ছিল।

আর একজন বলল, 'একজন নায়েক (পাইক) আমাকে বলছিল, ছুরি দিয়ে মেরেছে।'

আর একজন বলে উঠল, 'না না, আমি শুনেছি ফতে শা যখন ঘুমিয়েছিলেন, কমিনাটা তখন তাঁকে গলা টিপে মেরেছে।'

—সব বাজে কথা।

অন্য একজন বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ও নিজের হাতে মারেই নি। ওর হাতে যে পাঁচ হাজার নায়েক ছিল, তারা কয়েকজন গিয়ে মেরেছিল। সুলতান তখন দশটা বিবির কোলের ওপর শুয়েছিল। নায়েকরা তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল সুলতানকে।'

—এই লোকটার কথায় ? এই হারামীটার হুকুমে ?

সবাই বারবকের মৃতদেহের দিকে তাকাল। অনেকেই তখন তাকে জীবন্ত কল্পনা করার চেষ্টা করল।

আর এক জায়গায় তখন আলোচনা চলছিল, কে বারবককে মেরেছে। একজন বলল, 'আমি শুনেছি, হাবশী আমীর ফিরুজা ওর সঙ্গে লড়াই করে মেরেছে।'

—আমি শুনেছি, হাবশী হাবস খাঁ মেরেছে।

—তুমি ছাই জান। সিদ্দিবদরের সঙ্গে ওর লড়াই হয়েছিল দরবারের মধ্যে।

—তবে যে কে বললে, মালিক আন্দিল ওকে খুন করেছে?

—না না, তুর্কী ওগ্রাশ খাঁ মেরেছে।

এক বৃদ্ধ রোদের জন্যে মাথায় ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। সে ঢাকা খুলে বলল, 'আরে আজকালের মধ্যেই তো জানা যাবে। এবার যে সুলতান হবে, জানবে সে-ই নফরটাকে মেরেছে।'

—সাচ্চা। যে সুলতানকে মারে, সে-ই সুলতান হয়।

এর ওপরে বাজি ধরার কথা বলতে লাগল সবাই। এর পরে কে রাজা হবে, তাই নিয়ে সবাই হাবশী আমীর ওমরাহদের এক একজনের নাম করতে লাগল। কেউ বাজি ধরল মুরগী, কেউ খাসী। কিন্তু হাবশী-প্রধানদের মধ্যেই যে কেউ সুলতান হবে, এ বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ হাবশীদের মধ্যেই কেউ সুলতান শাহাজাদাকে মেরেছে, এটাই সকলের বিশ্বাস। আর তারা এখন দলে ভারী, ক্ষমতাও তাদের অনেক বেশী। যদিও ফতে শা নাকি নিজেই খুব ভয় পাচ্ছিলেন হাবশীদের। তাই বেশীর ভাগ সময় ওদের, জিম্মিদের ছোট ছোট রাজাকে শাসন করার জন্যে রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। আর সকলের হালচালের খবর নিজেই রাখতেন।

সেই বৃদ্ধটির দাড়ি উড়ছিল। মস্ত লম্বা দাড়ি, মনে হচ্ছিল দাড়ির ঝাপটাতেই উড়ে যাবে। সে আবার বলল, হয়তো এই খোজাটাকে হাবশীরাই উসকে দিয়েছিল।

কয়েকজন তার দিকে ফিরে তাকাল। কারণ, হাবশীদের সম্পর্কে এরকম কথা বলার সাহস এখন আর কারুর নেই। বিশেষ করে হাবশী ঘোড়সওয়াররা যখন চারিদিকে টহল দিচ্ছে। দু চারজন পাঠান এসেছে। কিন্তু তাদের তেমন যেন কোন কিছুতে উৎসাহ নেই।

একজন বলে উঠল 'কে জানে, কে কাকে উসকে দিয়েছিল। হাবশী আর পাঠান যে খুশি সুলতান হোক। আমাদের দু মুঠো খেতে পেলেই হল।'

—যা বলেছ।

কিন্তু বৃদ্ধ তবু মুখ বন্ধ করল না। সে আবার বলল, 'শাহীর পর শাহী এল, আর চলে গেল। আলাউদ্দীন আলী শাকে মেরে শামসুদ্দীন ইলিয়াস সুলতান হয়েছিল। শুনেছি সে ব্যয়রামে মরেছিল। তারপর তো খালি খুন আর খুন। সিকন্দর শা সুলতানকে মেরেছিল তার ছেলে লড়াইয়ের ময়দানে,

ারে নিজে রাজা হয়েছিল তার নাম গ্যায়াসুদ্দীন আজম শা। সে তার সতাতো াইদের সকলের আঁখ উপড়ে নিয়েছিল। কিন্তু সে ছিল খলীফৎ আল্লাহ। অয় খাদা। সুলতানশাহী আর খুনের দরিয়া, একই রাস্তায় বেয়ে চলে। তারপরে নই জিম্মি, সেই কাফের গণেশ, শয়তান হিন্দু অজ-উমরাএ (অমাত্য), আজম শাকে তম করেছিল, তার ব্যাটা হমজা শাকেও খুন করেছিল—সয়ফুদ্দীন হমজা শাকে, ার একটা গোলামকে ডেকে নিজের হাতে তাকে রাজা করে দিল। খতম য়ে গেল ইলিয়াসশাহী...।'

কয়েকজন অল্পবয়স্ক জোয়ান ছোকরা, বুড়োর ঘড়ঘড়ে গলায় একটানা সুরে লে-যাওয়া কাহিনী শুনছিল। যদিও মৃতদেহগুলির দিকেই তাদের দৃষ্টি ও মন ানিছিল তবু পুরনো দিনের কথাও শুনতে ইচ্ছে করছিল তাদের। একজন লে উঠল, 'আপনি তো বড় মিঞা সব জানেন দেখছি। আচ্ছা, বলেন তো, ্যাসুদ্দীন সুলতান নাকি মস্ত গজল গানেওয়ালা ছিলেন ? সাচা নাকি।'

উত্তপ্ত ঝোড়ো বাতাসে বুড়োর দাড়ি ঝাপটা মারছিল নাকে চোখে। হাত দিয়ে াড়ি মুঠো করে ধরে বলল, 'সাচাই গো ব্যাটা। তবে গানেওয়ালা না, বানানে- য়ালা। সে কিচ্ছা পরাণকথার (রূপকথার) মতন। হারেমে সুলতানের তিনটি পয়ারের মেয়েমানুষ ছিল। ভারী খুবছুরত। তা সে হারেমে তো অমন অনেক মেয়েই থাকে। কিন্তু সেই তিনজন গ্যায়াস শাকে খুব সেবা করত, ভালবাসত। াচাই পীরিত ছিল। তাদের নাম ছিল, গুল, সরব, লালা। একবার গ্যায়েসের ারী ব্যামো হয়েছিল, মনে হয়েছিল ওয়াক্কা হয়ে যাবে বা। তখন গুল, সরব আর ালাকে ডেকে বলেছিল, "আমি মলে তোমরা তিনজনে আমাকে চান করিয়ে দও।" এ তো শরীয়তের বিধেন, মলে পরে মরা শরীরকে আপনজনেরা াহায়।...কিন্তু সুলতান বেঁচে গেল। ব্যামো সেরে গেল, কিন্তু হারেমের যত মেয়েমানুষ, সব লাগলে সেই তিনজনের পিছুতে, সরব, গুল আর লালার পছুতে। দিনরাত টিটকারি আর ঠাট্টা। বলতে লাগল, তারা সবাই যখন মরবে, খনও সরব, গুল আর লালা তাদের কবরে যাবার আগে চান করাবে। · তা একদিন ্যায়াসের মেজাজ যখন বেশ ভাল, তিনজনে জানালে, হারেমের সব মেয়েরা তাদের টটকারি দেয়। সুলতান সে কথা শুনে তখুনি মুখে মুখে, এক কলি গজল ানিয়ে ফেললে তিনজনের নামে। কিন্তু আর মেলাতে পারলে না। ডাক পড়ল ালেকুশ শোয়ারার (রাজকবি)। সেও সেই ফারসী গজলের কলি মেলাতে পারলে া। হাজির করা হল দরবারের যাবত কবি আর গাইয়েদের। কেউ পারলে না।

সুলতান থামবার পাত্র নয়। ইরান মল্লুকের হাফিজের তখন খুব নাম। এই গৌড়েও তার নাম কেউ কেউ তখন জানত। সুলতানের দরবারে ছিল ইরানী গজল গাইয়ে। হাফিজের গজল সম্বল করেই সে এসেছিল। সুলতান নিজের বানানো কলি লিখে, ইরানের শিরাজ শহরে লোক পাঠিয়ে দিলে, কলি মেলাবার জন্যে। হাফিজ সেই কলি পেয়ে পুরো একখানি গান লিখে এখানে পাঠালে।

এক ছোকরা বলে উঠল, 'সেই গজল গানটা কী ছিল বড় মিঞা, বলতে পারেন?'

বুড়ো ঘাড় নেড়ে বলল, 'না হে ছাওয়াল. আমি তো বলতে পারি না। কিচ্ছাটা শুনেছিলাম, সেই গজল কখনো শুনি নাই।'

আর একটি ছোকরা বলল, 'বড় মিঞা যে উলেমা। উলেমারা গজল শোনে না।'

উলেমা হল পণ্ডিত আর ধার্মিক ব্যক্তি। ছেলেরা ঠাট্টা করছে কি না, বুড়ো তা দেখল না চেয়ে। সে তখন নিচু ঘড়ঘড়ে গলায় বলছিল, 'গ্যায়াসের হাতে তার বাপজানের রক্ত ছিল, ভাইয়েদের রক্ত ছিল, তবু তার হাত দিয়ে গজলের কলি বেরিয়েছিল। মানুষ খোদার মর্জি কিছুই বুঝতে পারে না।'…

এই সময়ে একটা প্রবল চীৎকার উঠল চারদিক থেকে, 'ধর, ধর, ধর।'

দেখা গেল, জঙ্গলের দিক থেকে কখন দুটি শিয়াল নিঃসাড়ে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে গুটি গুটি পায়ে মৃতদেহ ঝোলানো গাছতলায় গিয়ে, মাথা উঁচু করে দেখছিল। ঠিক সেই সময়েই মানুষ আর কুকুরদের নজর তাদের ওপর পড়তেই, সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল। মানুষের চীৎকার আর কুকুরের ঘেউঘেউ। কয়েকটা কুকুর তীরবেগে ছুটল। হাবশী অশ্বারোহীরাও তাদের অনুসরণ করল। একজন হাবশী তার হাতের বর্শা ছুঁড়ে মারল শিয়ালকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্য ব্যর্থ হল।

একজন চীৎকার করে বলল, 'মড়াগুলোনকে নামিয়ে দিলেই তো হয়, শেয়াল-কুকুরে খেত আমরা বেশ দেখতাম।'

—ঠিক ঠিক।

অনেকে সায় দিল, এবং এই গোলমালের ফাঁকে, অনেকে মৃতদেহগুলির কাছে এসে পড়েছিল। হাবশীরা বেগে ছুটে এল সেদিকে। সবাই ছুটে ধাক্কাধাক্কি করে পিছিয়ে এল আবার। বলে উঠল, 'এই দেখ, ঢাল খাঁড়া নিয়ে ঘাড়ের উপর আসে। শালারা মাতঙ্গ।'

একজন বলল, 'কিন্তু আমাদের তাড়ায় কেন? আমরা কি মড়া খাব? হাবশীরা এখানে চক্করই বা দিচ্ছে কেন? দুশমনগুলোন তো সব মরেই গেছে।'

আর একজন জবাব দিল, 'আমাদের দেখাচ্ছে। দুশমনকে কী রকম সাজা দিয়েছে তাই আমাদের দেখাচ্ছে।'

অন্য একজন বলল, 'বারবক্যা শালার দলের লোকেরা যদি থাকে এখানে, আর দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে যদি মড়াগুলো নিয়ে চলে যায়, সেজন্যে হাবশীরা পাহারা দিচ্ছে।'

কে একজন জবাব দিল, 'বিলকুল বাজে কথা। মড়া নিয়ে দলের লোকেরা কী করবে?'

—কবর দেবে। কিন্তু বারবককে ওরা কবর দিতে দেবে না।

—তবে কী করবে?

—এমনি ঝুলে থাকবে, পচে গেলে কঙ্কাল হয়ে থাকবে। মাটিতে ঠাঁই পাবে না। পাপীরা কখনো মাটিতে জায়গা পায় না।

—সাচা বলেছ, মিঞা, সাচা বলেছ।

অনেকেই সায় দিল। সেই বুড়ো সুলতান শাহজাদার দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলল, 'পাপী! ও পাপী, গোরে গিয়ে শুতে পাবে না। ও ফতে শাকে খুন করেছে। কিন্তু যে রাজা হয়, সে-ই খুন করে, তখ্‌তের এই না শরীয়ত!'···

সূর্য ইতিমধ্যে কিছুটা পশ্চিমে টাল খেয়েছে। এতক্ষণ মৃতদেহগুলির উপর গাছের যে সামান্য ছায়া দুলছিল, এখন তা অপসারিত। রৌদ্রচ্ছটায় রক্তাক্ত দেহগুলি যেন চকচকিয়ে উঠছে। জমে যাওয়া রক্ত শজনের আঠার মত দেখাচ্ছে, যেন দলা পাকানো পাথরের গায়ে রোদ ঠিকরে পড়ছে। মাঝে মাঝে উড়ন্ত শকুনেরা এত নিচে নেমে আসছে যে তাদের ছায়া পড়ছে নিহত শবগুলির গায়ে। মাছিরা যে প্রাণহীন দেহগুলিকে ছেঁকে ধরেছে, রোদের আলোয় তা লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদ অনুযায়ী তারাই আকাশে গিয়ে হয়তো শকুনদের খবর দিয়ে এসেছে। কিন্তু মাছিরাও আকাশে নিজেদের নিরাপদ মনে করছে না। কারণ বাতাসের ঝাপটা তাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, দেহগুলি দুলছে। তারা কামড়ে পড়ে থাকবার চেষ্টা করছে।

গাজীরাতলীর এই দুস্তর মাঠ ও জঙ্গলকে, দুঃসহ পশ্চিমা উত্তপ্ত বাতাস যেন ঘাড় মুচড়ে দিচ্ছে, একটা অশুভ প্রেতের কান্নার মত শব্দ উঠছে, ধুলো উড়ছে, তাই এই পশ্চিমে মাথা-নোয়ানো দুপুরটাকে দারুণ, দুরন্ত মনে হচ্ছে। তবু ভিড় বাড়ছে। নগর থেকে লোকেরা সংবাদ পেয়ে, দল বেঁধে ছুটে আসছে। পানির পিঠে চেপে, গরুর গাড়িতে, পায়ে হেঁটে আসছে।

আসবেই, কারণ এরকম রাজকীয় মৃতদেহ গাছে ঝোলানোর দৃশ্য দেখবার লোভ কে সম্বরণ করতে পারে। একটা চোর নয়, একটা ডাকাত নয়, একটা সাধারণ বিদ্রোহী নয়, মৃতদের মধ্যে একজন রাজা। বারবক গতকালও গৌড়ের রাজা ছিল। গত কালও লোকটা শাহীমঞ্জিলের সোনামানিকে গড়া সিংহাসনে খোলা তলোয়ার নিয়ে বসেছিল, হয়তো রাত্রে নগ্ন যুবতীদের দেহের ওপরে ঘুমিয়েছিল। সুলতানেরা সে-রকম ঘুমোয়, প্রজারা তার গল্প শুনেছে। বারবক খোজা ; কে জানে ঈশ্বর তার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দিয়েছিল কি না। তার দেহ দেখে কিছুই স্থির নিশ্চিত বলা যায় না। তার আড়াই মাস রাজত্বের মধ্যে লোকে অনেক কথা শুনেছে। শুনেছে, কাঁটাদুয়ারের ইসমাইল গাজীর দরগায় নাকি সে হত্যে দিয়েছিল পুরুষত্ব ফিরে পাবার জন্যে। এবং স্বয়ং ইসমাইল গাজী তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। এ সবের সত্যি মিথ্যে সঠিক কেউ জানে না। তবে কাঁটাদুয়ারে যে রাজকীয় অর্ঘ্য পাঠানো হয়েছিল, এটা সকলেই জানে, সকলেই দেখেছে।

মোটের ওপর হারেমে সে সুলতানদের আদত নিশ্চয়ই রক্ষা করত এবং গতকাল রাত্রেও সে সুলতানদের মতই হয়তো রাত্রিবাস করেছিল। এইরকম একজন লোক, যে দরবারে বসে গত কালও ফরমান জারি করেছে এবং আজ সে গাছে ঝুলছে। এই মুহূর্তে, এখন গৌড়ে কেউ নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করে নি। হয়তো শাহী-মঞ্জিলে এখন সেই পরামর্শই হচ্ছে, কিংবা যে এই শাহজাদা সুলতান বারবককে মেরেছে, সে-ই নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করবে।

মোট কথা, লোকেরা জানে, একজন কেউ রাজা হবে। যারা রাজা হয়, এবং যারা রাজাকে মারে, তাদের সম্পর্কে বাঙালীরা কিছুই জানে না। এই রকম একটা ধারণা, যেন তাদের এইসব জানতে নেই। তারা জানতে চায় না, জানবার উৎসাহও নেই। একজন কেউ রাজা হবে, এটাই জানে। এই যুগে, এই পাঠানদের যুগে, সাধারণ মানুষ এর বেশী কিছু জানে না। একজন কেউ রাজা হবে। যে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করতে পারবে, সে-ই রাজা হবে। যেমন এই লোকটা হয়েছিল। এবং তাতে এদেশের লোকদের কিছুই যায় আসে নি। মসজিদে

সাঁজবেলায় নমাজের ডাক ঠিক সময়েই শোনা গিয়েছিল মুয়াজ্জীনের গলায়। তুলসীতলায় বাতি দেখানো হয়েছিল ও শঙ্খনাদও বেজেছিল। জলালুদ্দীন ফতে শার মৃত্যুর সময়েও তাই, এর বেলাও তাই। গৌড়ের কোথাও কোন পরিবর্তন বা গোলমাল হয় নি। তবে হ্যাঁ, গ্রামে একটা লোক মরলে, সবাই আলোচনা করে। একটা রাজা মরলে দেশের সবাই কথা বলে। খুন হলে লোকে একটু বেশী বলে। ফতে শার বেলায় সেইরকম বলেছিল। এর বেলায় লোকে ছুটে দেখতে এসেছে।

এটা একটু বিশেষ রকমের অভিনব ব্যাপার হয়েছে। বারবক সুলতান ছিল, অথচ তার ক্ষতবিক্ষত শব গাছে ঝুলছে, এরকম একটা দৃশ্য দেখবার জন্যে সকলেই ছুটে এসেছে। শোকব্যাকুল হয়ে নয়, করুণায় বিগলিত হয়ে নয়, সম্মান দেখাবার তো কোন প্রশ্নই নেই। এই রকম বিচিত্র ভয়ংকর নিষ্ঠুর কিছু হলেই মানুষ ছুটে আসে। লোকটা বারবক বলে কৌতূহল আরো বেশী। লোকটা রাজা ছিল।

অতএব, রাজার মৃত্যু বা নতুন রাজা হওয়াতে এ দেশে কিছু যায় আসে না। কেবল অনাবৃষ্টি হলে রাজার পাপ বলে মনে করে সবাই। বৃষ্টি হলে পুণ্য মনে করে। বেশী ঝড় ভূমিকম্প বা বন্যা হলে রাজার পাপ বলে গণ্য হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মড়ক হলে, রাজার প্রত্যক্ষ দুর্নাম হয়। আর ভাল ফসল হলে, খেতে-পরতে পেলে, পুণ্য মানে সবাই। সন্ন্যাসী দরবেশদের সম্মান দেখালে, রাজার নাম করে সবাই সুখ্যাতি করে। অন্যথায় রাজা এবং রাজকীয় ব্যাপারে জনসাধারণের কিছুই যায় আসে না। কেবল এইরকম একটা দৃশ্য দেখবার লোভে সবাই ছুটে আসছে।

গতকালের রাজা আজ গাছে ঝুলছে।

অবিশ্যি, একজন রাজা মরলে, আর একজন নতুন রাজা না হওয়া পর্যন্ত, সকলেই খানিকটা ভয়ে ভয়ে থাকে। ওটা একটা সংক্রান্তিকালের ভীষণ অশুভ মুহূর্ত। কারণ লুটপাটের সব থেকে উপযুক্ত সময় সেটাই। নালিশ করবার তো কেউ নেই। রাজা নেই তো নালিশ শুনবে কে? কাজী তো এখন নিজেই এ সময়ে পলাতক। কারণ, রাজা নেই, আর সে রাজার প্রতিনিধি হিসাবেই বিচার করে। যারা তার বিচারকে অবিচার বলে মনে করেছে, যারা তার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছে, তারা তো ঠিক এসময়েই শোধ নেবে। আর কোটাল তো নিজেই এ সময়ে লুট করে। এ সময়ে সবাই লুট করে। কেউ কেউ বলে উজীর আমীর ওমরাহ লস্করসেরা সবাই এরকম সময়ে, নিজেদের মধ্যে যুক্তি ও চুক্তি করে লুট করতে আরম্ভ করে। হয়তো, যে

নতুন রাজা হবে তার সঙ্গে অলিখিত চুক্তি অনুযায়ীই এটা ঘটে, এটা এক ধরণের ইনাম। নতুন লোককে রাজা করবার পুরস্কার।

সেইজন্যেই এক গাজীয়াতলীর মাঠে অনেক রকম লোকেরা ছুটে এসেছে, আসেনি নগরের বিত্তবানেরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা কিংবা জমীনদার মুকদ্দমেরা, যারা নগরের সুলতানী পরিবেশে বাস করবার জন্যে মস্ত মস্ত মঞ্জিলে থাকে। তারা ভয়ে ভয়ে রয়েছে হয়তো ইতিমধ্যেই মাটির তলায় ঘরের সব সোনা পুঁতে ফেলছে, মোহরের থলি গরুর গাড়িতে বোঝাই করে অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু যদি লুটপাটের সম্ভাবনা থাকে তবে অনেক আগে থেকেই আমীর ওমরাহদের অনুচরেরা নগর ঘিরে ফেলেছে, সকলের ঘরের কাছে প্রহরী বসে গিয়েছে। আজ তো সকাল থেকেই হাবশী সেপাই ও সেনারা নগরের চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। কে জানে কী হবে। যাদের ভাববার কিছু নেই, যাদের হারাবার বিশেষ কিছু নেই, সেই সব লোকেরাই গাজীয়াতলীর মাঠে ছুটে এসেছে। এখনো আসছে। এমন নয় কি যে, কেবল হিন্দুদের ধনদৌলত লুটপাট হবে। নগরে তো বেশির ভাগ মুসলমানেরই বাস। বর্ষায় বান এলে যেমন সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, রাজকীয় লুটপাট সেইরকম।

সেই বুকপর্যন্ত দাড়িওয়ালা বুড়োকে এক জোয়ান আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তারপরে কী হল? সেই কাফের গণশা একটা গোলামকে ডেকে সুলতান করে দিল?'

বুড়ো বলল, 'হ্যাঁ বাবা, একটা বান্দাকে রাজা করে দিল। তার নাম শহাবুদ্দীন —শহাবুদ্দীন বায়াজিদ শা নাম দিয়ে তাকে রাজা করেছিল, ও ছিল হিন্দু গণেশের হাতের পুতুল। গণেশ ওকে যা বলত, ও তাই করত। বে-ইমান শহাব। হজমা শাকে মারার জন্যে ও গণেশের দলে গেছল। তারপরে যখন দেখল, গণেশই আসলে রাজত্ব করছে, তখন বেঁকে বসল, আর কাফেরটা সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে ফেলল।'

—মেরে ফেলল?

—হ্যাঁ, একেবারে খতম। কিন্তু জিম্মিটা শেয়ালের থেকেও চালাক ছিল। শহাবকে মেরে ও নিজে রাজা হল না, শহাবের ব্যাটা আলাউদ্দীনের নামে নিশান দিল। কেন? না, তখনো ও ভাবছিল, হাওয়া ওর বাগে আসে নি। আর আলাউদ্দীন ছিল ছাওয়াল মানুষ। কয়েক মাস বাদে যখন গণেশ দেখল, হাওয়া ওর পালে, দিলে আলাউদ্দীনকে খতম করে।

—আলাউদ্দিনকেও?

—হ্যাঁ। চারটে সুলতানের খুন হাতে মেখে ও রাজা হয়েছিল। আর ঘুপচুপ খুন যে কত করতে হয়েছিল, তার হিসেব কেউ জানে না। আগের সুলতানেরাও ও রকম খুন করেছে। সুলতানশাহী খুন ছাড়া চলে না। তারপর গণেশ নিজেই রাজা হয়ে বসল। কিন্তু হলে কী হবে? তাকে মারলে তার নিজের ব্যাটা, সে ব্যাটা আবার মুসলমান হয়েছিল, নাম নিয়েছিল জলালুদ্দীন মোহাম্মদ শা। বাপকে মেরে ও সুলতান হয়েছিল, আর খাঁটি মুসলমানের মত রাজ্যপাট চালিয়ে গেছে। হরময়নে (মক্কা ও মদিনা) অনেক সোনা দিয়েছে, এখানে নিজে অনেক মসজিদ-মীনার গড়িয়েছে। ওকে সবাই বলত শাহ-ই-আলম। হঁ্যা, ও দুনিয়ার রাজার মত কাজ করছিল। আমার আব্বাজানের কাছে শুনেছি, লোকেরা সুখী ছিল তখন। ও অনেক লড়াই করেছিল, আর লড়াইয়ে জিতেছিল। আর অনেক জিম্মিকে ও মুসলমান করেছিল, এড়ার গোস্ত খাইয়েছিল। জিম্মিরা তখন কামতায় পালিয়ে গেছল।

—বেশ করেছিল, তা ঠিক করেছিল।

বুড়ো বলল, 'ঠিক। কিন্তু আবার একদিন হিন্দু রাজা হলে এর শোধ নেবে। রাজারা লড়াই করে, আর বিনা দোষে লোকেরা মরে। এটা ভাল নয় হে ছাওয়াল। আমি এই লোকটার কথা তাই বলছি, এই যে বারবক, সবাই ওকে পাপী বলেছে, বেচারী গোরেও ঠাঁই পেল না। কিন্তু রক্ত খালি ওর হাতে নেই, তামাম দুনিয়ার সুলতানদের হাতে রক্তের দাগ আছে। সুলতান হতে হলে, খুনের পিয়ালায় আগে চুমুক দিতে হয়। তবে হাবশীরা ওকে কেন গাছে ঝুলিয়ে দিল, ও কেন একটু মাটি পেল না।'

হাবশীদের কথা বলতেই আবার সবাই সচকিত হয়ে উঠল। সবাই সরে সরে যেতে লাগল, আর ভীরু চোখে ঘোড়সওয়ার হাবশীদের দিকে তাকাতে লাগল। কারণ, এটা এখন সবাই জানে, হাবশীরাই রাজ্যের প্রধান। তারাই কেউ বারবককে মেরেছে। আমীর ওমারহ-এর দলে ওরাই ভারী। আর চারিদিকেই কানাঘুষা চলছে, হাবশী গৌড়ের রাজা হবে। বাতাসেরও কান আছে। হাবশীদের কানে এসব কথা গেলে, নির্ঘাত গলা কাটা যাবে। কী দরকার এসব কথায় থাকার? হাবশী আর পাঠান, যে খুশি রাজা হোক গে। কার কী যায় আসে?

এক ছোকরা এবার টিটকারি দিয়ে উঠল, 'কিন্তু বড় মিঞা, এসব পুরনো খবর আপনি কার কাছে জানলেন? আপনার আব্বাজানের কাছে।'

—না গো ছাওয়াল। নসীর খাঁকে চেন তো, নসীর খাঁ, আরবী নসীর, ওর

কাছে একটা আরবী কিতাব আছে, হাতে লেখা কিতাব। কিতাবের নাম রেখেছে অল্-জও অল্-লামে লে-অহ্ল্ অল্-করন অল্-তাসে। সেই কিতাবে আমি সুলতানদের কথা পড়েছি।'

—বড় মিঞা আরবীও জানেন?

প্রশ্নের মধ্যে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠল। বুড়ো বলল, 'জানি, খোদার দয়ায় ওটা শিখেছি।'

একজন জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা তারপরে কী হল, সেই জলালুদ্দীনের পর কী হল। তাকে কে মেরেছিল?'

—তাকে কেউ মারে নি। তাকে আমি চোখে দেখেছি, যখন খুব ছাওয়াল ছিলাম। সে ব্যামোয় মরেছিল। তারপরে রাজা হয়েছিল তার ছেলে শামসুদ্দীন, শামসুদ্দীন আহম্মদ শা। ক বছরই বা রাজত্ব করেছিল? বছর তিনেক হবে। তারপরে একদিন রাত্রে তাকে মেরে ফেলল তার দুই গোলাম, শাদী খাঁ আর নাসীর খাঁ। মারল তো দুজনে কিন্তু রাজা হবে কে? রাজা তো একজনকেই হতে হবে। শাদী খাঁর মুণ্ডুটা কেটে দিল নাসীর। নিজেকে সে রাজা বলে নিশান দিলে, নাম নিলে নাসিরুদ্দীন মামুদ শা, সেই থেকেই তো এই মামুদশাহীর শুরু। তখন লোকে বলত, সেই নাসীর নাকি ইলিয়াসশাহীর বংশের ছেলে। কে তার হিসাব রাখে। লোকে বলত, শুনতাম। সুলতান, সে সুলতান! যে সুলতানকে মারে, সেই সুলতান হয়। কিন্তু মামুদশাহী চলছিল ভাল, খুন-খারাপি হয় নি। না ভাইয়ে ভাইয়ে, না বাপ ব্যাটায়। রুকনুদ্দীন বারবক শা মামুদশাহী সুলতান, জব্বর সুলতান ছিল। তাকেও আমি নিজের চোখে দেখেছি। এখনকার সবচেয়ে বড় আর সুন্দর শাহীমঞ্জিল, সুলতানের ইমারত। এটা রুকনুদ্দীন বারবক শা করেছিল, আর ওই দাখিল দরওয়াজা। জিল্ আল্লাহ্ ফি অল্ আলামিন, খলীফৎ আল্লাহ্ শাহ্ সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শা অল্-দুনিয়া ওয়াল-দীন! বহুত বহুত দিন সুলতানের গদী রক্ত খায় নি। এই বান্দার সুলতান হবার ইচ্ছে হল, আর তাই মামুদ-শাহী সুলতানকে ও খতম করেছিল। নইলে মামুদশাহীর কেউ খুন হয় নি এর আগে। এদেশে এমন সুখ আর কখনো হয় নি। বেশ ছিল সব। আবার দেখ কী হল, আবার কী শুরু হতে যাচ্ছে।'...

বুড়োর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আবার বলল, 'সুলতানশাহীর বড় খুনের পিয়াস!'...

বুড়োর দীর্ঘশ্বাস এবং রক্তের পিপাসার কথা কেউই তেমন হৃদয়ঙ্গম করতে

পারল না। সে একজন উলেমা, অন্তরে হয়তো দরবেশের মত ধার্মিক, তাই এই রকম কথা বলছে।

বুড়ো আবার বলে উঠল, 'ফতে শাও বড় রগচটা ছিল। শাহীমজ্লিলের মধ্যে তার খোলা তলোয়ার অনেকের শির নিয়েছে। ওরা এখন বারবককে মেরে সাধু সেজেছে, কিন্তু হাবশী উজীরের সঙ্গে সলাপরামর্শ না থাকলে কি এই বান্দাই সুলতানকে মারতে পারত? একটা খাওয়াজা-সেরার এত সাহস? কোথায় ছিল তখন সর-এ-খৈল-এর দল, জংদার ওয়া শিকদার মুআমলাৎ জোর বরোর ওয়ামুহল্লা-এ দীগারেরা সব? কোন ঠাঁই ছিল। মরাবৎ খান, আর জিম্মি উজীরের দল, আলমাস আর সিদ্দিবদর, এইসব হাবশীরা কি কেউ ছিল না ফতে শার কাছে? সবাই কি সীমানা পাহারা দিতে গেছল?'…

বুড়োর কথা শুনে সবাই ভীত চোখে তার দিকে তাকিয়ে দূরে সরে যেতে লাগল। একজন চাপা গলায় বলল, 'বড় মিঞার জান দেবার সাধ হয়েছে। আমরা ওসব কিছু জানি না বাবা, সব খোদাতল্লার মর্জি।'

আর একজন বলল, 'হ্যাঁ, ও সব রাজা-রাজড়ার কথায় অমরা নেই বাপু। এমনিতেই মনে হচ্ছে যেন গর্দানটা সুড়সুড় করছে।'

অন্য একজন বলল, 'আমার একটা ব্যাপারে খুব মজা লাগছে।'

—কী ব্যাপার?

—কাল যে রাজা ছিল, আজ তাকে কুত্তা বলছি, তাতে কেউ কিছু বলছে না, হিঃ হিঃ হিঃ।

কয়েকজন একসঙ্গে হেসে উঠল। কিন্তু সেই বৃদ্ধ আপন মনে বলেই চলেছে, 'অয় খোদা! রুকনুদ্দীন বারবক শাহের মত বাদশা, শেখ পিয়ারার শিষ্য দরবেশ শাহ জলাল দকীনীকেও খুন করে হাতে রক্ত মাখিয়েছে। যে সুলতান হয়, সে-ই রক্ত মাখে। তবে এই লোকটাকে কেন একটু মাটিতে ঠাঁই দিলে না? ওকে কেন নাঙ্গা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখলে?'

ঠিক এই সময়ে একটা প্রবল চীৎকার উঠল, 'খা, শুয়োরের বাচ্চাকে খা, গাজীর কিরা, খোদার হুকুমে, শালাকে ঠুকরে ঠুকরে খা।'…

চারদিক থেকেই চীৎকার শোনা গেল, 'খা খা খা। বান্দাটাকে খা'…

এবার বারবকের উপর দুটি কাক একসঙ্গে নেমে এসেছে। একসঙ্গে থাকলেই বোধ হয় ওদের সাহস বেশী হয়। ওরা হয়তো জোড়ের কাক-কাকিনী। এই কালো

কুৎসিত সর্বভুক কুম্বর পাখিগুলি মানুষের সব থেকে নিকটে থাকে, মানুষকে চেনে, বোঝে, যদিও অবিশ্বাস করে। এতক্ষণ গাছের ডালে বসে বসে, আকাশে উড়ে উড়ে ওরা যেন বুঝতে পেরেছে, এইসব ঝুলন্ত শবের মাংসে ওদের অধিকার আছে। তাই দুটো কাক এবার যেন দৃঢ়তার সঙ্গে নেমে এসেছে। বারবকের ওপরেই নেমে এসেছে। একজন বারবকের মাথায়, আর একজন কাঁধে। যদিও বারবকের দেহ বাতাসে দুলছিল, তবু কাক দুটো পালাল না। ওরা এখন নিশ্চিত হয়েছে এই মানুষটা মৃত।

যে কাকটা মাথায় বসেছিল, সে তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ ঠোঁট দিয়ে প্রথমেই একটা চোখ ঠোকরাতে আরম্ভ করল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নিশ্চয় বারবক বিস্ময়ে ও ভয়ে উদ্দীপ্ত চোখে তাকিয়েছিল। এখনো সে যেন সেরকমই তাকিয়ে আছে। তার চোখ খোলা, মুখ হাঁ করা। মাথায় বসা কাকটা প্রথমেই তার খোলা চোখের কালো স্থির তারায় আঘাত করল। হয়তো মনে করেছিল, চঞ্চুর এক কোপেই কালো মণিটা উপড়ে নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু তা পারল না বলেই, কয়েকবার পর পর আঘাত করল, এবং তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে ভিতরের গভীরে খোঁচাতে লাগল। যে কাকটা কাঁধে বসেছিল, সে বারবকের কষে শুকিয়ে-যাওয়া রক্তের হাঁ-মুখের ভিতরে জিভটা ধরে ঠোকরাতে লাগল। কয়েকবার নাসারন্ধ্র ছিন্ন করবার চেষ্টা করল।

লোকেরা যখন চীৎকার করে উঠল, উল্লাসে ফেটে পড়ল, তখন কাক দুটো চকিত ভয় ও সন্দেহের চোখে ফিরে তাকাল। তারপর নিশ্চিত হয়ে নিজেদের কাজ করে যেতে লাগল। তখন আরো কয়েকটা কাক অন্যান্য মৃতদেহগুলির ওপর নেমে এল। বারবকের ওপরেও কয়েকটা কাক ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার চওড়া ঢালের মত বুকের ওপরে, কোনরকমে দু-এক মুহূর্ত পাখা ঝাপটা দিয়ে বসে, রক্তাক্ত ক্ষতের মাংস খুবলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। যেন সত্যি একটি ভোজের আসরে মেতে উঠল ক্ষুধার্ত পাখিগুলি। কুকুরগুলি মৃতদেহের নীচে দাঁড়িয়ে লুব্ধ চোখে তাকাল। শকুনগুলি আরো নিচে নেমে এল। কোন কোন গাছে এসে বসতে লাগল।

জনতা একই রকম চীৎকার করছে, 'খা খা, সুলতানেরে খা। শালা আবার নিজেকে খলীফৎ আল্লাহ্ (ঈশ্বরের প্রতিনিধি) বলত।'

—ঢ্যামনাটা নাকি শাহ-ই-আলম (বিশ্বপতি) ছিল!

হাসি ও কলরবের মধ্যে এক একটা কথা গাজীয়াতলীর মাঠ কাঁপিয়ে গর্জে উঠছিল, 'শুয়োরের বাচ্চা জিল্-আল্লাহ্ ফি অল্- আলামিন হয়েছিল, ওর মড়াকে কেউ নাওয়াবে না ?'

—ওকে জন্নৎ অল্-মাওয়ায় (চিরন্তন স্বর্গে) পাঠিয়ে দে।

হঠাৎ কয়েকটা শক্ত মাটির ঢ্যালা ভিড়ের ভিতর থেকে বেগে গিয়ে আঘাত করল বারবকের প্রকাণ্ড দেহে। আঘাত করল, আর মাটির ঢ্যালা চৌচির হয়ে গেল। ঢিল মারার পরেই, একটা আশঙ্কা ছিল, হাবশীরা আসবে বর্শা উঁচিয়ে। কিন্তু কেউ-ই এল না। তারাও দূরে থেকে হাসাহাসি করছিল, মৃতদেহগুলির উদ্দেশে থুতু ছিটিয়ে দিচ্ছিল। ঢিল গিয়ে পড়তেই কাকগুলি উড়ে গেল, এবং এইরকম একটা ভোজে বাধা পড়ায় তারা কা-কা করে চীৎকার জুড়ে দিল। সুস্থির হয়ে গাছেও বসতে পারল না, আকাশে উড়তে লাগল। জনতার মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে ঢিল মারার প্রতিযোগিতা পড়ে গেল।

অথচ রাজা নিয়ে কারুরই মাথাব্যথা নেই। ফতে শার মৃত্যুতে এদের কিছু যায় আসে নি। এই বান্দা বারবকের রাজত্বের সময়েও এদের জীবনের ভাল-মন্দ কোন পরিবর্তনই হয় নি। বরং একটু ভালই বলতে হবে, কয়েকদিন বৃষ্টি হয়েছিল, আর সে বৃষ্টি গ্রীষ্মের প্রথম মুখপাতেই চাষের পক্ষে শুভসূচনাই করেছিল। গত আড়াই মাসে কোথাও কোন গণ-বিদ্রোহ দেখা দেয় নি। আজ যখন হাবশীদের দাপট বেড়েছে, এবং এইরকম সন্দেহ দেখা দিচ্ছে যে, হাবশীদের কেউ সুলতান বলে ঘোষিত হবে, তাতেও গৌড়বাসীদের কোন উৎসাহ নেই। তবু বারবকের আর বারবকের সঙ্গীদের মৃতদেহের প্রতি এদের নিষ্ঠুর ব্যবহারে মনে হচ্ছে, যেন কোন পৈশাচিক প্রতিশোধ এরা গ্রহণ করছে। কেন, তা তারা নিজেরাও বোধহয় জানে না।

ঢিল ও মাটি ছুঁড়ে মারার জন্যে কিছুক্ষণ ধরে গাজীয়াতলীর মাঠে ধুলো উড়তে লাগল। কুকুরগুলি মানুষের ক্ষেপে-যাওয়ার ব্যাপার দেখে চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। মাঝে মাঝে যখন ঢিল ছোঁড়া থেমে যেতে লাগল, তখন কাকেরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। মৃতদেহগুলিকে কেন্দ্র করে কাক ও মানুষের এই নিষ্ঠুর খেলা অনেকক্ষণ ধরে চলল।

সহাসা এক সময় একটা শব্দে সকলেই থমকে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই শুনল, মুয়াজ্জীনের মত কে উচ্চগলায় সুর করে আজান দিচ্ছে, 'আল্লা-হো-আকবর··· !'

গাজীয়াতলীর মাঠের পশ্চিম দিকচক্রে কখন সূর্য নেমে গিয়েছে, কেউ খেয়াল করে নি। আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। একটি মূর্তি জনতার কাছ থেকে সরে গিয়ে, উঁচু ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিকে মুখ করে ঈশ্বরকে ডাকছিল। সবাই সেদিকে ফিরে তাকাল। সেই বৃদ্ধ যে অনেক কথা বলছিল, সে-ই আজান দিচ্ছিল। ইতিমধ্যে বাতাসের বেগ কখন কমে এসেছে। তপ্ত বাতাস ঈষৎ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। ঈশ্বর-আহ্বানের শব্দে গোটা গাজীয়াতলীর মাঠে যেন একটা অলৌকিক স্তব্ধতা নেমে এল।

হাজার হাজার মানুষ নিশ্চুপ প্রায় নিথর। এমন কি কাকগুলিও সমবেত গলায় কা-কা করতে ভুলে গেল যেন। কেবল নিকটেই কোন্ গাছে একটি পাখি পিক-পিক শব্দে শিস্ দিচ্ছিল, সেই শব্দ এবং ঝিঁঝির ডাক শোনা গেল! কেউ কেউ কানের কাছে হাত ছুঁইয়ে ফিস্‌ফিস্ করে উচ্চারণ করল, 'লাহ্ আল্লাহ্!…কেউ উচ্চারণ করল, খোদা খোদাতাল্লাহ্!

তারপরে সবাই সরে পড়তে আরম্ভ করল। জনপদের দিকে ছুটে চলল। পনি গরুর গাড়ি এবং পায়ে-হাঁটার দল সবাই ফিরে চলল। যখন সবাই আস্তে আস্তে চলে গেল, তখন গাজীয়াতলীর মাঠটা শ্মশানের মত থমথম করতে লাগল। কেবল কুকুরগুলি গেল না। হাবশী ঘোড়-সওয়ারেরা একটা জায়গায় গুচ্ছ হয়ে দাঁড়াল। সেই বুড়োর দিকে বারে বারে তাকাতে লাগল। নিজেদের মধ্যে বুড়ো লোকটির বিষয়ে নানান কথাবার্তা বলল। কে হতে পারে ও? কোন দরবেশ? উলেমা? গাজী?…

বারবকের চোখ দুটি ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। সেখানে রক্তাভ গর্ত। নাকটিও ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। হাবশীরা সবাই ঘোড়ার পিঠে দুলতে দুলতে একবার মৃতদেহগুলির কাছে গেল। বর্শা এবং তলোয়ার দিয়ে কয়েকবার খোঁচাল। এবং একজন হঠাৎ বারবকের একদিকের দড়ির বাঁধন তলোয়ার দিয়ে কেটে দিল।

গাছের ডাল দুলে উঠল। বারবকের শরীর খানিটা কাত হয়ে ঝুলে পড়ল। যেন ওর একটি হাত মাটি স্পর্শ করতে চাইছে। একদিকের বাঁধন ছিন্ন হয়ে ঝুলে পড়ায়, তার শরীর মাটি থেকে দু-তিন হাত উঁচুতে। কুকুরগুলির চোখ লোভে জ্বলজ্বল করে উঠল। তারা এগিয়ে আসবার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

আর একজন হাবশী তলোয়ারের সজোর কোপে, বারবকের পেটের অনেকখানি ফাঁসিয়ে দিল। দলা-পাকানো পিণ্ডের মত পাকস্থলীর কিছু অংশ বেরিয়ে এল, এবং পচা পুকুরের জলের মত তরল পদার্থ ঝরে পড়ল। সকলেই নাকে হাত-চাপা দিয়ে থু-থু করে থুতু ছিটিয়ে নগরের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

উঁচু ঢিবিতে বুড়ো তখনো ডেকে চলেছে, 'আল্লাহ্ লাহিলেল্লা…।'

পশ্চিম আকাশের রক্তিমা দেখতে দেখতে বাসি রক্তের মত কালচে হয়ে এল। সন্ধ্যার ছায়া নামছে। বাতাসের ঝোড়ো বেগ নেই, উত্তাপ কমে গিয়ে আরো ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আশেপাশে সবই বড় বড় শালগাছ। সারাদিন ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে লড়ে; এখন তারা অনেকটা সুস্থির। কাকগুলির ক্ষুব্ধ অস্থিরতা যাবার নয়। আঁধার নেমে আসছে, তবু তারা এখনো মৃতদেহগুলির লোভ ছাড়তে পারছে না।

যদিও উৎসাহে ভাটা পড়ে এসেছে। কুকুরগুলি বারবকের শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এক-একজন এক-এক জায়গায় কামড়ে ধরে টেনে নামাতে চাইছে, স্বভাবতই গাছের ডালগুলিও ঝাপটা খাচ্ছে। ঝিঁঝির ডাক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং সেই নির্বোধ পাখিটা এখনো পিক্‌পিক্‌ সুরে শিস্‌ দিয়ে, তার নিজের পরিবেশকে স্বপ্নালু করে তুলতে চাইছে। ওখানে কোন কেতকী আছে কে জানে, বুলবুলিটা কেতকীর কানে যেন শিস্‌ দিচ্ছে।

বৃদ্ধ এবার ঢিবি থেকে নেমে এল। নগরে ফিরে যাবার আকাশে ধোঁয়ার মত ধুলার কিম্ভুত একটা আকৃতি দেখা যায়। হাবশীদের ঘোড়ার পায়ে ধুলো উড়ছে। বৃদ্ধ মৃতদেহগুলির কাছে গেল। বারবকের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল। কুকুরগুলি একবার বৃদ্ধকে দেখল, এবং নিরস্ত্র দেখে নিজেদের কাজ তারা করে যেতে লাগল। তাদের ভঙ্গি দেখে এমনও মনে হল, বাধা পেলে জীবন্তকে তারা এখন ছেড়ে কথা কইবে না।

কিন্তু বৃদ্ধ তাদের বাধা দিল না। বারবকের চক্ষুহীন অন্ধকার কোটরের দিকে তাকিয়ে সে শুধু ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠল, 'কে তুমি, কে? কেন সুলতান হতে চেয়েছিলে? কে তুমি? পাঠান না হাবশী না তুর্কী না আরবী, কে তুমি সুলতানশাহীর মদ পিয়েছিলে বাছা?'...

জঙ্গলের ভিতর থেকে শিয়ালেরা প্রথম রজনী ঘোষণা করল।

বৃদ্ধ গৌড় নগরের রাস্তায় এগিয়ে চলল। যেতে যেতে সে নিজের মনেই বলল, 'কে জানে সেখানে এতক্ষণে কী শুরু হয়ে গেছে। হাবশী অমাত্যরা, লস্করেরা কি এতক্ষণে নগরের পথে পথে বেরিয়ে পড়ে নি? এতক্ষণে কি লুঠপাট খুনোখুনি শুরু হয়ে যায় নি? গৌড়ের রাস্তায় কি এই রাত্রে রক্ত নদী বইবে না? সুলতান-শাহীর এই তো নিয়ম।'...

বৃদ্ধ চলে গেল। পশ্চিমের আকাশের রক্তিমায় আস্তে আস্তে কালি লেপে গেল। ক্রমে অন্ধকার নেমে এল গাজীয়াতলীর মাঠে।

এই সময়ে নগরের দিক থেকে একটি অস্পষ্ট মূর্তি গাজীয়াতলীর মাঠের দিকে এগিয়ে এল। মূর্তিটি যেন বেঁকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হাতে লাঠি ভর দিয়ে সে চলেছে। চলেছে, যেখানে মৃতদেহগুলি পড়ে আছে, সেই দিকে। তার চলার মধ্যে কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব। ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, মূর্তিটি এক বৃদ্ধার। বলিরেখাবহুল ফরসা মুখ। রেখাগুলো যেন সোনার কাঠির মত। তাতে ধুলা লেগেছে। সে হাঁফাচ্ছে। সে এসে দাঁড়াল, মৃতদেহ-

গুলোর সামনে, যেখানে ছেঁড়াছিঁড়ি কাটাকাটি করে কুকুরদের মহাভোজ চলেছে। বৃদ্ধা বারবকের মুখটা ও শরীরটা দেখে চিনতে পারল। কয়েক মুহূর্ত দেখল। তার চোখে জল দেখা দিল। চুপিচুপি বলল, 'যদি সুলতানশাহীর মদই খেয়েছিলি, তবে ভয় পেয়েছিলি কেন। শত্রুকে কেন চিনতে পারলি না। বন্ধুদেরও কেন চিনতে পারলি না। ভয় হচ্ছে সব থেকে বড় পাপ; সেই পাপেই তোর সর্বনাশ হয়েছে।'...

কে আমি? আমি কে?

শাহীমঞ্জিলের (সুলতানের প্রাসাদ) এক অন্ধকার অলিন্দে দাঁড়িয়ে বারবক ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠল। আড়াই মাস আগের এক সন্ধ্যারাত্রে গড়ের ওপারের জঙ্গল থেকে যখন শিয়ালেরা রাত্রির প্রথম যাম ঘোষণা করছিল, তখন বারবক শাহীমঞ্জিলের বহির্কক্ষের অলিন্দে পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়াল, আর ফিস্‌ফিস্‌ করে উচ্চারণ করল, 'কে আমি? আমি কে? নফর? বান্দা?'...

সহসা তার কঠিন থাবা মুষ্ঠিবদ্ধ করে তলোয়ারের হাতল চেপে ধরল। যেন সামনের অন্ধকার শূন্যতায় সে এক ঘৃণ্য আততায়ীকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু অন্ধকারে তার সামনে কেউ-ই ছিল না। কালো মেঘাবৃত আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর অন্ধকার মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। হাওয়ার শনশন শব্দের সঙ্গে, অন্ধকার অদৃশ্য গাছের ঝাপটা খাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ইলশেগুঁড়ি ছাট এসে গায়ে লাগছে। ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে বৃষ্টি হচ্ছে; আর মাঝে মাঝে দমকা বাতাস যেন চাপা স্বরে শাসিয়ে উঠছে।

এইসময়ে একবার দূরে আকাশে চিকুর হানল। বিদ্যুল্লহরী মালার মত আকাশপটে ফুটে উঠল, মুছে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বাজডাকার শব্দ হল চাপা গম্ভীর গর্জনের মত: চকিত বিজলী হানায়, অলিন্দে বারবকের সর্বাঙ্গ ঝলসে উঠল। তার মাথায় জরির কাজ-করা পাঠানী টুপি, চুমকি-বসানো পাগড়ির মত শিরোভূষণ, কানের পাথর, হাতের হীরার আংটি ও তলোয়ারের রুপোর হাতলে-বসানো পাথরসমূহ চিকচিক করে উঠল। এবং সেই সঙ্গে অলিন্দের খোলা খিলানের প্রায় মাথায় ঠেকে যাওয়া তার দীর্ঘ বিশাল দেহ, তার রক্তাভ হিংস্র চোখ দেখা গেল।

বারবক এই প্রাসাদের 'খাওয়াজা-সেরা'। প্রাসাদের রাত্রির প্রহরীদের সে প্রধান, প্রাসাদের সকল চাবি তার কাছে থাকে। তার গতিবিধি সর্বত্র। এই প্রাসাদের

দরবারকক্ষ থেকে হারেম পর্যন্ত তার গতিবিধি, কারণ সে তৈরি-করা ক্লীব। খোজা। নপুংসক যাকে বলে। সে পুরুষ, কিন্তু নষ্টকৃত অঙ্গ। সে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, স্ত্রী-সম্ভোগে অপারগ। তাকে সেই ভাবেই তৈরি করা হয়েছে। শিশুবয়সে তাকে সেইভাবেই তৈরি করা হয়েছিল অঙ্গহানি করে, যাতে সে সুলতানের শত শত ভোগ্য নারীদের আবাস হারেম পাহারা দিতে পারে। নারীদের সংস্পর্শে থাকতে পারে, অথচ ভোগ না করতে পারে। তাই সে হারেম পর্যন্ত যেতে পারে। দেহের দিক থেকে বিশাল এবং ভয়ঙ্কর শক্তিমান, তাই সে খাওয়াজা-সেরা খোজা প্রধান। তাই তার কাছেই সারারাত্রি সমস্ত কক্ষের চাবি থাকে।

পাঁচ হাজার পাইক তার অধীনে আছে। যাদের নায়েক বলে। পাঁচ হাজার নায়েক নিয়ে সে সারারাত্রি শাহীমঞ্জিলে থাকে, বিনিদ্র প্রহরায় সুলতানকে নিশ্চিন্ত সম্ভোগে, সুখনিদ্রায় নিদ্রিত রাখে। ভোর হলে সুলতানের যখন প্রথম ঘুম ভাঙে, তিনি ঘুমচোখেই দেহরক্ষীদের ওপর শরীরের ভার অর্পণ করে একবার এসে দরবারের সিংহাসনে বসেন। নকীব হাঁকে, শাহ-ই-আলম খলীফৎ আল্লাহ্ জিল্ —আল্লাহ্ ফি অল্-আলামিন শাহ্ সুলতান জলালুদ্দীন ফতে শাহ অল্-দুনিয়া ওয়াল-দীন...।'

বারবকও তখন ওইসব সম্মানজনক উপাধি ও পদবীর বিশেষণগুলি উচ্চারণ করতে করতে সুলতানকে অভিবাদন করে। সুলতান ঘুমচোখেই অভিবাদন গ্রহণ করেন, হয়তো জড়িয়ে জড়িয়েই উচ্চারণ করেন, খাওয়াজা-সেরার রাত্রিব্যাপী প্রহরায় তিনি খুশি হয়েছেন, তার পাঁচ হাজার নায়েকের কাজেও খুশি হয়েছেন, এখন সে তার সকল নায়েকসহ শাহীমঞ্জিল ত্যাগ করার অনুমতি পাচ্ছে।

বারবককে তখন তার পাঁচ হাজার পাইকসহ প্রাসাদ ত্যাগ করে যেতে হয়, দিনের প্রহরায় নতুন দল আসে। এই হল শাহীমঞ্জিলের আদপ।

বারবক তরবারির হাতল থেকে হাত তুলে নিল। অলিন্দের কোমর-সমান আলসের কাছে গিয়ে দূর-অন্ধকারের দিকে তাকাল। তার গায়ে আরো জলের ছাট লাগল। বৃষ্টির ছাট তার ভালই লাগছে। তার দুই পাশে কালো পাথরের মূর্তির মত দুটি মানুষের অবয়ব দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে। স্থির নিশ্চল সেই মূর্তির ডানদিকে, মাথা ছাড়িয়ে অস্পষ্ট বর্শা-ফলক লক্ষ্য করা যায়। এবং বাতাসে মূর্তির মাথার কাছ থেকে, কাপড়ের ফালি উড়ছে।

বারবক দুইটি মূর্তির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গিয়ে, কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বাঁ হাত তুলে, বাঁয়ের মূর্তির কাঁধে কনুইয়ের ভর দিয়ে

দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে মূর্তি'র দিকে একবার তাকাল, এবং ডান হাত দিয়ে মূর্তি'র পেটে খোঁচা দিতেই, প্রস্তরবৎ মূর্তি' কেঁপে উঠল, নড়ে উঠল আর খিকখিক করে হেসে উঠল।

এরকম দুটি মাত্র মূর্তি' নয়, শাহীমঞ্জিলের বহির্কক্ষের সমগ্র অলিন্দ জুড়েই যেগুলিকে দু'হাত দূরে দূরে সারি সারি স্তম্ভ বলে বোধ হচ্ছে, এ সবই এইরকম মূর্তি'। তারা সকলেই পাইক। বারবকের অধীনস্থ নায়েক। এদের শুধু নিশ্বাস পড়ে। মশা-পোকা-মাকড়ে উৎপাত করলে, হাত-পা নাড়ার হুকুম আছে। অন্যথায়, বর্শা হাতে অনন্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই বিধি। যদি অপরিচিত কোন ছায়া চোখের সামনে দিয়ে যায়; যদি কোনোরকম সন্দেহজনক বোধহয়, তৎক্ষণাৎ তার বুকের ওপর বর্শা ঠেকিয়ে, তওয়াচীকে ডাকা হবে। তওয়াচী বাতিদারকে বলে। তওয়াচীকে ডেকে তার পরিচয় দাবি করা হবে এবং খাওয়াজা-সেরার কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। কোনোরকম অবাধ্যতা করলে তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণাগ্র বর্শা তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করবে।

অলিন্দের আলসের কাছে যেমন পাইকেরা বর্শা হাতে আছে, কক্ষের দেয়াল ঘেঁষেও তেমনি উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে পাইকেরা আছে। এই পাইকদের কক্ষের ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারণ তারা পুরুষ। বহির্কক্ষের কোন ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। কক্ষগুলিতে খোজা প্রহরীরা আছে। তাদের হাতেও খোলা তলোয়ার আছে। কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ এখান থেকে কিছুই দেখা যায় না। দরজার অবস্থান ও ইমারতের গঠনভঙ্গি এমন যে, অলিন্দ থেকে কারুর পক্ষেই ভিতরের কিছু দেখা সম্ভব নয়।

অলিন্দে আজ কোনো আলো নেই। থাকবার কথা। প্রচুর না হোক, অল্প আলো। অন্তত সুদীর্ঘ অলিন্দের প্রতিটি কোণে, বড় আলো থাকা উচিত ছিল। আজ নেই। খাওয়াজা-সেরার হুকুম, অলিন্দে বাতি জ্বলবে না আজ। কিন্তু প্রাসাদের বাইরে, প্রাচীর-সীমা পর্যন্ত তওয়াচীরা বাতি নিয়ে ঘুরছে। শাহীমঞ্জিলের চারিদিকে বাগান। ফুলের ও বড় বড় সুন্দর পাতার ঝাড়তোলা গাছের বাগান। মাঝে মাঝে ছোট জলাশয়, যেগুলিকে অনেকটা অন্ধকারে পড়ে-থাকা আয়নার মতো দেখাচ্ছে। আর সেখানে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সরব্-এর ছায়া, যে গাছ ইরান থেকে এনে লাগানো হয়েছে। ঝাড়ালো গাছ এবং পাতার রং

সবুজ, আগুনের শিখার মত পাতার গঠন-বাহার। পারস্যের গোলাপ, তুরস্কের বর্ণবাহারী ছোট ছোট ফুলের ঝাড়ে বাগিচা যেন সূক্ষ্ম কাজ-করা গালিচার মত। সেখানেও সশস্ত্র পাইকেরা রয়েছে। যাদের প্রতি যেমন নির্দেশ, কেউ কেউ ঘুরছে, কেউ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথার আদান-প্রদান যে একেবারেই না হচ্ছে, তা নয়। হচ্ছে, কিন্তু চুপিচুপি, অস্ফুট গলায়। নইলে সুলতানের ঘুম ভেঙে যাবে। সুলতান-শাহ্-ই-আলম—পৃথিবীর পতি।

বারবক ডাইনের নায়েকের পেটেও খোঁচা দিল। সেও হেসে উঠল। বারবক নিজেও হেসে উঠল। হেসে উঠে সে বলল, 'তোরা নিশ্চয় সোলেমান আর নাজির, তাই না ?'

—জী!

—আজ রাত্রিটা খুব অদ্ভুত, তাই না ?

—হাঁ, যেন নরক।

একজন নায়েক জবাব দিল না। বারবক বলল, 'নরক, না ?'

নায়েকেরা কেউ কোন জবাব দিল না। বারবক বলে উঠল 'আর আমি সেই নরকের প্রেতাত্মা! আল্লার নাম নিয়ে বলছি, আমার সেই রকম মনে হচ্ছে।'

অলিন্দের অন্যপাশ থেকে একটি গলার স্বর শোনা গেল, 'দোহাই খোদাবন্দ ও রকম বলবেন না, আমার ভয় করছে।'

বারবক গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'কে রে তুই নফ্‌রা ?'

—আমি ফখরুদ্দীন।

বারবক ঠাট্টার স্বরে বলল, 'শালা, তোরা হলি গৌড়ের চিতাবাঘ। আমার সঙ্গে বিটলেমি হচ্ছে, না ?'

বারবক নায়েক প্রধান হলেও, তাদের সঙ্গে সে এ ভাষাতেই কথা বলে। সে যে একজন খাওয়াজ-সেরা, প্রাসাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী, বাদশাহের বিশেষভাবে বিশ্বাসভাজন এবং সম্মানীয়, তার কথা থেকে সেরকম মনে হয় না। নায়েকরা যেন তার অধীনস্থ পাইক মাত্র নয়, তার বন্ধু। তার কথার মধ্যেও নগরের ইতর বাউণ্ডুলেদের খিস্তি, উচ্চারণও সেইরকম। বিশেষ করে, যখন বাদশা নেই, তখন তার অন্য চেহারা। সে শিক্ষিত বা বিদ্বান নয়। নানান ঘটনাচক্রেই সে এই পদে এসেছে এবং গৌড়ের রাজনীতিতে, শাহীমঞ্জিলে সে আজ অন্য চরিত্র।

জবাব এল, 'তা হলে যেন আমাকে কুত্তায় খায়। আপনি আমাদের শাহ্-ই-আলম—'

বারবক চাপা গলায় শাসিয়ে উঠল 'চুপ, উল্লুক নায়েক।'

আর কোন কথা শোনা গেল না। রাত্রি স্তব্ধ। নারীকণ্ঠের অস্ফুট গানের বিণ-এর মৃদু আভাস মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। শাহীমঞ্জিলের ভিতর থেকেই আসছে নিশ্চয়। ফতে শা বোধহয় গান শুনছেন। কে গাইছে? ইরানী গায়িকা গুলেসন? ফতিমাও হতে পারে! এখন রাত গভীর, চারিদিকে নিশ্চুপ, তাই শব্দ আসছে। পুরুষ তো শাহীমঞ্জিলে মাত্র একজন, জলালুদ্দীন আবুল মজাফ্ফর ফতেহ্ শাহ।

বারবকের মুখ আবার গম্ভীর হয়ে উঠল, তার চোখের সামনে ফতে শার মূর্তি ভেসে উঠল। জলালুদ্দীন ফতে শা, সুলতান! যার পায়ের তলায় পৃথিবীর সকল সুখ, সকল ভোগ নানা উপাচারে জড়ো হয়ে আছে। কেন? মাহমুদশাহী বংশের মৃত সুলতান রুকনুদ্দীনের সে খুড়তুতো ভাই, তাই! রুকনুদ্দীন বারবক শাহের ছেলে য়ুসুফ শাহ বেশী দিন রাজত্ব করেন নি। সবাই জানতো, তাঁর চাচা সাহেব ফতেহ শাহ খুব সুবিধার লোক নন। দরবারের ধারে কাছে না এলেও, অনেকেই জানতো, তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল সিংহাসনের দিকে। অনেক অমাত্যের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু য়ুসুফ শাহ্ তাঁর চাচাকে ঘাঁটাতেন না, চাচাও ভাইপোকে দূরে রাখতেন। তারপরে য়ুসুফ শাহ যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর সুন্দর ছেলে সিকন্দর সিংহাসনে বসলো। দেখা গেল কয়েকদিনের মধ্যেই তার আচরণে, উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। দেখতে দেখতে এমনিই উন্মত্ততা দেখা দিল যে, সিংহাসনে বসে, খোলা তরবারি কোলের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে, দরবার সমক্ষেই সে প্রস্রাবের ডাবর আনতে বলত। তাই, সে পাগল বলে প্রতিপন্ন হওয়ায়, তার খুল্লপিতামহ জলালুদ্দীন ফতে শা নাম নিয়ে সুলতান হয়েছে। যোগ্যতা? নবীন যুবা সিকন্দরকে আস্তে আস্তে পাগল তৈরী করা কি যোগ্যতা নয়? সমস্ত আত্মীয় ওমরাহদের হাত করতে পারা কি যোগ্যতা নয়? দীর্ঘকাল ধরে, একটু একটু করে অগ্রসর হয়ে, এই প্রৌঢ় বয়সে নাতির সিংহাসনে আরোহণ, সিকন্দরের জন্যে, দেশ-বিদেশ থেকে চয়ন করা অল্প বয়সের রূপসী ফুলকুমারী জরাতি হারেমে ভোগ এবং শয়ন কি যোগ্যতা নয়? তা ছাড়া রক্তধারার যোগ্যতা। মাহমুদশাহীর বংশধর সে, উজীর-আমীর-ওমরাহ লস্করবৃন্দ, সকলেই তাকে ভয় পায় বলে সে সুলতান।

এ সবই কি, রুকনুদ্দীন, দরবেশ দকীনীকে খুন করেছিলেন, সেই পাপে? পাপ! সুলতানশাহীতে পাপ কাকে বলে? নসিরা—নাসিরুদ্দীন, শামসুদ্দীন আহ্মদ শা সুলতানের বান্দা, শামসুদ্দীনকে খুন করেছিল না শাদী খানের সঙ্গে

মিশে? তারপরে শাদী খানকেও খতম করে নিজে সুলতান হয়েছিল না নাসিরুদ্দীন? সুলতান হয়ে নাম নিয়েছিল নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শা, মাহমুদশাহীর প্রতিষ্ঠাতা। গোলাম রাজা হয়ে বসেছিল। সেই রাজার বংশধর ফতে শা। যার পুরো নাম, জলালুদ্দীন আবুল মজফ্‌ফর ফতেহ্‌ শাহ। রক্তের জোরে নয় কেবল। কখনো বান্দা মারে রাজাকে। কেউ পিতৃহন্তা। কেউ কাউকে পাগল তৈরি করে।

বারবক ডাক দিল, 'হিদ্‌না!'

—হুজুর!

—সরাব!

একটি বামন এগিয়ে এল। অলিন্দের অন্ধকারে সে যে কোথায় ছিল, কেউ দেখতে পায় নি। তাকে দেখা যায় না। উচ্চতায় সে দুই হাত। কিন্তু মখমল আর মসলিনের পোষাক তার। সেও খোজা। তরবারি রাখা সম্ভব হয় না, কোমরবন্ধে তার ছোট সোনার খাপে ছোট ছুরি আছে। হাতে তার রুপোর মদের পাত্র। বড় হাতওয়ালা পাত্র, মদে পরিপূর্ণ থাকে। সেই পাত্র নিয়ে সে বারবকের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়। পিছু ফিরে দেখবার দরকার হয় না, ডাক দিলেই তার সাড়া পাওয়া যায়। বারবক পান করবার ছোট পাত্রে ঢেলে নেয় না, সরাব সে বড় পাত্র থেকেই গলায় ঢেলে দেয়।

বামনের নাম হিদ্‌না। হিদ্‌না পাত্র বাড়িয়ে ধরতেই, ঢকঢক করে পান করল বারবক। একটা অস্পষ্ট আর্তনাদের মত শব্দ করে পাত্রটা হিদ্‌নার হাতে দিল। বুকে একটি হাত চেপে, অলিন্দের আলসের কাছ থেকে থুতু ফেলল মাটিতে। তারপর আবার অন্ধকারে অলিন্দের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল।

বাতাস যেন ক্রমেই বাড়ছে। বিজলী হানছে ঘন ঘন। কিন্তু এখনো দূরে আকাশে, তাই মনে হচ্ছে যেন কোন দূর প্রান্তে আহত সিংহ থেকে থেকে গর্জে উঠছে। যদিও চকিত বিজলীঝলকের আলো এই শাহীমঞ্জিলের অলিন্দ পর্যন্ত সাপের জিহ্বার মত স্পর্শ করে যাচ্ছে। মঞ্জিলের বহির্কক্ষের দরজার কবজায় মাঝে মাঝে শব্দ শোনা যাচ্ছে। পর্দায় পর্দায় ঝাপট লাগছে।

বারবকের মনে হল, তার বিশাল শরীরটা যেন বিশালতর অনুভূত হচ্ছে নিজের কাছে। একটা প্রচণ্ড শক্তির বেগ যেন, তার দুই হাতে দ্রুতগামী উগ্র ক্ষ্যাপা অশ্বের লাগাম ধরে টেনে রাখার মত ছটফট করছে। দৃষ্টি তার ক্রমেই তীক্ষ্ম হচ্ছে। অন্ধকারে শ্বাপদের মত তার চোখে সবকিছু সুস্পষ্ট ধরা দিচ্ছে। সে আবার ঠোঁট

মেজেই নিঃশব্দে উচ্চারণ করল 'আমি কে ?' আমি বারবক। বান্দা বারবক। এই সব পাইকেরা আড়ালে আমাকে বলে বারবক্যা। যেমন নসীরকে বলে নসীরা। হাবশ খানকে বলে হাবশা। গৌড়ের বাঙালীরা এরকমই বলে, তাদেরটা শুনে শুনে পাঠান হাবশীরাও বলে। ইউসুফকে বলে ইচ্ছুপ্যা। আমি বান্দা, আমি কেনা গোলাম, তাই আমাকে বরাবরই সবাই 'বারেক' বলে এসেছে। অথবা বারবক্যা। বলুক, ক্ষতি নেই তাতে। কিন্তু বান্দার জন্মও তো কোন পুরুষের ঔরসেই হয়, কোন নারীরই গর্ভজাত সে। 'আমি—আমি কোন নারীর গর্ভজাত ? কোন পুরুষের ঔরসে আমার জন্ম !' খাওয়াজা-সেরা, নগরের লোচ্চা গুন্ডা লুঠেরাদের সঙ্গে যার ওঠা বসা বন্ধুত্ব, খিস্তি খেউড় গান গল্প নিয়ে যে মেতে থাকে সারাদিন, সে আজ এই সব আশ্চর্য বিচিত্র সব কথা চিন্তা করছে।

একজন তওয়াচী বাতি হাতে দেখা দিল দূরে অলিন্দে। এদিকেই আসছে। দূরে থেকেও অল্প আলোকরশ্মি দাড়ি দেখে চিনতে পারল বারবক, বাশী আসছে। বাশী তওয়াচী—বাতিদার। বাশী একজন হাবশী, বারবকের বিশ্বস্ত লোক এই প্রাসাদের মধ্যে। বাশী খোজা। কিন্তু তার পাশে কে ? কাকে পথ দেখিয়ে এদিকে নিয়ে আসছে সে ? আগন্তুকের পোশাকও বেশ ঝকমক করছে। মাঝে মাঝে এক একটা বর্শা কিংবা দেয়ালের দিক থেকে খোলা তলোয়ার এগিয়ে এসে তাদের গতিরোধ করছে। আবার পরমুহূর্তেই সরিয়ে নিচ্ছে, কারণ তারা কিছু একটা বলছে, যে জন্যে নায়েকেরা তাকে বিশ্বাস করছে।

—কে হতে পারে হিদনা ?

বারবক নিচুগলায় জিজ্ঞেস করল। পিছনের অন্ধকার অদৃশ্য থেকে বামন হিদনার গলা শোনা গেল, 'আমার মনে হচ্ছে, মুন্না খান।'

—মুন্না খান। কেন, ও এখন শাহীমঞ্জিলে কেন ?

—হয়তো আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে।

বারবক জানে, শাহীমঞ্জিলে তার উপস্থিতিতে মুন্না খানকে যে-কোন সময়েই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া আছে। যদি এ কথা সুলতানের কানে যায়, তা হলে বারবকের শিরশ্চেদ নিশ্চয়। কিন্তু এই শাহীমঞ্জিলে সুলতানই পরবাসী, রাত্রের যা-কিছু, সবই বারবকের নিজের হাতে। সব কিছু তারই নখদর্পণে। কে কখন কোথায় কী করছে এই মঞ্জিলের মধ্যে, সবই তার জানা আছে। এমন কি স্বয়ং সুলতান ফতে শার নিজস্ব অনুচরেরাও কে কোথায় আছে, সব জানে বারবক। জানে, তার কারণ, সুলতানের নিজস্ব অনুচর বলতে কেউ নেই। কারণ শাহীমঞ্জিলে

'বিশ্বস্ত বলে কোন প্রাণী নেই। বিশ্বাস বলে কোন শব্দ সুলতানশাহীর শব্দকোষে নেই। সুলতান যাদের মনে করে বিশ্বস্ত অনুচর, তারা সংবাদ-বিক্রেতা মাত্র। পেশাদার সংবাদবিক্রেতা।' বারবক নিজেও একজন সুলতানের বিশ্বস্ত অনুচর নয় কী? কিছু কিছু সংবাদ দিয়ে, সেও কি সুলতানের নেক নজর পায়নি? সুলতানের কাছে ইনাম পায় নি? তবে সে সব খুবই সাবধানে। সংবাদ মিথ্যে হলে গর্দান যাবে। আবার যার বিরুদ্ধে সংবাদ দেওয়া হয়, সে যেন কোন কিছুই জানতে না পারে। তাহলে, ভবিষ্যতে আর পাওয়া যাবে না। তবে, সংবাদ দিতে হলে, সুলতানের মন জানতে হয়। সুলতান কী ধরনের সংবাদ চান, পেলে খুশি হন, সেটাও জানা থাকা দরকার। বারবক জানে হাবশীদের খবরই ফতে শাহ্ বেশী চায়। ফতে শাহ্ জানে, হাবশীরাই এখন সব কিছুতে দলে ভারী। তারাই ক্রমে উদ্ধত হয়ে উঠছে। বারবক সেই বুঝেই সংবাদ দেয়। তা বলে সব হাবশীর খবর নেয়। যারা তার সঙ্গে জড়িত, তাদের, কোন সংবাদই সুলতানের কাছে যায় না।

তওয়াচী বাশীর সঙ্গে মুন্না খান সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রায় দরবারী ভঙ্গিতে, যেন সুলতানকে অভিবাদন করল। বারবক প্রথমে দৃষ্টিপাত করল বাশীর চোখের প্রতি। বাশী আদপ অনুযায়ী পাথরের মূর্তির মত স্থির। ভাবলেশহীন মুখ। যদিচ তার সুরমা-ঘষা চোখের পাতা দুবার নড়ে উঠল।

বারবক জিজ্ঞেস করল, 'সংবাদ?'

মুন্না খান প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'হাফিজকে আজ পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে দিয়েছি।'

—সে খবর তো আমি জানি।

—হাফিজ-খান আরো তিন লাখ চেয়েছে।

—কেন?

—শুনতে পাচ্ছি, আরো কিছু খরচ লাগবে, আরো কার কার, মুখ বন্ধ করার—

—এখনো, আজ রাত্রেও মুখ বন্ধ করতে হচ্ছে? তারা কারা যাদের মুখ আজ রাত্রেও বন্ধ না করলে নয়? মুন্না খান মুখ নামিয়ে বলল, 'তা আমাকে বলে নি।' মুন্না খানের কথা শেষ হবার আগেই বারবক বলে উঠল, 'দিয়ে দাও।'

মুন্না খান বলল, 'আপনার হুকুমটাই খালি নিজে নিতে এসেছিলাম। আমি তা হলে যাচ্ছি।'

বলেও মুন্না খান বারবকের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, কুর্নিশ করে চলে গেল

না। বারবকও তার দিকেই তাকিয়েছিল। বারবকের রক্তাভ চোখের দীপ্তি এমন চকচক করছিল যে, চোখ রাখা যাচ্ছিল না। সেই শাণিত দীপ্তি ক্রোধের নয়। সম্ভবত মদাপানের জন্যেই ওইরকম দেখাচ্ছিল। মন্না খান দৃষ্টি নত করে মুখ নামিয়ে রাখল। কিন্তু বারবকের দৃষ্টি একই রকম স্থির অপলক।

তওয়াচী বাশীর চোখে একটি আতঙ্ক ফুটে উঠল। সে বারবকের স্থিরনিবদ্ধ চোখের দিকেই তাকিয়েছিল। আর ঠিক এই মুহূর্তেই, বারবকের বাঁ হাত তার তলোয়ারের ওপর ন্যস্ত হল। বাঁ হাত, তবু মন্না খান যেন চমকে চোখ তুলে তাকাল বারবকের দিকে। এবং শঙ্কিত বিস্ময়ে দেখল, খাওয়াজা-সেরার চোখ তেমনি স্থির, দৃষ্টি অপলক।

বারবক কিন্তু এসব কিছুই দেখছিল না আসলে। সে তখন অন্যজগতে বিচরণ করছিল। সে নিজেকে বার বার জিজ্ঞেস করছিল, পারবো তো? মন্না খান আমাকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করেছে, সে জানতে চাইছে। আমি কী বলব? কি বলব? আমি পারবো তো?'

পরমুহূর্তেই সে হেসে উঠল। হেসে উঠে, মন্না খানের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমার আরিজ-ই-লস্কর, তুমি নিশ্চিন্ত থাক দোস্ত। রাতভোর ভাল করে ফূর্তি করগে। কটা ছুকরি আজ যোগাড় করেছ?'

মন্না খানের যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। হেসে বলল, 'ঘরে বিবি আছে।'

মন্না খানের দাড়িসুদ্ধ গাল টিপে দিয়ে বারবক ইতরজনের মতই রসিকতা করে বলল, 'তুই শালা খচ্চর মন্না খাঁ। রোজ রাতে তোর ঘরে গাদা গাদা আনকা বিবি আসে, তা কি আমি জানি না?'

—আপনি খোদাবন্দ্।

বারবক তার কাঁধ চাপড়ে বলল, 'কোন ভাবনা নেই। হাফিজ খানকে টাকা দিয়ে দাও, আর আজ রাতভোর মজায় কাটাও। আর—।'

গলার স্বর নামিয়ে চুপিচুপি বলল, 'আর কাল থেকে তুমি সুলতানের আরিজ-ই-লস্কর, এই কথাটাও মনে রেখ।'

আরিজ-ই-লস্কর, অর্থাৎ সৈনিকদের বেতনদাতা। তওয়াচী বাশীর চোখদুটিও হাসিতে চকচক করছিল। মন্না খান মাথা নিচু করে, হাত তুলে অভিবাদন করে বিদায় নিল। বাশী চলে যাবার আগে খালি বলে গেল, 'জন্নত বুড়িকে দেখেছি, সামনেই কোথায় যেন একটা ঘরে ঢুকল।'

বারবক চমকে উঠে বলল, 'সুলতান টের পায় নি ?'

—বোধ হয় না !

মুন্না খানকে বাতি দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল বাশী। বাতি দূরে সরে যেতে লাগল, আর অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল আবার। বারবক ডাকল, 'হিদ্‌না।'

—হুকুম করুন।

—সরাব।

বামন হিদ্‌না পাত্র এগিয়ে দিল। বারবক বলল, 'মাল ভাল নয় রে, নেশা জমছে না।'

বামন জবাব দিল, 'আপনার তো কোনদিনই নেশা হয় না।'

—আজ নেশা হওয়া দরকার।

হিদ্‌না সে কথার কোন জবাব দিল না। বারবক পাত্র উপুড় করে গলায় ঢালল। হিদ্‌নাকে পাত্র ফিরিয়ে দিয়ে আবার মন্থর পায়ে এগিয়ে চলল। এবং আপন মনেই উচ্চারণ করল, 'তাহলে, সবাই যে যার পাওনাগণ্ডা পেয়ে গেছ ?'

অন্ধকার থেকে একজন নায়েক বলে উঠল, 'জী হুজুর।'

—হাফিজ খানই নিজের হাতে দিয়েছে তো ?

চলতে চলতে বলছিল বারবক। আর একজন নায়েক বলল, 'হ্যাঁ হুজুর।'

—বহুত আচ্ছা।

বারবক এগিয়ে চলল মন্থর পায়ে। সে এমনভাবে বলল, আর নায়েকরা এমনভাবে জবাব দিল যেন কে কাকে কী বলছে, বোঝবার উপায় নেই। নায়েকদের জবাবও তেমনি স্থির অনড়, নিশ্চলভাবেই তারা জবাব দিচ্ছিল।

মেঘ ক্রমেই যেন আকাশ থেকে গড়িয়ে নামছে। বিদ্যুতের কশা ও বাজের গর্জন ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। যেন এই শাহীমঞ্জিলকে ঘিরে ধরবার জন্যে, ঢেকে ফেলবার জন্যে বাহু বিস্তার করে আসছে।

আবার সেই আগের চিন্তা ফিরে এল বারবকের। এবং তার দেহের নানান অঙ্গে যেন একই সঙ্গে কতকগুলি তীক্ষ্ম আঘাত বেজে উঠল। গালে, পেটে, উরুতে, নানান স্থানে। তার দেহের যেসব জায়গায় সুলতান ফতে শা আঘাত করে, গর্জে উঠেছে, 'বান্দা, বেআদপ !'

সুলতান ফতে শা' কোন বেআদপি ক্ষমা করে না। কারুরই না। অনেক উজীরে-আজমের গায়েও তার হাত পড়েছে। অনেকের দাড়ি কেটে দিয়েছে তলোয়ার

দিয়ে। বারবককে একবার খোলা তলোয়ার দিয়ে উরুতের ওপর কোপ মেরেছিল সুলতান। তলোয়ারবাহী সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। খোলা তলোয়ার। সুলতানের আগে আগে যে তলোয়ার নিয়ে চলে, বাদশাহী ভাষায় তাকে বলে 'শিলাহ্‌দার'। রগচটা সুলতানের চোখে আপত্তিকর কিছু পড়লেই শাস্তি পেতে হয়। অনেক সময় সুলতান নিজের হাতেই শাস্তি দেয়। তারপরে খারিজ, নির্বাসন এবং অন্যান্য শাস্তি।

ফতে শার সামনেই একদিন, হারেমের একটি মেয়ের কথা শুনে হেসে ফেলেছিল বারবক। সেটা পাঁচ বছর আগের কথা। তখনো সে খাওয়াজা-সেরা হয় নি। সে বরাবরই একটু চপলমতি। খোজা হিসেবে মেয়েদের প্রিয় ছিল। মেয়েরা যে তাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, 'তোমার মত দেখতে এত বড় বিরাট চেহারার লোকটাও খোজা। তুমি তো সুলতানের থেকে মাথায় উঁচু।' এমনি সব নানান ঠাট্টা করত। এখনো করে। এবং আরো অনেককিছু করে, করায় বারবককে দিয়ে। মেয়েরা তাকে পছন্দ করে। তবু মুখে থুতুও ছিটিয়ে দেয় এবং একেবারে উলঙ্গ হয়ে হেসে লুটোপুটি খায় চোখের সামনে। বারবক অনেকটা অবুঝ, বহুদূরাগত কলরোলধ্বনি শুনতে শুনতে সে-দৃশ্য দ্যাখে।…

পাঁচ-বছর আগে, হারেমে প্রহরা দেবার সময়, সেই দিন সুলতানের আসবার কোন স্থিরতা ছিল না। ফতে শা হঠাৎ এসেছিল। হারেমের বাইরে, যেখানে, হারেমের প্রহরী খোজাদের কিছু ঘর রয়েছে, সেখান থেকে সহসা ঘোষণা শোনা গিয়েছিল, সুলতান আসছেন। রাত্রের আগেই, দিনের বেলা সুলতান কখনো বড় একটা হারেমে আসে না। তাই চুপি চুপি কথা, ত্রস্ত ছুটোছুটি পড়ে গিয়েছিল। কেন না, সুলতান যে কেবল অসময়েই এসেছিল, তা নয়। সঙ্গে তার হাবশী খোজা শিলাহ্‌দারও ছিল।

সুলতান এসেই, একটি বিশেষ কক্ষে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই একটা কিছু শুনে ফতে শাহ্‌ সেইভাবে চলে এসেছিল। বোধহয় হাতে নাতে কাউকে ধরবার ফন্দি ছিল। কারণ হাতেমকে বিশ্বাস নেই। সুলতান ছাড়াও, হারেমের প্রিয় পুরুষ আরো দু একজন ছিল। কখনো তার বেশী। কেবল মাত্র বাদশাহই হারেমের পুরুষ না। কিন্তু তা অত্যন্ত গোপনে। ধরা পড়লে, শুধু একজন দুজনের শূল নয়, অনেকের।

ফতে শাহ্‌ সেইরকম কিছু শুনেই এসেছিল বোধহয়। কিন্তু সোজা যে বেগমের ঘরে সে গিয়েছিল, সে বেগম তখন বাঁদীদের দিয়ে দেহ পরিচর্যা করছিল। তার সংবাদটা ভুল পায় নি ফতে শাহ্‌। তবে হারেমে প্রবেশের অন্য এলাকায় তখন যে প্রৌঢ়া বাঁদী উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল, ফতে শাহ্‌ জানতো না, সে বাঁদী নয়, বেগমের এক

দুঃসাহসী প্রেমিক। তাই ফতে শাহ্ বেশ প্রসন্ন মেজাজেই বেগম বিবিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, হাসতে হাসতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুলতানের সামনেই বারবক একটি বেগমের কথায় হেসে ফেলেছিল। হাসি সে চাপতে চেয়েছিল, পারে নি। ফতে শা তৎক্ষণাৎ তলোয়ার তুলে তার কোমরের নিচে আঘাত করেছিল। কিন্তু সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। পোশাক ভিজিয়ে উপচে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল, হারেমের বারান্দার মেঝেয়। ফতে শা শিলাহ্দারের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে, দাঁড়িয়ে দেখেছিল খানিকক্ষণ। তা পরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বান্দা, তোর হাসবার সাহস হল কেন ?'

বারবক বলেছিল, 'মাপ করুন শাহ্-ই-আলম, আমি নিজেও জানতাম না যে হেসে ফেলব।'

ফতে শা তখুনি সেই বেগমটির হদিস নিয়েছিল। তার সঙ্গে ভিতরে গিয়ে কথাবার্তা বলেছিল। এবং বেগমটির মতামত শুনে একটু যেন অনুতপ্ত হয়েছিল। বেগমটি জানিয়েছিল, 'বারবক খুব বশংবদ, সুলতানের ভক্ত, বিবিদের সবাইকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করে, বিবিরা সবাই এই সুন্দর খোজাটিকে ভালবাসে। সুলতান তো জানেন, এই সব খোজাদের বেগমরা অওরত বলেই মনে করে।'

সুলতান বেরিয়ে যাবার আগে হুকুম দিয়েছিল, 'শাহীমঞ্জিলের অন্তরঙ্গকে ডেকে একে একটু ওষুধ দিতে বল, এর কিছুদিন শুয়ে থাকবার ব্যবস্থা কর। এর সহ্য-শক্তি দেখে আমি খুশি হয়েছি।'

রক্ত তখন ঢালুতে একটা রক্তবর্ণ সাপের মত, সর্পিল গতিতে গড়িয়ে যাচ্ছিল। বারবকের পা কাঁপছিল থরথর করে। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল।

ফতে শা যাবার সময় বলেছিল, 'বান্দা, আর কখনো আমার সামনে হাসিস না।

বারবক শুকনো গলায় জবাব দিয়েছিল, 'গোস্তাকি মাপ করুন শাহ্-ই-আলম।'

ফতে শা চলে গিয়েছিল। দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে বসে পড়েছিল বারবক। তখন দিনের বেলা ছিল। সুলতান তখন তার বিবাহিতা বেগমের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাচ্ছিল। বারবককে দেখবার জন্যে কেউ বেরিয়ে আসে নি, কোন বিবিই নয়। কারণ, তাদের ভয় ছিল, বারবককে তখন কেউ সমবেদনা জানাতে গেলে, সে সংবাদ কোন অনুচরের মারফত সুলতানের কানে যাবে। গেলে, সেই বিবির আর রক্ষে থাকত না। হয়তো এই শাহীমঞ্জিলের গড়খাইয়ের গভীর জলেই পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দিত। কয়েকজন হারেমের খোজা তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। অন্তরঙ্গ অপেক্ষা করছিলেন, মঞ্জিলের চৌহদ্দির মধ্যেই, খোজাদের আস্তানায়।

অন্তরঙ্গ অর্থাৎ চিকিৎসক। বাঙালীদের মুখে উচ্চারিত চিকিৎসাশাস্ত্রীর এই 'অন্তরঙ্গ' বিশেষণটি পাঠান সুলতানেরাও উচ্চারণ করতেন। স্বভাবতই অন্তরঙ্গ বলতে চিকিৎসকই বোঝাত। অন্তরঙ্গের চিকিৎসার সময়ে বারবক প্রায় সম্পূর্ণ অচৈতন্য ছিল। সকলেই ভেবেছিল, সে মারা যাবে। কিন্তু মরে নি। তাকে আবার দেখে ফতে শা বলে উঠেছিল, 'বান্দা, তুই মরিস নি? তা হলে নিশ্চয়ই খোদার কোন মর্জি আছে তোর ওপরে। এবার থেকে তুই খাওয়াজা-সেরার সঙ্গী হিসেবে কাজ করিস।'...

অন্ধকার অলিন্দে এই দুর্যোগের রাত্রির বিজলী যেন বারবকের চোখেই হানল। সে ফতে শার কথা উচ্চারণ করল, 'তা হলে খোদার কোন মর্জি আছে তোর ওপরে।' মর্জি, খোদার মর্জি! কী মর্জি? খোদার কোন্ মর্জি পালনের জন্যে সেদিন বান্দা বেঁচেছিল?

আর একবার বারবকের ডান থাবা তার তলোয়ারের হাতলে শক্ত হয়ে চেপে বসল। এবং সে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'আমি বান্দা, বান্দা! আর ফতে শা কে? বান্দা নসীর খানের বংশধর না? বান্দার রক্ত তার গায়েও আছে।'

ভাবতে ভাবতেই, বারবক হঠাৎ যেন অসহায় হয়ে পড়ে। হাতের মুঠি শিথিল হয়ে যায়। আর বাতাসের শব্দে চুপিচুপি স্বর মিলিয়ে বলে ওঠে, 'নসীরা খানের রক্তের পরিচয় তবু ফতে শার আছে। আর আমার? কে, কারা আমার পূর্বপুরুষ? কে আমার বাবা, কে আমার মা? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি হাবশী নয়, সবাই বলে। আমি নাকি পাঠানও নই, আরবী নই, পারসী নই, তবে আমি কোন্ দেশের? কোথা থেকে এসেছি? আর আমি খোজাই বা কেন? কে আমাকে খোজা করেছে? কারা? হে খোদা, আহ্ আল্লাহ্! বান্দার কি মায়ের পেটে জন্ম হয় না? খোজা কি গাছে জন্মে শাহীমঞ্জিলে এসে পড়ে? হাবশী খোজা থেকে শুরু করে অধিকাংশ খোজাই তাদের নিজেদের কোন পরিচয় জানে না।... হায়, কী পাপ করলে মানুষ তার আত্মপরিচয় থেকে বঞ্চিত থাকে?'...

—হিদ্না, সরাব।

বামন সরাবের পাত্র তুলে দিল। বারবক গলায় ঢালল। তখনো ভাল করে

ঢালা হয় নি, বারবক শুনতে পেল, তুই এখনো মদ খাচ্ছিস উল্লুক, কাটাদুয়ারের দরবেশের কথা তুই ভুলে গেছিস ?'

সুরা চিবুকে চলকে পড়ল। গলা বেয়ে পোশাকে পড়ল। মুখের কাছ থেকে পাত্র সরিয়ে বারবক বলে উঠল, 'কে কে ?'

বামন বলল, 'নানীর গলা মনে হল।'

নানী, জন্নতোন্নিসা বেগম ! একদা তাই ছিল। আজকের বুড়ি নানী জন্নত, জন্নতোন্নিসা বেগম ছিল। এখন দাসী। নসীরা খানের সময়ের খুবছুরত বিবি, যার এখন বৃত্তি নিয়ে বাতিল বিবিদের আবাসে থাকবার কথা, সে নিজে থেকেই দাসীবৃত্তি গ্রহণ করেছে। বাতিল বিবিদের জীবনের কোন দামই নেই। গৃহের পরিত্যক্ত মালপত্রের মতই তাদের জীবন। অথচ বাতিল বিবিদের আবাসে থাকলে কোন স্বাধীনতাই থাকে না। তাই শাহীমঞ্জিলের দাসীবৃত্তি গ্রহণ করেছে সে। যে হারেমে সে একদা রূপের হাটে বিকিয়েছে, রূপ দিয়ে আদর-সোহাগ কিনেছে, আজ সেই হারেমেই সে খিদ্‌মদগারনি। সে নিজে যেচেই এসেছে। তাকে কেউ জোর করে আনে নি। হারেমের বেগমদের সে ফাইফরমায়েস খাটে, হাসি-ঠাট্টারঙ্গ করে, আর পুরনো দিনের গল্প বলে।

বৃদ্ধাকে সকলেই খাতির করে। তার কাছে পুরনো দিনের কাহিনী শুনতে সকলেই ভালবাসে। কত বিচিত্র আর আশ্চর্য সে সব কাহিনী। প্রাসাদের এক অংশে দরবারে যখন সুলতান দেশশাসন করতে বসে, উজীরে-আজম থেকে সরে-লস্করেরা সব আসে, সুলতানের কোলের ওপর খোলা তলোয়ারের দিকে তাকিয়ে রাজ্যের নানান বিষয়ের বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে, তখন হারেমে বুড়ি জন্নতের আসর বসে। সোনার কুটোকাটি দিয়ে তৈরি যেন বুড়ির মুখ। টুকটুকে রং মুখের শিথিল চামড়ায় অগুনতি রেখা। তাই মনে হয়, সোনার কুটোকাটির মুখ। দাঁত নেই আর একটিও। তবু পান ছেঁচে মুখে নিয়ে পাক্‌লে পাক্‌লে খাওয়া চাই। তাই বুড়ির ঠোঁট সবসময়ে টুকটুকে লাল। কালো চোখের তারা এখন পুরনো ঘসা-পাথরের মত দেখায়। মাথায় শননুড়ি চুল, অযত্ন আর উকুনের জ্বালায় কেটে দিয়েছে নিজের হাতেই। এই গৌড়ের সে যেন আদিকালের বুড়ি। কত কথা সে জানে। কত সংবাদ। গুপ্ত আর প্রকাশ্য অনেক ঘটনা সে নিজে প্রত্যক্ষ করেছো। অনেক ঘটনায় নিজেই অংশগ্রহণ করেছে।

কিন্তু বুড়ি জন্নত যখন হাসে রঙ্গ করে, তখন একরকম। যখন যৌবনের কাহিনী, হাহাকারের কথা বলে, তখন আর একরকম রূপ আছে বুড়ি জন্নতের। সেই রূপ

দেখেছে শুধু বারবক। আর কেউ না। শাহীমঞ্জিলের আর কেউ তাই জন্নতকে সঠিক চেনে না। তারা মনে করে, বুড়ি শুধু হাসে, বুড়ি শুধুই কাঁদে। তার জানে না, বুড়ি সুলতানশাহীর কুটিল অন্ধকারে, গিরগিটির মত চলেফিরে বেড়াচ্ছে। নিঃশব্দচারী, রক্তাভ কম্পিত গলকম্বলের মত, শিকারীদৃষ্টি গিরগিটি। জন্নতের শিথিল গলাও ঝুলে পড়েছে, নিশ্বাসের টানে গিরগিটির গলার থলির মতই কাঁপে। তখন তার মুখের রেখাগুলি আরো গভীর গাঢ় হয়ে ওঠে। ঠিক যেন পুঁয়ে সাপের মতো সারা মুখে কিলবিল করে বেড়ায়। তখন তার বুড়োটে গলায় এক আশ্চর্য যুবতী ঝঙ্কার বাজে যেন। আড়াল থেকে শুনলে মনে হয় কোন অল্পবয়স্ক মেয়ে কথা বলছে। সামনে থেকে শুনলে জন্নতকে তখন ভয়ঙ্করী লাগে। মনে হয় এই বার্ধক্য, তার ছদ্মবেশ যেন। মনে হয়, এই বৃদ্ধা কায়ায়, সে এক মায়াবিনী।

মনে আছে বারবকের, একদিন সে সুলতানের সোনার পাত্র থেকে লুকিয়ে সুরা-পান করেছিল। তার শখ হয়েছিল, সুলতানের সোনার পাত্রে সে সরাব পান করবে। একদিন, সুযোগ পেয়ে সোনার পাত্রে চুমুক দিয়ে মুখ নামিয়েই দেখেছিল, সামনে জন্নত। বারবক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলে উঠেছিল, 'হেই নানী, তোমার পায়ে পড়ি, সুলতানের কানে যেন কথাটা না যায়।'

বুড়ি খিলখিল করে করে হাসতে পারে নি, কিন্তু সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে হিসহিস শব্দে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিল। বলেছিল, 'ওরে বান্দা, ওরে খোজা, সুলতানের সোনার পিয়ালায় চুরি করে সরাব গিলছিস ?'

—দোহাই তোমার পায়ে পড়ি নানী, গলাটা একটু নামাও। বান্দাকে জানে বাঁচাও। হঠাৎ কেমন শখ হল, দেখি একবার সুলতানের পেয়ালায় মদ খেতে কেমন লাগে, তাই খাচ্ছিলাম।

বুড়ি ঘষা পাথরের মত চোখের তারা ঘুরিয়ে বলেছিল, 'তা কেমন দেখলি ?'

বারবক বলেছিল, 'এ তো তুমি আমার থেকে ভাল জান নানী, সোনার পেয়ালায় তুমি অনেক চুমুক দিয়েছ। আমি সরাবের কোন উনিশ-বিশ বুঝতে পারলাম না। সত্যি বলতে কি, শহরের বাইরে জঙ্গলে বসে আমি পাইকদের সঙ্গে শালপাতার দোনায় ভরে যে মাল টানি, তাতে আমার নেশা বেশ জমে।'

জন্নত হেসে লুটিয়ে পড়ে বলেছিল, 'আরে, তা তো জমবেই রে, বান্দা কি কখনো সুলতানি নেশা জানে ? তুই খাস তালগাছের রস, আর এ হল ইরানের চোলাইকরা ফারকোর হাতে বানানো, ফলের রসে তৈরি। তুই এর স্বাদ কি বুঝবি।'

—কিন্তু স্বাদটা নানী সত্যি চমৎকার। নেশাও যেন এর মধ্যেই একটু একটু লাগছে। তবে এ সোনার পেয়ালায় কী লাভ হয় বুঝতে পারছি না।

—তবে তুই খাচ্ছিলি কেন ? তোর শখ হল কেন ?

—সত্যি বলব নানী ?

চোখ পাকিয়ে বলেছিল জন্নত, 'নইলে তোর গর্দান যাবে না ?' বারবক গলা নামিয়ে প্রায় চুপিচুপি বলেছিল, 'মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, লুকিয়ে একটু সুলতানি করি। ইচ্ছে হয় ফতে শার মত আরাম করে গদীতে বসে সোনার পেয়ালায় মদ খাই।'

জন্নত তখন বারবকের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। স্থির অপলক চোখে তাকিয়েছিল, আর তার মুখের রেখাগুলি সোনালি রঙের পুঁয়ে সাপের মতই কিলবিল করে উঠেছিল। বলেছিল, 'তা লুকিয়ে লুকিয়ে শখ করে কেন, সত্যি সত্যি সোনার পালঙ্কে পা ছড়িয়ে বসে খেলেই তো পারিস।'

জন্নত বুড়ির সেই মুখখানি দেখে বারবকের বুকটা কী রকম করে উঠেছিল। সরু টান টান গলার স্বর শুনে মনে হয়েছিল, ছদ্মবেশ ধরে যেন তার সামনে অন্য কোন বেগম দাঁড়িয়ে আছে। বারবক ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী করে ?'

জন্নত নিচু সরু গলায় বলেছিল, 'যেমন করে সব সুলতানেরাই খায় ?'

বারবক অবাক হয়ে তাকিয়েছিল জন্নতের মুখের দিকে। কিন্তু যেন বুড়ির চোখে চোখ রাখতে পারছিল না। তার গলকম্বল সহসা যেন বড় হয়ে উঠেছিল, নিঃশ্বাসের টানে কাঁপছিল। নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছিল, শনুনুড়ি কাটা কাটা চুলগুলি সারা মুখের চারপাশে তখন কতকগুলি দলাপাকানো সরীসৃপের মত দেখাচ্ছিল।

বারবক বলেছিল, 'ঠাট্টা করছ নানী ? আমি একটা বান্দা।'

—উল্লুক তুই, নানী কখনো ঠাট্টা করে না।

বলেই জন্নত চলে যাবার জন্যে ফিরেছিল। বারবক কোন কথা বলতে পারছিল না। জন্নত নিজেই আবার বারবকের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। বুড়ির দেহের রক্তকোষের সমস্ত রক্ত তখন তার মুখে। মনে হচ্ছিল যেন, রক্তমাখা একটা ডাইনীর মুখ সেটা! বলেছিল, 'ফতে শা বান্দার বংশধর নয় ? নসীরা কি শামসুদ্দীন আহম্মদ শাহের গোলাম ছিল না ? নসীরা নসিরুদ্দীন মাহমুদ শা নাম নিয়ে, কী করে পালঙ্কে বসে সোনার পেয়ালায় মদ খেয়েছিল ?'…

কথা শেষ করবার আগেই বুড়ি পিছন ফিরে দ্রুত অদৃশ্য হয়েছিল শাহীমঞ্জিলের গহ্বরে। বারবক চাপা গলায় ডেকে উঠেছিল, 'নানী!

আর কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। বারবক কেবলি উচ্চারণ করেছিল, 'কী বলে গেল বুড়ি? কী কথা বলে গেল!'

লহমায় সুলতানের সোনার পাত্র তুলে গলায় সরাব ঢেলেছিল বারবক। তার মাথার মধ্যে যেন দপদপ করছিল। তার সারা গায়ে যেন আগুন ঢেলে দিয়ে গিয়েছিল বুড়ি। সে বারে বারেই উচ্চারণ করেছিল, 'ডাইনিটার কথার মানে কী? ও আমাকে কী বলতে চাইল? আমার গায়ের মধ্যে এরকম করছে কেন? আমার মাথার মধ্যে যেন তাঁতীর মাকু দৌড়ুচ্ছে। মাকু দৌড়ুচ্ছে খটখট করে, আর একটাই কথা বলছে, "বান্দা নসীরা কী করে সোনার পালঙ্কে বসে, সোনার পেয়ালায় মদ খেয়েছিল?" তার মানে কী? আমাকে কী বলতে চাইল? সর্বনাশী আমার মাথায় কী কথা ঢুকিয়ে গেল? আর সেই কথা আমার সমস্ত রক্তের মধ্যে এমন করে পাক খাচ্ছে কেন? আমি কী করব? আমি কী করব এখন?

যেন পাগল হয়ে উঠেছিল বারবক। ঠিক সেই মুহূর্তের বিভ্রান্ত উন্মাদনায় বুঝতে পারে নি, কী ভয়ংকর মন্ত্র ছুঁড়ে দিয়ে গেল জন্নতোন্নিসা। বুঝতে পারেনি, সেই মন্ত্রের গুণ কোন আলৌকিকতার পথে টেনে নিয়ে যাবে।

বারবক ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল। হারেমের দিকে নয়, বাইরের দিকে, গড়-খাইয়ের প্রাকারের দিকে বাগিচায়, স্তব্ধ দুপুরে সে ছুটে গিয়েছিল, এবং প্রহরারত একজন হাবশীকে সহসা, খাপ থেকে তলোয়ার খুলে আঘাত করেছিল। হাবশী প্রহরী কিছুই পারে নি, অপ্রস্তুত অবস্থায় বারবকের আক্রমণকে প্রতিহত করতেও পারে নি। সে বোধ হয় অবাক হয়েছিল। বারবক উন্মাদ হয়ে গিয়েছে ভেবে ছুটে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু বেচারী সে সুযোগ পায় নি! এক কোপে ধড় থেকে তার মাথাটা নামিয়ে দিয়েছিল। নামিয়েই সেই রক্তাপ্লুত ছটফট-করা দেহটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল, 'একি করলাম? কাকে মারলাম? আমি রক্ত দেখবার জন্যে এত লালায়িত হয়ে উঠলাম কেন? কে আমায় এমন করে ছুটিয়ে নিয়ে এল? কে আমার মাথার মধ্যে খুন চাপিয়ে দিল? আমি কী চাই? কী চাই?'

খানিকক্ষণের মধ্যেই বাগিচায় অন্যান্য নায়েকেরা এসে পড়েছিল। আসবে জেনেই, হাবশীর তলোয়ারটা সে খাপ থেকে খুলেই রেখেছিল। স্বয়ং উজীর খান জহান খাঁ এসে উপস্থিত। বারবকের চেহারা দেখে, সকলেরই যেন ভয় করেছিল। তার রক্তাক্ত চোখ, দৃষ্টি যেন অপ্রকৃতিস্থ। কিন্তু আশ্চর্যরকম উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা

সেই মুহূর্তেই চালিত হয়েছিল। বলেছিল, 'আমি হারেমের ভেতর থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম, এই হাবশী পাঁচিলের বাইরে থেকে একটা লোককে গাছের আড়াল দিয়ে আসতে সাহায্য করছে। আমি আরো দেখেছি, একটা ছোট কিসের টুকরো, হারেম থেকে কে যেন হাবশীকে ছুঁড়ে দিল, সেদিকে গিয়ে আমি কাউকে দেখতে পেলাম না। হাবশী সেই টুকরোটা নিয়ে সুতোর পাক খুলে কী যেন বের করল, আর যে পাঁচিলের ওপরে, গাছের আড়ালে ছিল, তার হাতে দিল। আমার মনে হয়, একটা চিঠি ছিল সেটা। লোকটা যখন চিঠি পড়ছিল, সেই সময়েই হারেম থেকে আমি ছুটতে থাকি। এখানে এসে যখন পেঁছুলাম, তখন পাঁচিলের ওপরের লোকটা বাগিচায় নামবার চেষ্টা করছিল। আমি তাকেই ধরতে গেছলাম. কিন্তু এই হাবশী আমাকে বাধা দেয়, এবং আমাকে মারবার চেষ্টা করে। তখন আমাকে ওর সঙ্গে লড়তে হয়। ইতিমধ্যে সেই লোকটা পালিয়ে যায়।'

এমনভাবে সে বলেছিল, খান জহান খাঁ পর্যন্ত অবিশ্বাস করতে পারে নি। কেউই অবিশ্বাস করতে পারে নি। তার আর এক কারণ, সেই হাবশীর সঙ্গে বারবকের কোনরকম বিরোধ বা বিবাদ ছিল না। সেই হত্যার পিছনে কেউ কোন উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে পারে নি। উদ্দেশ্যহীন হত্যার কোন কারণ কারুর পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হয় নি! খান জহান খালি বলেছিল, 'এই হাবশীকে তুমি বাঁচিয়ে রাখলে, ওর মুখ থেকে সব কথা জানা যেত। কে এসেছিল, তাকে তুমি চিনতে পেরেছিলে ?'

বারবক বলেছিল, 'না, লোকটাকে আমি চিনতে পারি নি।'

কিন্তু তার একটা কল্পিত বর্ণনা দিয়েছিল সে। যাকে পোশাক বদলে দিলে, বারবকের নিজের চেহারাই মনে হত। কেন সে লোকটার সেরকম বর্ণনাই বা দিয়েছিল, তাও বারবকের জানা ছিল না।

খান জহান আরো জিজ্ঞেস করেছিল, কোন বেগমকে সে সত্যি দেখতে পেয়েছিল কিনা, সেটা সত্যি করে বলুক। বারবক জানিয়েছিল, উজীর তার জিভ কেটে নিতে পারেন, কিন্তু কোন বেগমকে সে দেখতে পায় নি। তবু খান জহান ছাড়ে নি। বলেছিল, কোন্ বেগমের এলাকা থেকে সেই একটা টুকরো ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা সে সুলতানকে ঠিক বলতে পারবে কিনা। বারবক বলেছিল, তা সে পারবে।...এবং তা সে পেরেছিল। সে যে-বেগমের এলাকা দেখিয়েছিল, সেটা ছিল ফতে শার খাসবেগমের মহল। স্বয়ং শামসুদ্দিন উসুফ শাহের তুর্কী বেগমের

গর্ভজাতা, সম্পর্কে ফতে শার নাতনী, পাগলা সিকন্দরের দিদি, সিকন্দরের বুয়া, ফতে শার বিবাহিত বেগম।

বেগম অবাক হলেও, অস্বীকার করতে পারে নি। অসম্ভব কি, তার মহলের এলাকা থেকে যদি কেউ কিছু ছুঁড়ে দেয়? সেটাই তো সব থেকে নিরাপদ মহল। খোজা যে মিথ্যে বলছে, তা বেগমের মনে হয় নি।

তারপর ফতে শা স্বয়ং কথা বলেছিল তার সঙ্গে। কথা কিছুই বলে নি, কেবল চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। তারপরে তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়েছিল সুলতান। জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার উরুতের দাগটা আছে?'

—আছে খোদাবন্দ।

—দেখি।

দেখিয়েছিল বারবক। তারপরে ফতে শা বলেছিল, 'উজীরকে আমি হুকুম দিয়েছি, তোমাকে এই মঞ্জিলশাহীর খাওয়াজা-সেরার পদ যেন দেওয়া হয়।'

আভূমি নত হয়ে বারবক কুর্নিশ করেছিল সুলতানকে। ফতে শা আবার বলেছিল, 'এ সবই খোদার মর্জি, হয়তো এইজন্যেই তোমাকে সে একদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বান্দা, বেগমদের কথায় আর হাসিস না তো?'

—না শাহ্-ই-আলম।

—যা

বারবক চলে এসেছিল সুলতানের কাছ থেকে। সেই থেকে শুরু। হাতে রক্ত মাখা সেই থেকে শুরু। আজও জানে না, জন্নতের কথা শুনেই কেন সহসা তার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। কিন্তু সেই খুন তার মাথা থেকে আর নামে নি।

সেই খুন তার মাথা থেকে আর নামে নি, এবং জন্নতের মন্ত্রপড়া আর কখনো থামে নি। তারপর থেকে দিনের বেলা শাহীমঞ্জিলের কাজ তার শেষ হয়ে গিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে সে রাত্রের শাহীমঞ্জিলের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল, এবং রাত্রে, প্রহরে প্রহরে তার কানের কাছে জন্নতের ডাইনী স্বরের মন্ত্র গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, 'বান্দাও সোনার পেয়ালায় মদ খায়। খোদা শুধু সাহসীদের জন্যেই সোনার পেয়ালায় সরাব খাওয়ার বরাদ্দ করেছেন।'…

সেই থেকে শুরু। বারবক ছিল টাট্টু ঘোড়ার মত চঞ্চল। দীর্ঘদেহ, চওড়া বুক, ক্ষীণ কটি, পেশল শরীর এবং গৌড়ীয় স্নিগ্ধ গৌরবর্ণ কান্তি। কালো চোখ, টিকল নাক, রক্তাভ ঠোঁট, এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল। নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে সুন্দর খোজাটা সকলের সকল আদেশ পালন করত। ক্লান্তি ছিল

না বিন্দুমাত্র, কিন্তু সারা মুখে প্রাণ-চাঞ্চল্যের ঝলক লেগে থাকত, প্রসন্নতায় চকচক করত। ঈষৎ লজ্জার আভাস থাকত, মুখের সাদা হাসিতে। বেগমরা বলত, 'বারবক খাসীটাকে আমার কেটে খেতে ইচ্ছে করে।'

সেই উগ্র বীভৎস বাসনার মধ্যেও তার প্রতি সকলের একটা প্রীতি ও ভালবাসা টের পাওয়া যেত। তার চেহারা, তার খুশি চঞ্চল ব্যবহার, সবাইকেই খুশি করত। কিন্তু, জন্নতের মন্ত্র যেদিন থেকে তার কানে গিয়েছিল, সেদিন নিজের হাতে খুন করবার বাসনা সহসা বিবর থেকে লাফিয়ে পড়া সাপের মত বেরিয়ে পড়েছিল এবং রক্ত মাখিয়েছিল। সেইদিন থেকে তার বাইরের চঞ্চলতা দূর হয়ে যেতে লাগল। সে যেটুকু চঞ্চলতা এখন দেখায়, তা ছলনা মাত্র। তার সেই হাসিখুশি এখন সরীসৃপের গর্তের ভিতরে গুঁড়ি মেরে চলার মত নিঃশব্দ হয়ে গিয়েছে। রক্ত-পিপাসু সরীসৃপের মত এখন সে সতর্ক মন্থরগামী। ঠিক তার উরুতের থেকে বেয়ে পড়া রক্তের ধারা একদিন যেমন রক্তবর্ণ সাপের মত হারেমের বারান্দায় গড়িয়ে গিয়েছিল।...

জন্নতের গলার স্বর অন্ধকারে শোনা যেতেই, খুব কাছেই একটা বাজ পড়ল। চকিত বিজলীঝলকে সবকিছুই ঝল্‌কে উঠল, এবং শাহীমঞ্জিলের দেয়াল ও থাম-গুলি যেন থরথরিয়ে উঠল। বৃষ্টির আওয়াজ একটু জোর হল। পর পর আরো কয়েকবার বিজলী হানল, অসি ও বর্শাগুলি হাতে হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

বারবক ব্যাকুল চোখে আশেপাশে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কোথায়, নানী কোথায় ?'

হিদ্‌না বলল, 'আমার মনে হয়, এই পাশের ঘরেই আছে।'

বারবক দু পা এগিয়ে বহিঃকক্ষের যে দরজা পেল, তার ভিতরে ঢুকল পর্দা সরিয়ে। সেখানে কোন বাতি ছিল না। যদিও প্রতি কক্ষেই বাতি থাকার কথা। কোন ঘরের বাতিই নেভাবার অনুমতি ছিল না বারবকের।

বারবক বলে উঠল, 'এ ঘরে বাতি নেই কেন ?'

অন্ধকারের ভিতর থেকে জবাব এল, 'আমি নিভিয়ে দিয়েছি।'

সরু মেয়ে গলা, কিন্তু যেন তাতে একটা অলৌকিক জগতের সুর। যেন কোন

পাতালরন্ধ্র থেকে কেউ কথা বলছে। এ গলা জন্নত বুড়ির। বারবক বলে উঠল, 'তুমি কোথায় নানী, তুমি কোথায়? আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

জন্নতের গলা শোনা গেল, 'আর আমি দেখছি, তুই সবসময়ে সরাব টেনে চলেছিস।'

বারবক বলল, 'সেজন্যে তুমি ভেব না, সরাব আমাকে হিম্মত দেয়, আমাকে সাহস দেয়। কিন্তু নানী আমার মনটা খুব খারাপ রয়েছে, তুমি একবার আমার কাছে এস।'

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও একটি অস্পষ্ট ছায়া যেন দেখতে পেল বারবক। নিঃশ্বাস শুনতে পেল কাছে। জন্নতের গলাই আবার শোনা গেল, 'মন খারাপ কিসের? কোথাও কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে?'

বারবক বলে উঠল, 'না না নানী, সেদিকে সব ঠিক আছে নানী, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি কে জানতে পারি না, কারা আমার বাবা-মা? দেখ, সব বান্দারই বাপ-মা থাকে, আমার বাপ-মা কে, তা কি আমি কোনদিন জানতে পারব না?'

জন্নতের তীব্র বিদ্রূপভরা গলা যেন শ্লেষের হাসির সঙ্গে উচ্চারণ করল, 'মাতাল! মাতলামি!'

বারবক ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল, 'খোদার নাম নিয়ে বলছি, আমি মাতাল হই নি। নানী, তুমি আমাকে কখনো মাতল হ'তে দেখেছ?'

—তবে এই সব কথা এখন চিন্তা করবার কারণ কী?

—আমি জানি না নানী। আমি ভাবছিলাম ফতে শার বাবা ছিল, হয়তো, এই মামুদশাহীর পয়লা সুলতান বান্দা নসীরারও বাবা ছিল! ওরা যে পাঠান, সে কথা ওরা জোর গলায় বলে। আমি জানি না, আজ আমার কেন জানতে ইচ্ছে করছে, কারা আমাকে জন্ম দিয়েছিল। নানী, নানী, তুমি যা বল, তাই কি সব? আর কি তুমি সত্যি কিছু জান না আমার সম্পর্কে?

বারবক অন্ধকারে হাত দিয়ে জন্নতের গা স্পর্শ করল। স্পর্শ করতেই চমকে উঠল। তার গাটা যেন শিউরে উঠল। আবার বলে উঠল, 'একি, তোমার গায়ে কোথাও আগুন রেখেছ নাকি? আমার যেন হাত পুড়ে যাবার মত হল?'

জন্নতের গলার ফিস্‌ফিস্ শব্দে হাসি শোনা গেল। বলল, 'না, আমার গা এইরকম গরম রে নাতি।'

—কেন? তোমার কি জ্বর এসেছে?

—হ্যাঁ, তোর জন্যেই আমার জ্বর এসেছে। [illegible] রাত্রের পর কাল হয়তো আমি

মরে যাব। তুই কখন হারেমে আসবি, এই কথা ভেবেই আমার গা আপনা থেকে গরম হয়ে উঠছে। কিন্তু সে কথা যাক। তোকে আমি যা বলেছি, তার বেশী আমি কিছুই জানি না তোর সম্পর্কে।

বারবক যেন নিচু হয়ে হাঁপাতে থাকে। নিচু নিস্তেজ স্বরে বলে, 'তখন যদি সেই বৈরাম খাঁকে জিজ্ঞেস করতে নানী, আমাকে সে কার কাছ থেকে কিনেছিল, তা হলে হয়তো জানা যেত, আমি কোথা থেকে এসেছিলাম।'

জন্নত বলল, 'তোর বুদ্ধিসুদ্ধি বেবাক গেছে। আমি কি বৈরাম খাঁকেই কখনো চোখে দেখেছি নাকি। আমাকে যে বলেছিল সে ছিল এক খোজা, আমি তার কাছে শুনেছি, নতুন একটা ছেলে খোজাকে কেনা হয়েছে। সে বাংলা বুলি বলে।'

—বাংলা বুলি বলে? বাংলা? কই এ কথা তো তুমি কখনো বল নি নানী?

—বলি নি? তা হলে ভুলে গেছি রে নাতি। কতকাল আগের কথা। আমার হিসেবে এখন তোর ছত্রিশ বছর বয়স। তখন তুই ছিলি সাত-আট বছরের ছেলে। সাত-আট বছরের খোজা ছেলে।

—আর তখনই আমি খোজা ছিলাম, না নানী?

—হ্যাঁ বাছা, তুই তখনই খোজা ছিলি। খোজা ছিলি বলেই তোকে সেই সময়ে সুলতান কিনেছিল। নইলে মেয়েমানুষ ছাড়া, আর কোন্ মানুষকে সুলতানরা কেনে। বান্দা? সুলতানরা তো যাকে খুশি তাকেই বান্দা করতে পারে। বান্দার থেকে খোজার দাম বেশী।

বারবক বলে উঠল, 'সেইজন্যই আমাকে সবাই বারবক বাঙালী বলে, না?'

—হ্যাঁ, তুই বাঙালী, এটাই সবাই জানে।

—কিন্তু আমি যে এসেই বাংলা বুলি বলেছিলাম, সে কথা আমি আজ জানলাম নানী। কিন্তু নানী, সেই খোজা তোমাকে আর কী বলেছিল আমার কথা, বল না। আমার আজ শুনতে ইচ্ছে করছে! তুমি তো বলেছিলে সেই খোজা তোমাকে অনেক কথা বলেছিল।

—সে কথা তো অনেকবার বলেছি।

—আজ আর একবার বল নানী, এই শেষবার। কাল থেকে আমি আর এই খাওয়াজা-সেরা বারবকের কোন কথাই তোমাকে জিজ্ঞেস করব না।

বলতে বলতে বারবকের নিচু স্বরে আবার উত্তেজনা প্রকাশ পেল। জন্নতেরও

দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছিল। কিন্তু এখন তার গলা আর আগের মত সরু ও পাতাল-চাপা শোনাল না। বুড়ি মেয়েমানুষের ভাঙা গলা যেমন হয়, তেমনি শোনাল। সে বলল, 'বৈরাম খানের কাছে খোজা কী বলেছিল, সেকথা এখন থাক। আমি তোকে যা বলছি, তুই তাই শোন্। আমি যা বলছি, তাই সত্যি, বুঝলি রে নাতি। তুই খোজা, আমি এক পুরনো বুড়ি বেগম। কিন্তু তুই যেখান থেকে এসেছিস, আমিও সেখান থেকেই এসেছি। তুই চুরি-করা ছেলে, আমি চুরি-করা মেয়ে। শুনেছি সুলতানের সিন্ধুকীরা আমাকে চুরি করে এনেছিল। আমারও আগে আগে তোর মত মনে হত, আহা যদি সেই সিন্ধুকীকে খুঁজে পেতাম। কিন্তু সিন্ধুকীদের দেখা কোনদিনই বেগমরা পায় না।…এই সিন্ধুকীরাই সুলতানের মেয়েমানুষের যোগানদার, জানিস তো। কেন যে ওদের সিন্ধুকী বলে, কে জানে। সুলতানরা ওদের হাতে তুলে দেয় সোনা, মানিক, টঙ্কা, ওরা সারা জগৎ-সংসার ঘুরে ঘুরে হারেমের জন্যে মেয়েমানুষ ধরে আনে। শুধু মেয়েমানুষ হলে তো হয় না, সুন্দরী রূপসীদের সেরা সেরা মেয়েদের নিয়ে আসা তাদের কাজ। সিন্ধুকীরা নানাভাবে ঘুরে বেড়ায়, যাতে তাদের কেউ চিনতে না পারে। কখনো দরবেশ ফকিরের বেশে, কখনো বেনের বেশে, গাঁয়ে-গাঁয়ে শহরে-শহরে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে টঙ্কা বাজিয়ে কাজ হয়, সেখানে টঙ্কা বাজায়। যেখানে তা তা হয়, সেখানে রক্তারক্তি। এক মেয়ের জন্য হয়তো গোটা বাড়ির লোক খুন। তা সে রক্তারক্তি হয় নিজের রাজ্যে। এখানকার সিন্ধুকী গিয়ে তো আর ইরানে-তুরস্কে মারামারি করতে পারে না। তা হলে জান রেখে আসতে হবে। তখন চুরি করতে হয়। টাকা দিয়ে না কেনা গেলেই চুরি করতে হয়। তখন ইরান-তুরস্কের লোকেরাও টাকা খেয়ে মেয়েমানুষকে চুরি করে বের করে দেয়। দুনিয়ার হরময়ন (মক্কা ও মদিনা) আছে, মাথার উপরে খোদা আছে, কাঁটাদুয়ারে মান্দারনে জাগ্রত গাজী আছে, তবু ওরে নাতি, সিন্ধুকীর কাজের কামাই নেই। হারেমে মেয়েমানুষ চাই, যেমন কসাইয়ের দোকানে রোজ মাংস চাই।…জানবি সংসারে একমাত্র মেয়েমানুষের জাতবিচার করে না পুরুষে। বিবি সে বিবি, অওরত, তার কোন জাত নেই। সিন্ধুকীরা তাই কোন জাতকে ছেড়ে কথা কয় না। জিম্মি তো দূরের কথা, মুসলমানের মেয়েও যদি খুবছুরত হয়, গোরা রঙ, ডাগর চোখ, তাহলে তার বয়স যত কমই হোক রেহাই নেই। সিন্ধুকী তাকে নিয়ে এসে সুলতানকে উপহার দেবে, আর মুঠি ভরে সোনা নিয়ে যাবে।'…

নিজের কথা শোনবার জন্যে ব্যগ্র-ব্যাকুল হলেও জন্নত বুড়ির গলায় এমন একটি

আবেগ মথিল হচ্ছিল, এনন একটা কষ্টের সুর বাজছিল, বারবক তাকে বাধা দিতে পারছিল না। সে শুনছিল। জন্নত বলছিল, 'আমি জানি না, সিন্ধুকীরা আমাকে কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল। এত অল্পবয়েসে নিয়ে এসেছিল যে, আমি আমার বাবা-মায়ের কথা মনে করতে পারি না। যেখানে হারেমের জন্য মেয়েমানুষদের পোষা হয়, আমাকে সেখানেই রাখা হয়েছিল। আমি জানি না, আমি হিন্দু না মুসলমান। আমাকে জন্নত বলে ডাকা হত। যে বাড়িতে আমাদের রাখা হত, সে বাড়িতে অনেক মেয়ে ছিল, আজও যেমন আছে। সেখানেও খোজা আর মেয়েমানুষই শুধু থাকে। যে সব মেয়েমানুষেরা আমাদের ছেলেবেলা থেকে পালতো, তারা হল ভীষণ, ভয়ঙ্করী! তারা আমাদের নিয়ে যা খুশি তাই করত।...তুই খোজা, তুই জানিস, কামের বাসনা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়। ওই সব সাংঘাতিক দেখতে কুচ্ছিত মেয়েমানুষগুলো আমাদের নিয়ে এমন সব কান্ড করত। হারেমের পুরনো মেয়েমানুষ হয়েও তোকে বলতে আমার শরম লাগছে নাতি। মেয়েমামুষ মেয়েমানুসকে নিয়ে যে সে-সব করতে পারে, কখনো জানা ছিল না। সত্যি বলতে কি তার থেকে পুরুষের সবকিছুই ভাল। পুরুষ যত অত্যাচারই করুক, মেয়েমানুষ জানে ওরা একটা জিনিস চায়, আর তা শুধু পুরুষেরাই চাইতে পারে। কিন্তু পুরুষের যে পাগলামি সহ্য হয়, তাতে কষ্ট হলেও মেয়েমানুষকে পুরুষের মত কিছু করতে দেখলে গা ঘিনঘিন করে। কিন্তু কিন্তু—'

জন্নত থামল। তার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলে উঠল, 'বারবক, তুই আছিস না চলে গেছিস?'

বারবক বলল, 'যাই নি নানী, তোমার কথাই শুনছি। তোমাব সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, নিজের সঙ্গে কোথায় কোথায় আমার মিল আছে।'

জন্নত বলে উঠল, 'পাবি, অনেক মিল পাবি রে নাতি। কিন্তু—সেই বয়েসে সেইসব মেয়েমানুষদের ঘেন্না করতাম, হারেমে এসে আর করি নি। আর গা ঘিনঘিন করে নি। সেইসব মেয়েমানুষদের তো বয়স ছিল না, রূপ ছিল না, কেউ কেউ বয়স চলে যাবার পর হারেম থেকেই সেখানে যেত। কিন্তু বাসনার কাছে বয়স কিছু নয়। এ কথাটা বেশীবয়সে যে বুঝেছি, তা নয়। অল্পবয়সেই বুঝেছিলাম, ভরা যৌবনে বুঝেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে আমাদের কী শেখানো হয়েছিল? কী নিয়ে আমরা থাকতাম? এমন জিনিস শেখানো হত, এমন সব বিষয় নিয়ে থাকতাম, যাব মধ্যে শুধুই শরীরের সুখ খোঁজা হত। খোদা যে সে-সবের জন্যে বয়েসের শুরু রাখে নি, শেষও রাখে নি। পেকে-

'ছিলাম তো পাঁচ-ছ বছর বয়সেই, সেই বয়েসেই আমারা সব শিখেছি। শরীরে জোয়ার আসবার আগেই অকালে আমাদের ক্ষুধা হয়েছে। এগার বছর বয়স অবধি খোজা দেখেছি, পুরুষ দেখি নি। কিন্তু এগার বছর বয়সেই বর্ষীয়সী মেয়েরাই পুরুষের রূপ ধারণ করেছে, একেবারে পুরুষ। মেয়েমানুষ মরদ সাজতে পারে, তা কি কেউ জানে? সে শুধু পুরুষের মত চোগা চাপকান পারে না, নকল গোঁফ দাড়ি লাগায় না। ওরে নাতি বলতে শরম লাগে, পুরুষের নকল অঙ্গ লাগিয়ে, তারা পুরুষ হয়, আর ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের মত, সুলতানের মত ব্যবহার করে। তার জন্যেও অনেক খরচ, অনেক কায়দা, সবই হারেমের বাইরে থেকে তৈরী হয়ে আসে। সুলতানশাহীর ভেতরের কথা কে জানে! তবু এগার বছর বয়সেই যেদিন প্রথম হারেমে তুলে দিয়ে এল, পড়লাম সুলতানের সামনে। ষোল বছর বয়েসের মধ্যে তিনবার সুলতানের দেখা পেয়েছি, তিন রাত্রি পুরো নয়, কুল্যে তিনবার। তখনই জেনেছিলাম, শুধু বেশী বয়েসের ব্যাপার নয়, কুরূপ নয়, হারেমের মেয়েদের ঘোল খেয়ে দুধের সাধ মেটাতে হয়। কিন্তু—তোকে কেন এসব বলছি, তুই তো সবই জানিস। তুই তো সবই দেখেছিস, এখনো দেখছিস।'…

বারবক বলে উঠল, 'দেখেছি নানী, দেখেছি। আজ দেখছি হারেমের বেগমদের, আর আগে দেখেছি পুরুষদের। যতদিন গোঁফদাড়ি ওঠে নি ততদিন পুরুষদের দেখেছি। লস্করদের সঙ্গে আমাকে রাত কাটাতে হয়েছে। একটা রাতও পুরুষদের থেকে রেহাই পাইনি! পনর ষোল বছর বয়সে যখন সুলতানের আত্মীয়স্বজনের অন্যান্য মঞ্জিলে কাজ করতে গেছি, সেখানকার খানদানি পুরুষদেরও দেখেছি। মদমত্ত পুরুষেরা বিবিদের তাড়িয়ে আমাকে ঘরে রেখেছে। অনেক সময় মেয়েদের পোষাক আমাকে পরে থাকতে হয়েছে। মাথার চুল তখনমেয়েদের মতই বড় রাখা হত আমার। খোঁপা বাঁধতাম, কিংবা বেণী। মেয়েদের মত নাচতে হয়েছে, গান করতেও হয়েছে। অনেক সুলতানজাদা আর সুলতানী খানদানি লোকদের সেই নাচগানই ভাল লাগে। তুমি জান নানী, গৌড়ের সবাই জানে, উসুফ শায়ের ছেলে পাগলা সিকান্দার সেই অল্পবয়সী তুর্কী খোজাটাকে ছাড়া কাউকেই পছন্দ করত না…আমার মনে আছে, তখন আমি হারেমে খোজার কাজ পেয়েছি, সিকান্দার সুলতান হল। সরাব খেয়ে সিকান্দার হারেমে এল, মেয়েরা অনেকেই চাইছিল, সিকান্দার তাদের ঘরে আসুক। প্রত্যেক ঘরেই উঁকি মেরেছিল সিকান্দার, মেয়েরা এক-একজন কত রকমভাবে লোভ দেখিয়েছিল তাকে।

কত রকমভাবে লোভ দেখিয়েছিল তাকে। কত অঙ্গ-ভঙ্গি, সুলতানকে সেবা করবার জন্যে বেচারীরা কত বেহায়াপনা করেছে, নিজেদের অপরূপ শরীরের গঠন তার সামনে খুলে দেখিয়েছে, কিন্ত সিকান্দারের কাছে সে সবই মাটির পুতুলের মত, ইঁটকাঠের মত। তার কাছে এনে দিতে হয়েছিল সেই তুর্কী খোজাকে, আর মেয়েদের সামনেই সে খোজাকে এমন করে আদর করেছিল, কোন সুলতান কোন-দিন কোন মেয়েকেও অমন করে আদর করে নি।—এখনো শাহীমঞ্জিলের ছোকরা খোজারা মেয়েদের পোশাক পরে, বেণী বেঁধে, চোখে সুরমা লাগিয়ে, হারেমের আশেপাশেই কোথাও নাচ গান করছে, কারণ ফতে শাও শখে পড়ে সেখানে মাঝ-মধ্যে উঁকি দেয়। —পুরুষদের কত অত্যাচার সহ্য করেছি! তারপরে, বিশ বছর বয়সে যখন এই হারেমে এলাম, নানী, সেই প্রথমদিনের কথা কখনো ভুলব না। ইরানী বেগম জোলেখার মহলে আমাকে কাজ দেওয়া হল। অমন সুন্দরী মেয়ে আমি আর কখনো দেখি নি, তখনো পর্যন্ত দেখি নি। সন্ধ্যার পরে, জোলেখা বেগম বসেছিল ঘরে, বসে বসে সোনার পেয়ালায় সরাব খাচ্ছিল। রুকনুদ্দীন বারবক শায়ের তখন বয়স হয়েছে, শাহাজাদা উসুফ শাই তখন আদতে সলতান, তার নামে টঙ্কাও বেরিয়ে গেছে, সে লুকিয়ে হারেমে ঢুকে পড়ত। আগেই শুনেছিলাম, জোলেখার কাছে উসুফ শা লুকিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করে। আমি যেন তাকে বাধা দেবার চেষ্টা না করি। কারণ সে-ই আখেরের মালিক।—কিন্তু সেই এক রাতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল উসুফ শা এল না। একটা বাঁদী রবাব বাজিয়ে শোনাচ্ছিল জোলেখাকে। মাঝরাত্রিও যখন পেরিয়ে গেল তখন বাঁদীটাকে এক লাথি মারলে জোলেখা, মুখে পানের পিক ছিটিয়ে দিলে। বাঁদীটা পালাল। উঃ মেয়েমানুষের সে কি ভীষণ মূর্তি। আমার মনে হয়েছিল, ও তখন আর মেয়েমানুষ নেই, একটা ভোল পাল্টানো ডাইনী। লাল মুখ, রক্তচোখ-দুটি ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। ঘরের বাতি ছাড়া, সব বাতি নিভিয়ে দেবার হুকুম দিলে সে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের উঠানের আর দালানের বাতি নিভে গেল। তারপর আমাকে ডেকে পাঠাল তার ঘরে। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম, আমাকে সে অনেকক্ষণ ধরে দেখল, আর হায় খোদা! আমি খোজা কি না, এই সন্দেহে সে আমাকে তার সামনে পরীক্ষা দিতে বলল। জোলেখা বেগমের হুকুম, আমাকে পরীক্ষা দিতে হল। আমার গা থেকে সব কামিজ জুতা খুলে নেওয়া হল। নানী। আঃ, একটা খোজা, কুকুরের থেকেও অধম, জোলেখা বেগম আমাকে কুত্তার মতই গায়ে হাত দিয়ে দেখল। কিন্তু নানী, আমি তো পুরুষ নই, তবু আমার গায়ের মধ্যে

কী রকম করে উঠেছিল।...তারপরে জোলেখা বেগম বে-লাজ হয়ে শুয়ে পড়ল, আর আমাকে বলল তার গা-হাত-পা মালিশ করে দিতে। আমি হুকুমবরদার, আমি তাই করলাম, আর জোলেখা বেগম একটা অদ্ভুত ছবি বের করল পালঙ্কের নিচে থেকে, মানুষের ছবি, মুসলমানের মেয়ে হয়ে সে মানুষের ছবি নিজের কাছে রেখেছিল। মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষের একটা ছবি, দেখে মনে হয়েছিল, সেটা হিন্দুদের আঁকা ছবি। সেটা যে কী একটা ছবি, অওরত মরদ দুজনেই নাঙা আর দুজনেই জানোয়ারের মত দুজনের—।'

জন্নত বলে উঠল, 'জানি নাতি, আমি জানি, তোকে বলতে হবে না। ও ছবি হারেমে আসে উড়িষ্যার কাফেরদের কাছ থেকে। জিম্মিদের দেওতার মন্দিরে নাকি ওইরকম সব পাথরের মূর্তি আছে।'

বারবক বলল, 'হ্যাঁ, পরে আমি তাই শুনেছি। নানী, সেই ছবি দেখে আমি অবাক না হয়ে পারি না। কিন্তু বান্দা খোজার অবাক হওয়া বেআদবি। জোলেখা বেগম আমাকে বলল, "তাজ্জব হচ্ছিস কেন উল্লু। এখন যা বলছি, তাই কর। এত বড় একটা চেহারা, আসলে তো তুই একটা দুম্বা খাসী।" বলে সে নিজে আমার সামনেই নাঙা হল, আমাকেও নাঙা করল। তারপর সে আমাকে সেই ছবিটার মতই কাজ করতে বললে। উঃ নানী, খোদা কেন এর পর আমাকে জঙ্গলের জানোয়ার করে নি? আমি আর মানুষ হয়ে জন্মাতে চাই না। তখন আমার তাই মনে হয়েছিল। আর জোলেখা বেগমের হুকুম পালন করেও আমি রেহাই পাই নি। সে হাসছিল, কাঁদছিল, তবু তার চোখ যেন রাগে আক্রোশে জ্বলছিল। সে আমাকে আদর করেছিল, আবার কামড়ে খামচে রক্তাক্ত করে ছেড়ে দিয়েছিল। পরের দিন, সারাদিন আমি আমার ঘরে পড়েছিলাম। তখন তো হারেমের খোজাদের ঘরেই আমি থাকতাম। শরীরে অসম্ভব ব্যথা, দাঁতের আর নখের বিষে আমার জ্বর এসেছিল, কয়েকদিন আমি কিছুই মুখে তুলতে পারি নি। আমার মুখে কোন স্বাদ ছিল না, কেবল বমি হয়েছিল।'

অন্ধকারে জন্নতের হাত বারবককে স্পর্শ করল। সে বলল, 'বুঝেছি রে নাতি, তোর কষ্ট বুঝেছি। দ্যাখ, ক্ষুধা এক কথা, নেশা আর এক কথা। জোলেখাকে ঘেন্না করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তুই যদি তোর ময়নাটাকে রোজ রোজ নেশা করাস, আর তারপরে নেশার যোগান দিতে না পারিস, তা হলে সে ওরকম ক্ষেপে যাবেই। জোলেখার যে সবটাই নেশা।'

—জানি নানী, তারপরে দেখে দেখে, জোলেখা বেগমের ওপরে আমার আর রাগ

হত না। সে তো একলা নয়, অনেক বেগমকেই অনেক পাগলামি আর খ্যাপামি করতে দেখেছি। এখন তো আর কিছুই মনে হয় না।

—এই তো সুলতানশাহী।

—সুলতানশাহী।

বারবক যেন চাপা গলায় গর্জন করে উঠল।

জন্নত বুড়ি বলল, 'তারপরে শোন, তোর কথা বলি।'

—হ্যাঁ নানী, হ্যাঁ বল।

জন্নত বুড়ি যেন দৈববাণী করছে, এমনিভাবে বলল, 'আমি যা বলছি, জানবি, তোর জীবনটা অবিকল তাই। বৈরামের কাছে যতটুকু শুনেছিলাম, তাতে বুঝেছিলাম, তুই একটা চুরি-করা ছেলে। বোধহয় তুই জিম্মিদের ছেলে।'

—জিম্মিদের ছেলে?

—হ্যাঁ, কেন, না, এইজন্যে যে, তখন তুই বাংলা বুলি বলতিস, তুই বাঙালী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি বেশ বুঝতে পারি, তোকে ছেলিয়াধরারা ধরে নিয়ে এসেছিল। হয়তো তিন-চার বছরের ছেলে তুই, কোন এক নিরালা গাঁয়ে জন্মেছিলি। কে জানে, বেরাহ্মদের ঘরে কি কাদের ঘরে জন্মেছিলি। তোর বাপ হয়তো তখা বাইরে কোথায় গেছল, তোর মা হয়তো রান্না করছিল, আর তুই মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কখন গাঁয়ের পথে নেমে এসেছিলি—।

বারবকের আবেগকম্পিত নিচুগলা শোনা গেল, 'আমার মা—আমার মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে?'

—হ্যাঁ, মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। মায়ের যে কত কাজ রে, তার ঘরকন্নার কাজের মধ্যে কি সবসময়ে তোর মত এমন একটা প্রাণের ধন দস্যিকে চোখে চোখে রাখতে পারে? আমি বাইরে বেরিয়েছি, গেরস্তদের স্বামীপুত্র নিয়ে সংসার দেখেছি। তাই আমি জানি।

বারবক তেমনি গলায় বলে উঠল, 'আমিও জানি, আমিও দেখেছি। তুমি তো জান নানী, এই শহরের যত গরীব, ভবঘুরে তাদের সকলের সঙ্গেই আমার ওঠাবসা, যত নাম [illegible] লোকেদের সঙ্গে আমার খানাপিনা। আমিও দেখেছি গেরস্তদের

চহারা। তোমার মত আমি অননি মা-ছেলেকে দেখেছিল। কিন্তু—কিন্তু সে ধ প্রাণের ধন দস্যি, তা তো বুঝতে পারি নি। আমি—আমি কি তেমনি—'

জন্নত বলে উঠে, 'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়, এমন রূপ তোর, তুই নিশ্চয় ছলেবেলায় তোর মায়ের বুকের পাঁজর ছিলি বাছা, চোখে হারাবার ধন সাতরাজার ।ানিক। কী যেন তোর নাম ছিল, কে জানে।'

বারবকের প্রকাণ্ড বুকের ভিতরটায় একটা দারুণ বেদনা মোচড় দিয়ে উঠতে ।াগল, আর গোঙানোর মত একটা স্বর তার গলা দিয়ে অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসতে ।াগল। গোঙানো স্বরেই সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'সাতরাজার ধন, আঃ মাহ্—মায়ের পাঁজর···আমার নাম।'

জন্নত বুড়ি বলল, 'হ্যাঁ, তোর নাম, হয়তো সোনামানিক বলেই তোর মা-বাবা চাকত, পড়শীরা ডাকত—।'

—ডাকত! ডাকত!···

বারবকের বুকের মোচড়ানি বাড়তে লাগল, আর গলার কাছে কিছু ঠেলে উঠতে লাগল।

—'আমার যেন সেইরকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু মায়ের তো কত কাজ। তুই যে ঘরের উঠোনে মাটি নিয়ে খেলা করতে করতে কখন ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় চলে গেলি, মা জানতেও পারল না। কিংবা হয়তো তোকে কেউ রাস্তা থেকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, একটা খেলনা দেখিয়ে ডেকেছিল!'···

—ডেকেছিল—আমাকে ডেকেছিল?

বারবকের গলা রুদ্ধ হয়ে আসছে। জন্নত বলল, 'হ্যাঁ, যেমন করে ছেলিয়াধরারা ভুলিয়ে-ভালিয়ে কাছে নিয়ে আসে। হয়তো সেদিন ছিল গরমের দুপুর। গাঁয়ে লোক চলাচল ছিল কম, রোদ্দুরে চারদিক ঝাঁ-ঝাঁ। তোর এখনো নাওয়া হয় নি, মাথায় তোর বড় বড় চুলের বাসি ঝুঁটি দুলছে। বাপ বাড়ি আসবে, তার সঙ্গে খাইবি, মা বেড়ে দেবে খেতে।'

—মা বেড়ে দেবে খেতে, নানী নানী!

বারবকের গলা প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে এল, অতলে ডুবে গেল। আর বুকের ব্যথাটা যেন ফেটে পড়বার জন্যে ক্রমেই গলার কাছে এসে ফুলতে লাগল। চোখের কুলে কুলে এসে ধারা সঞ্চিত হতে লাগল প্লাবিত হবে বলে।

জন্নত বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক সে সময়েই, কে যে তোকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল বাইরে। ছেলিয়াধরার সাক্ষাৎ হাত না হলেও সে হাত তোর মনের মধ্যে ঢুকে

যে কী খেলার হাতছানি দেখিয়েছিল, তুই পথে বেরিয়ে এলি। পথের দুপাশে গাছ গাছালি জঙ্গল, আর একটা দূরে শস্যফসলের মাঠ। তুই এলি, আর ছেলিয়াধরার চোখে লোভ চকচকিয়ে উঠল। তাদের প্রাণ কাঁপল না, তাদের দয়া-মায়া নেই তারা তোকে তুলে নিয়ে চলে গেল। হয়তো সেই গাঁয়ের ধারে নদী, সেখানে তাদের নৌকা, সেই নৌকায় তুলে নিয়ে ভেসে গেল দূর দেশে। হয়তো গৌড়ের কাছাকাছি কোন জায়গাতে এনেই তোকে তুলল। কে জানে, পাণ্ডুয়ায় নিয়ে গেছল কিনা, কিংবা আদিনায়। কোথাও তোকে নিয়ে গেছল যেখানে—।'

বারবকের গলা রুদ্ধ, তবু সে জোর করে, দুই হাতে বুক চেপে, কোনরকমে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্ত নানী, তার মা, সেই সোনা-মানিকের মা ?'

জন্নত থমকে বলল, 'সোনা-মানিকের মা ?'

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোনা-মানিকের মা ?

জন্নত হাত দিয়ে বারবকের—খাওয়াজা-সেরার জরির কাজ-করা পোশাকটা চেপে ধরল। স্নেহব্যাকুল স্বরে বলল, 'অমন করিস না রে নাতি, অমন করিস না, একটু শান্ত হ। একটু শান্ত হয়ে সব শোন, একটু মাথা খাটিয়ে সব কর। শোন বলি তারপরে—তারপরে মায়ের রান্না হয়তো শেষ হয়ে গেল। তার আগেই সে অভাগীর মনটা চমকে চমকে উঠেছিল। কই আমার সোনা-মানিকের সাড়া কেন পাইনে উঠোনে ?'

—আহ্। সোনা-মানিকের সাড়া ?

—হ্যাঁ, সোনা-মানিকের সাড়া কেন পাইনে উঠোনে ? শেষে রান্না নামিয়ে হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে, আগুনের তাপে পোড়া লাল মুখখানির ঘাম মুছতে মুছতে, মা অভাগী ডাকতে ডাকতে এল উঠোনে. ও মানিক সোনা-মানিক, কোথা গেলি বাবা ? দেখলে উঠোনের পেয়ারাতলার ছায়ায় মাটি চুড়ো করা, ছেলে সেখানে নেই। সোনা-মানিক, ওরে দুষ্টুটা কোথায় গেলি ? মা আগদুয়ারে খুঁজল পাছদুয়ারে খুঁজল। মা গলা তুলে ডাকলে, মানিক ! সাড়া নেই ছেলের মায়ের মনটা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। বড় যেন নিঝুম লাগছে বাড়িখানি। কেবল এগাছ থেকে ওগাছ লাফিয়ে লাফিয়ে দুগ্গো-টুনটুনিটা ডাকছে। কোথায় যে ঘুঘু ডাকছে। দুপুরটা যেন কেমন থম-খেয়ে গেছে। অমন থম-খাওয়া দেখলে যে গাটা কেমন করে। মনটা আঁকপাকু করে যে ! মা ছুটে গেল ঘরে। মানিক যে মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলে।

বারবকের গলাটা মোটা চাপা অথচ ভাঙা-ভাঙা শোনাল, 'মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।'

জন্নত বুড়ি বলল, 'হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে যে। তাই মা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, দ্যাখরে আফগানি দস্যিটা।'

—আফগানি দস্যিটা ?

বারবক বলে উঠল। জন্নত বলল, 'হ্যাঁ গোরা লম্বা চওড়া আফগানিরা যেমন হয়। মা যে ভালবেসে ছেলেকে ওই বলে বকে 'রে নাতি। এই গোঁড়ে, এই দেশে সবখানে বকে। তাই মা বললে, দ্যাখ রে আফগানি দস্যিটা ভোগাস নি বলছি! খুঁজে যদি পাই তোকে ঘরে···। কিন্তু কোথায় ঘরে ? হাট করে ঘরের দরজা খোলা। এ-কোণে ও-কোণে, কোথাও নেই। কোথা থেকেও খিলখিল হাসি শোনা গেল না, দুটি কচি কচি হাত মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল না।

বারবক গোঙানো স্বরে উচ্চারণ করল, 'দুটি কচি-কচি হাতে ?'

—হ্যাঁ, দুটি কচি হাত। মাথার চুলে বাসি ঝোটন, কোমরে রুপোর বিছে, লাল কচি কচি মাড়িতে, একখানিতে পোকা-খাওয়া বাকী সাদা সাদা দুধের দাঁতে ঝিক-মিকে হাসি, মায়ের সোনা-মানিক। মায়ের মনটা তখন বড় ফাঁপরে পড়েছে, ছুটে গেল পাশের পড়শীদের ঘরে। হ্যাঁ গো, আমার সোনা-মানিককে দেখেছ ? কই না তো! তবে ? তবে মানিক কোথায় গেল ? মা তখন গাঁয়ের রাস্তার দিকে ফিরে তাকালে। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, মাঠ যেন কাঁপছে। কিন্তু রাস্তায় কেন যাবে সে, তার কি প্রাণে ভয় নেই ? তবু মা পথের দিকে মুখ করে গলা তুলে ডাকলে, মানিক।

বারবক যেন গোঙানো চাপাস্বরে দূরে থেকে ডেকে উঠল, 'মানিক।'

জন্নত বুড়িও ডাকল. 'মানিক! কোথায় মানিক ? মায়ের বুক কাঁপল, মনটা কু গাইল। মন থেকে কু ঝেড়ে ফেলতে চাইল, ভাবলে যদি সত্যি হয় ? কিন্তু সাড়া কেউ দিল না। চোখ জলে ভেসে গেল মায়ের, তবু পথের বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে মনে ভাবল, ছেলেটা কি বাপের পিছু পিছু গেল। কতদিন যে যেতে চেয়েছে! তারপরে দূরে ছেলের বাপকেও দেখা গেল, মাথায় গামছাখানি চাপিয়ে বাড়ি-মুখো আসছে। দরজায় পা দেবার আগেই মা জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ গো, মানিক তোমার সঙ্গে যায় নি ? কই না না তো। কেন, কোথায় সে ? মা অমনি কান্নায় ভেঙে পড়ল। কেঁদে কেঁদে স্বামীকে সব বলল। স্বামী ছুটল গাঁয়ের পথে, মাঠে-ঘাটে বাদাড়ে, তাবত লোককে জিজ্ঞেস করল, কেউ

দেখেছে কি মা ছেলেকে। কেউ দেখে নি, কেউ বলতে পারে না। রান্না ভাত রইল পড়ে, তখন মেয়ে-পুরুষে দুজনেরই ছুটোছুটি। তখন গাঁয়ে ঘরের সকল গেরস্তের ছেলে সামলানোর দায়, ওরে কেউ ঘর ছেড়ে বেরোস নে, ছেলিয়াধরা ঢুকেছে গাঁয়ে। তারপর—তারপর—।'

বারবক রুদ্ধ চাপা গলায় বলে উঠল, 'তারপর, নানী তারপর।'

—তারপর সাঁঝ হল, বাতি দেখানো হল, শাঁখ বাজল। সোনা-মানিকের বাপ-মা ঠাকুরের দোরে গিয়ে মাথা কুটতে লাগল, 'মানিক কোথা। মানিক।'

বারবক, প্রকাণ্ড বারবক, মঞ্জিলশাহীর সুলতানের চেয়ে যে মাথায় লম্বা, বিশাল বুক যেন মঞ্জিলশাহীর প্রাকারের থেকেও চওড়া, সে নুয়ে পড়ল। যেন কাঁপতে কাঁপতে দুমড়ে পড়ল, কোমরের তলোয়ারের খাপটা অন্ধকার বহির্কক্ষের পাথরের মেঝেয় ঠং-ঠং করে বাজতে লাগল, ঘষে যেতে লাগল। সে যে নুয়ে পড়েছে, সে যে কাঁপছে, তা বোঝা গেল। আর ভাঙা-ভাঙা চুপি-চুপি অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল, 'মানিক! মানিক কোথায়?'

অন্ধকারে তখন জন্নতের হাতটিও কাঁপছিল। তার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল। সে এমন করে বারবকের ছেলেবেলা সম্পর্কে এক কাল্পনিক কাহিনী বলে যাচ্ছিল, যেন সে সবই প্রত্যক্ষ করেছে। যা সে দেখেছে, তারই পূর্ণ বিবরণ দিচ্ছে যেন। সে হাত দিয়ে, অন্ধকারে বারবকের কাঁধ স্পর্শ করল। আজকের এই ঘোর দুর্যোগের রাত যেন এই মুহূর্তে এক দুঃসহ শোকের রাত্রি হয়ে উঠল। এই রাত্রের গাঢ় অন্ধকার, মেঘ ও বৃষ্টি কোন এক অচেনা বাবা-মায়ের শোক ও চোখের জল হয়ে উঠল।

জন্নত বুড়ির মন্থর কাঁপা-কাঁপা স্বর শোনা গেল, 'ঠিক এই, এমনটিই ঘটেছিল তোর জীবনে, তা ছাড়া আর কী! তোর কথা যে একটু শুনেছে, সেই-ই বলবে, এই-ই ঘটেছিল। এই-ই তো ঘটে এই দেশে, এখনো কত-শত ঘটছে। নইলে এদেশে কাদের খোজা বানানো যায়? এই দেশী খোজার জীবনে আর কি নতুন কথা থাকতে পারে। কটা গরীব বাপ-মা খোজা করার জন্যে ছেলে বিক্রি করে? তাই কি কেউ করতে পারে? চুরি না করলে ছেলে পাওয়া যায় না। খোজা না হলে সুলতানশাহী চলে না, ওদের মেয়েমানুষকে পাহারা দেবে কে?'

বারবকের গলায় যেন দূর মেঘের মতই বিলম্বিত চাপা গর্জন শোনা গেল, 'হুঁ!'

সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তার দেহে সহসা ক্রমশ তীব্র উত্তাপ সৃষ্টি হল,

তার উত্তপ্ত গালের জল আপনা থেকেই শুকিয়ে গেল। বলল, 'নানী, তারপর ওরা সেই মানিককে নিয়ে খোজা করল, না?'

জন্নত বুড়ি বলল, 'ছেলিয়াধরারা ধরে নিয়ে গেল, কোন এক দূর জায়গায় নিয়ে গেল। আহা, সাঁঝবেলায় তার বাপ-মা কেঁদেছে, তার অবস্থাটা একবার ভাব। অবুঝ শিশু মা-মা করে না-জানি কতই কেঁদেছিল বাছা। কিন্তু ছেলিয়াধরার প্রাণ, সে পাথরের থেকে কঠিন। তারা নিয়ে বিক্রি করে দিল খোজাওয়ালার কাছে। খোজা যারা তৈরি করে, যারা খোজার যোগান দেয়, তারা অনেক দাম দিয়ে কিনে নেয়। খোজা করার পর সুলতান তাদের আরো বেশী দাম দিয়ে কিনে নেয়। আঃ কী পাপ, কী কষ্ট। কেমন করে খোজা করে, সে গল্পও যে না শুনেছি তা নয়।'

বারবকের গলায় আবার সেই নিষ্ঠুর গাম্ভীর্য নেমে এসেছে। ভারী মোটা আর নিচু গলায় সে বলল, 'আমিও শুনেছি। একবার দেখতেও চেয়েছিলাম, দেখতে দেয় নি। আদিনার মাহমুদের কাছে গেছলুম, সে খোজা করে লোককে। কিন্তু, সে আমাকে দেখতে দেয় নি।'

জন্নত বুড়ি বলল, 'শুনেছি, অনেকে মরেই যায়।'

বারবক বলল, 'আমি মরি নি নানী। খোজা করতে গিয়ে, অনেককে মেরে ফেলেছে ওরা। বেঁচে থাকাটাই নাকি আশ্চর্য তবু অনেকেই বেঁচেও যায়। আমিও মরি নি নানী। ফতে শার কথা আমার মনে পড়ছে।'

—কী কথা?

—ফতে শার তলোয়ারের কোপ খেয়েও যখন মরি নি, তখন সে বলেছিল, 'বান্দা তুই মরিস নি যখন, তখন তোর ওপর খোদার কোন মর্জি আছে।'

জন্নতের গলা সহসা পরিবর্তিত হয়ে গেল। তার সরু নিচু স্বরের বয়স হঠাৎ যেন কমে গেল। সে বলে উঠল, 'খোদার মর্জি! কাঁটাদুয়ারের সেই দরবেশের কথাই তাহলে ফতে শার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল?'

বারবক উচ্চারণ করল, 'কাঁটাদুয়ারের দরবেশ। খোদার মর্জি। হিদনা!'

হিদনার গলায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, 'হুকুম?'

—সরাব।

জন্নতের গলায় তীব্র বিদ্রূপ ঝংকৃত হয়ে উঠল, 'সরাব! তুই বান্দা, তুই আজও সরাব খাচ্ছিস? আজকের রাত, এই রাত তোর জীবনের কোন্ রাত, তা ভুলে গেছিস?'

বারবক পাত্র হাতে নিয়ে বলল, 'ভুলি নি নানী, ভুলি নি বলেই সরাব টানছি। আমি আজ বারে বারে ভাবছিলাম, আমি কে ? কে আমি ? এক এক সময় যেন মনে হয়, আমি একটা সত্যি মানুষ নয়, একটা প্রেতাত্মা। আমি তখন আমার ছায়া খুঁজি। এত কথা শুনেও, একটা শেষ কথা আমার জানতে ইচ্ছে করে, কে আমি ?'

জন্নত বুড়ি বলে উঠল, 'আমি যা বলেছি, তুই তাই। আরো যদি জানতে চাস, তবে বলি, তুই দুঃখীর বাসনা।'

—দুঃখীর বাসনা ?

অবাক হল বারবক। জন্নত বলল, 'হ্যাঁ, দুঃখীর বাসনা। তুই এই তাবত সংসারের ইচ্ছে ?'

—তাবত সংসারের ইচ্ছে ?

—হ্যাঁ, নিয়তি তোকে দুনিয়ার বাসনার একটা পুতুল তৈরি করেছে। আর নিয়তি মানুষকে দিয়ে যা করতে চায়, তাকে তাই করতে হয়।

বারবক দম-ফুরানো দোহারকির মত উচ্চারণ করল, 'তাকে তাই করতে হয়।'

তারপরে সহসা তার গলার স্বর আরো নিচু হয়ে গেল। বলল, 'নানী, মানুষের বাসনা কী ?'

জন্নত বলল, 'তারা সকলেই চাঁদির পেয়ালার সরাব খেতে চায়।,

এই সময়ে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। যেন এই শাহীমঞ্জিলের মাথায় পড়ল, আর দেয়ালে দেয়ালে সেই শব্দ কিছুক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনিত হল। বারবক পাত্র তুলে ঢক-ঢক করে সুরা ঢালল গলায়। মদিরার তীব্র গন্ধ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

জন্নত বলে উঠল, 'নিয়তির কথাই কাঁটাদুয়ারের দরবেশের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে!'

বারবকের গলায় যেন আহত পশুর ব্যথিত গর্জন। সুরার পাত্র নামিয়ে সে উচ্চারণ করল, 'কাঁটাদুয়ারের দরবেশ।'…

যেন অন্যমনস্কের মত উচ্চারণ করল। তার ভিতরে যেন কতকগুলি অন্ধকার পর্দা দুলছে। এই শাহীমঞ্জিলের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যেমন দুলছে। এবং প্রতি প্রকোষ্ঠের মধ্যেই যেমন কিছু-না-কিছু ঘটছে, আর পর্দা দুলে উঠলে, সহসা কি-যেন-কি দেখা যাচ্ছে। অথচ ভাল করে দেখা হয় না। কি-যেন-কি শোনা যাচ্ছে, অথচ ভাল করে শোনা হয় না, তার ভিতরের অন্ধকার পর্দাগুলি তেমনি করে দুলছে। এই পর্দা হাত দিয়ে তুলে সবকিছু দেখা যায় না। শোনা যায় না। তাই তার দৃষ্টি সেখানে পড়ে আছে, কান সেখানে পেতে রয়েছে।

জন্নত বুড়ি বলল, 'হ্যাঁ, কাঁটাদুয়ারের দরবেশ। কাঁটাদুয়ারে ইসমাইল গাজীর আত্মা আজও রয়েছে, তিনি সবকিছুই দেখছেন। দরবেশ তাঁর আদেশ ভিন্ন কথা বলে না। দরবেশ মুহম্মদের মধ্যে তিনিই ভর করেন, পীর নিজেই কথা বলেন, দরবেশের মুখ দিয়ে বলেন। তুই জানিস, ইসলাম গাজী মক্কা থেকে এসেছিলেন।'

বারবক উচ্চারণ করল, 'মক্কা থেকে।,

—'হ্যাঁ, মক্কা থেকে। খোদার দূত, লড়িয়ের বেশে এসেছিলেন। রুকনুদ্দীন বারবক শায়ের সরে-লস্কর হয়ে তিনি কামতা (আসাম) জয় করেছিলেন। লড়াই করতে গিয়ে, যেখানে শুধু জল, সেখানে তিনি আলাহ্‌র কাছে ডাঙা চাইতেই, আকাশবাণী শোনা গেছল, 'একটা ঢাল মাটিতে ভর্তি করে ফেলে দাও, ডাঙা তৈরি হবে।' তাই হয়েছিল। তিনি একলা আঁধার রাতে কামতায় রাজমঞ্জিলে ঢুকে-ছিলেন, রাজা-রানী তখন দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু গাজী তাদের খুন করেন নি। দুজনের চুলে চুল বেঁধে দিয়ে, খোলা তলোয়ার দুজনের গায়ের ওপর রেখে চলে এসেছিলেন। পরদিন রাজা-রানী ব্যাপার দেখে অবাক। কিছুই বুঝল না। পর পর তিন রাত্তির যখন এরকম ঘটল, তখন তারা বুঝতে পারল, এ হল গাজী ইসমাইলের কাজ। তিনি হাতে পেয়েও মারেন নি, তাঁর এই দয়ার কথা বুঝতে পেরে রাজা এসে তাঁর পায়ে পড়ল, আর গাজীর ধর্ম গ্রহণ করল, খবর পেয়ে রুকনুদ্দীন বারবক শা গাজীকে 'বড়া লড়াইয়া' উপাধি দিলেন। কিন্তু সুলতানরা সাহসী লোক দেখলেই ভয় পায়। গাজীর নামে একদল লোক সুলতানকে কানভাঙানি দিলে, গাজী নাকি গৌড় জয় করবে। তার মধ্যে ছিল ঘোড়াঘাটের ভান্দসী রায়। সেই জিম্মিটা ইসমাইলকে মনে মনে হিংসে করত। অথচ এই ভান্দসী যখন ঘোড়াঘাটে একটা কেল্লা বানাবার হুকুম চেয়েছিল, ইসমাইল সেই হুকুম দিয়েছিল। ভান্দসী ছিল ঘোড়াঘাটের সরে-ই-লস্কর। সে গিয়ে রুকনুদ্দিনকে বললে, কামতার রাজার সঙ্গে জোট পাকিয়ে ইসমাইল গৌড় কেড়ে নেবে। অমনি সুলতান তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলেন না। গাজী জানতেন, মিথ্যে কথা শুনে সুলতান তাঁকে কয়েদ করতে চান। সুলতান তখন সিপাই পাঠালে, দুই দলে লড়াই হল। গাজীর লোকেরা সব মরে গেল। তখন তিনি নিজেই ধরা দিলেন। সুলতানের হুকুমে তাঁর মুণ্ডু কেটে ফেলা হল, যখন কেটে ফেলা হল, তখন খবর পাওয়া গেল, তাঁর নামে যা শোনা গেছল, সব মিথ্যে। সুলতান আর কী করেন। তার দুঃখ হল, তিনি হুকুমজারি করলেন, ইসমাইল গাজীর কবর দেওয়া হবে সুলতানের কবরস্থানে। কিন্তু গাজী নিজে এসে দেখা

দিলেন সুলতানকে। বললেন, 'যেখানে আমার মাথা কেটেছে, সেই কাঁটাদুয়ারেই আমাকে কবর দাও।' তাঁর বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি যারা কাঁধে করে সুলতানের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল, তাঁদের সামনে তিনি উদয় হয়েছিলেন। বাহকরা ভয় পেয়ে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'খোদার কৃপাই আমার সব থেকে বড় সম্পত্তি। তোমাদের কোন ভয় নেই।' গাজীর কথাতেই, তাঁর মাথা কাঁটাদুয়ারে, ধড় মান্দারনে কবর দেওয়া হয়েছিল। রুকনুদ্দীন বারবক শা বেগমকে নিয়ে তারপরে অনেকবার কাঁটাদুয়ারে গেছে। গাজীর সেখানেই বাস, কাঁটাদুয়ার জাগ্রত পীরের থান। দরবেশের মুখ দিয়ে সেখানে তিনিই কথা বলেন।'

—তিনিই কথা বলেন, গাজী কথা বলেন!

বারবক তেমনি সুরেই বলে উঠল। তারপরে হঠাৎ ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু নানী, তুমি কেন বলেছিলে, আমি হয়তো বা জিম্মিদের ছেলে?'

জন্নত বলল, 'আমার তো তাই বিশ্বাস। এই সুলতানী আমলে, মুসলমানের ছেলে কে চুরি করবে? কোন সাহসে? হয় বিদেশ থেকে ছেলে নিয়ে আসবে, নয়তো রাজ্যের কাফেরদের ছেলেকেই চুরি করবে। নইলে ধরা পড়লে, কাজীর বিচারে গর্দান যাবে না? আর তুই যে বিদেশী নোস সে তো বাংলা বুলি থেকেই বোঝা গেছল। সেই থেকেই তো তুই বারবক বাঙালী।'

কিন্তু নানী, আমি বাঙালী হতে পারি, জিম্মিদের ঈশ্বর মানি না। ওদের ঘট-পট পুতুল পুজো মানি না। আমি খোদার বান্দা, আমি মুসলমান।

জন্নত বলল 'তাও হতে পারিস। তাতেই বা তাজ্জবের কী আছে। কাজীর ভয় থাক, বাদশার ভয় থাক, তা বলে কি ছেলিয়াধরারা মুসলমানের ছেলেও চুরি করে না? জরুর করে। তাদের কাছে হিন্দু মুসলমান নেই, খালি টংকা আর কড়ি। জঙ্গলের শের যেমন জাত দেখে রক্ত খায় না, ছেলিয়াধরারাও তেমনি। তুই মুসলমান হতে পারিস, হয়তো মুসলমান বাপ-মায়ের বুক থেকেই তোকে ছিনিয়ে এনেছিল। কিন্তু তুই পাঠান না, হাবশী না। তুই বাঙালী।'

—বঙালী, বঙালী!...

বারবক উচ্চারণ করল এবং আবার অন্যমনস্কতার ঘোরে ডুবে গিয়ে স্খলিত গোঙানো স্বরে কেবল উচ্চারণ করল, 'নিয়তি...।'

জন্নত বুড়ি বলে উঠল, 'কিন্তু কাঁটাদুয়ারের দরবেশের মুখ তোর মনে পড়ছে না এখনো?'

জন্নতের কথা শুনে মনে পড়ছে। বারবকের চোখের সামনে দরবেশ মুহম্মদের

মুখ ভাসছে। সাদা-কালো দাড়ি বুক অবধি ঝুলে পড়েছে, হাবশীদের মত কালো মুখ। মুখে অনেক রেখা, এই জন্নত বুড়ির মতই, সেই রেখাগুলি সাপের মত কিলবিল করে নড়ে। চোখদুটি টকটকে লাল। এবং কালো মুখ ও ধূসর দাড়ির ভিতর থেকে মাঝে মাঝে তার টকটকে লাল জিভ দেখা যায়। এত লাল জিহ্বা কেন? মানুষের জিভ কি এত লাল হয়? দরবেশকে সে কখনো পান খেতে দেখে নি। তবু তার কালো মুখে কালো মোটা ঠোঁটের ফাঁকে টকটকে লাল জিভ দেখলে, গায়ের মধ্যে কিরকম করে ওঠে। সেই মুখ তার মনে পড়ছে। কাপাসী কাপড়ের কালো রং আলখাল্লা তার পায়ের কাছে নেমে এসেছে। বারবক দেখল, দরবেশ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই রক্তাভ চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টি যেন তীরের মতো তার বুকের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে।

কে যেন বারবককে দরবেশ মুহম্মদের কথা বলেছিল? কে যেন?···হ্যাঁ মনে পড়েছে, য়ুগ্রাশ খান। হাবশী য়ুগ্রাশ খান এখন আস্তে আস্তে বারবকের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। আজ রাত্রে সে নেই। অথচ হাবশীদের অনেকেরই থাকবার কথা ছিল আজ, এই রাত্রে। তারা অনেকেই ফতেশার বিরোধী। ফতেশাকে মনে মনে ঘৃণা করে। কারণ ফতেশা জানেন, হাবশীরা বড় বেশী ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসে আছে। তারা সুলতানকে পর্যন্ত মানতে চায় না। যে কারণে হাবশীদের নেতা মালিক আন্দিলকে তিনি গৌড়ের বাইরে, সীমান্ত রক্ষায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিনানুমতিতে তার গৌড়ে আসবার অধিকার নেই।

কিন্তু বারবক জানে, আন্দিল যেখানেই থাকুক, তার অনুচরেরা দিনরাত্রি শাহী-মঞ্জিলের দিকে লক্ষ্য রাখছে। শাহীমঞ্জিলের মধ্যে তার গুপ্তচরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো, আজ এই রাত্রেও বেড়াচ্ছে। বেড়াক, তাতে আপত্তি নেই, ওরা এখনই বারবকের সঙ্গে বিবাদ করবে না। কাজ হাসিল হয়ে যাবার পরে, বারবককে তারা ধরবে, তাও সে জানে। বারবক তাই হাবশীদের বিশ্বাস করে না। তারা যে কোন মুহূর্তে, বারবকের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করতে পারে। কিংবা এখনই হয়তো করছে।

অথচ হাবশী য়ুগ্রাশ খান-ই প্রথম এসে তাকে দরবেশ মুহম্মদের কথা বলেছিল। বলেছিল, 'কাঁটাদুয়ারের দরবেশ তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। তিনি কয়েকদিন ধরে রোজই তোমাকে স্বপ্নে দেখছেন।'

বারবক শুনে অবাক হয়েছিল। কেন যেন তার মনের মধ্যে শিউরে উঠেছিল। য়ুগ্রাশ খান বারবকের পিঠ চাপড়ে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই তোমার বিশেষ কোন

সৌভাগ্য লাভ হবে। তা না হলে তিনি তোমাকে এরকম স্বপ্ন দেখাবেন কেন। তুমি দেরি না করে কাঁটাদুয়ারে গিয়ে, তাঁর সঙ্গে দেখা কর।'

বারবক সে কথা বলেছিল জন্নত বুড়িকে। বুড়ি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়েছিল। জন্নত বলেছিল, যত শীঘ্র সম্ভব দরবেশের সঙ্গে দেখা করা উচিত। জন্নত বুড়ি নিজেও তার সঙ্গে গিয়েছিল।

জন্নত আবার যেন বিস্মিত উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করল, 'কী, এখনো দরবেশের কথা তোর মনে পড়ছে না?'

বারবক বলল, 'মনে পড়ছে।'

জন্নত বলল, 'মনে পড়ছে? আর মনে পড়ছে তার মুখ দিয়ে গাজী কী বলেছিলেন?'

বারবকের মনে পড়ল, দরবেশের সেই কথা। মুহম্মদ দরবেশের ফ্যাসফেসে চাপা গলার সেই কথা, 'ফতেশা খুন হবে এক বান্দার হাতে, আর সুলতান হবে সেই বান্দা। সেই বান্দা আছে গৌড়ে, থাকে সুলতানের পাশে পাশে। মরণ তাকে অনেকবার ধরতে গেছে, খোদার মর্জিতে তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। সেই বান্দা খোজা। কিন্তু পুরুষত্ব আছে তার মধ্যে। মান্দারণের থানে আছে এক জিম্মি সন্ন্যাসিনী, ডাইনি বলে তার কাছে কেউ ভয়ে যেতে চায় না। তার কাছে গেলে সে পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেবে। সে যা খেতে দেবে, তাকে তাই খেতে হবে। সে একটা আংটি দেবে, তা ধারণ করতে হবে। সে আংটি পুরুষের রক্তজমানো পাথরের, রং তার কালো হয়ে গেছে। সেই কালো পাথরের মাঝখানে পুরুষবীজের সাদা চিহ্ন আছে।'

বারবক বলে উঠল, 'মনে পড়ছে নানী, মনে পড়ছে।'

—মনে আছে সেই জিম্মি সন্ন্যাসিনীর কথা?

—মনে আছে।

বারবকের চোখের সামনে, মান্দারণের ছবি ভেসে উঠল। ইসমাইল গাজীর ধড় সেখানে মাটির তলায় ছিল। সমাধি ছিল। সমাধি থেকে কিছু দূরে, জঙ্গলের মধ্যে থাকতো সেই সন্ন্যাসিনী। সেই চেহারাও বারবক কোনদিন ভুলবে

না। হিন্দুদের যেমন এক দেবী আছে, যার নাম কালী, যেন সেইরকম তাকে দেখাচ্ছিল। কিন্তু সাধুনীর গায়ের রং গোরা। শনন্নুড়ি চুলগুলোতে জট পাকানো। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত একফালি কাপড়। তারই একটুখানি কোনরকমে বুকের ওপর টেনে দেওয়া ছিল। এত ছোট কাপড়, বুকে ঢাকা থাকতে চাইছিল না। তা-ই সাধুনীর বুক সব সময়ে প্রায় খোলাই ছিল।

সেই বুক শিথিল বা লোল চামড়া নয়। যুবতীর মতোই অ-নত দৃঢ়। কিন্তু সেই বুক যেন ভয়াল ও ভয়ংকর। তাকিয়ে থাকা যায় না। বারবক খোজা, হারেমের খোজা ছিল সে অনেকদিন। অনেক বিবি বেগমের, হিন্দু মুসলমান অওরতের বুক দেখেছে সে। সেরূপ আলাদা। সে বুকের ঔদ্ধত্যের মধ্যেও সৌন্দর্য। আর সাধুনীর বুকের রং এত লাল, বারবকের মনে হয়েছিল রক্তমাখা। কিন্তু রক্তমাখা ছিল না। রক্ত কেন ফেটে পড়ছিল, এত লাল। আর দৃঢ় কঠিন নিষ্ঠুর। চোখ দুটিও তার সেইরকম রক্তাভ।

কোন মুসলমানই জিম্মি সাধুসন্তদের কাছে যায় না। গৌড়ের রাজপথে তাদের দেখলে, তুর্কী আমলা অমাত্যরা থুতু ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু মান্দারণের সেই জিম্মি সাধুনীকে কেউ কিছু বলে না। বরং তার কাছে হিন্দু-মুসলমান সবাই যায়। মুসলমানরা বলে, সেই সাধুনীর সঙ্গে, ইসমাইল গাজীর কথা হয়। যেমন কাঁটাদুয়ারে দরবেশের সঙ্গে গাজীর সম্পর্ক, তেমনি। এদের দুজনের মধ্যেই ইসমাইল গাজী নিজেকে প্রকাশ করে। ইসমাইল গাজীকে হিন্দু-মুসলমান সবাই জানে। কাঁটাদুয়ার আর মান্দারণে, হিন্দুরাও পূজা দেয়।

স্বয়ং দরবেশ মুহম্মদ, বারবককে নিয়ে গিয়েছিল সাধুনীর কাছে। ইসমাইলের সমাধি থেকে দূরে, জঙ্গলের মধ্যে সাধুনী ছিল। জঙ্গলের মাঝখানে, খানিকটা পরিষ্কার জায়গা, তার মধ্যে গাছের ডালপালা পাতা-ছাওয়া ঘর। সাধুনী বসেছিল ঘরের সামনে। তাকে ঘিরে এলোমেলোভাবে বসেছিল কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ। তারা সকলেই সাধুনীর দিকে ভয় আর ভক্তিভরে তাকিয়েছিল। সাধুনী পুরুষের মতো জোড়াসনে বসে, আকাশের দিকে মুখ করেছিল।

মুহম্মদ দরবেশ জঙ্গলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, সাধুনীর নজর পড়েছিল। দরবেশ কুঁড়েঘরের উঠোনে যায় নি, দূরে দাঁড়িয়ে, হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে নিচু হয়েছিল। সাধুনীও হাত তুলে, ইশারা করে দরবেশকে ডেকেছিল।

দরবেশের সঙ্গে বারবক গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সাধুনীর কাছে। তখনই সাধুনীর বুকের দিকে চোখ পড়তে, বারবক যেন ভয়ে চমকে উঠেছিল। সাধুনীর চোখের

দিকে সে চোখ রাখতে পারে নি। মনে হয়েছিল, তার গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লাগছে। দরবেশ কিছুই বলে নি। খালি বলেছিল, 'ওর নাম বারবক। শাহী-মঞ্জিলের খাওয়াজা সেরা। আম্মাজান, ওকে দেখে তুমি সবই বুঝতে পারছ, আমার কিছু বলার নেই।'

সাধুনী চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে, কেমন করে যেন হাসছিল। বারবকের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে, কেবল মাথা দোলাচ্ছিল। তারপরে খপ্ করে বারবকের একটা হাত টেনে ধরেছিল। বারবক শিউরে উঠেছিল। তার বুকের কাছে যেন কেঁপে উঠেছিল। সাধুনী খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

যারা আশেপাশে ছড়িয়ে বসেছিল, তারা কেউ আর ছিল না। একে একে উঠে কোথায় সব অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আর বারবক ভাবছিল, সাধুনীর হাত এত গরম কেন। জ্বরেও মানুষের শরীর এত গরম হয়না। যেন আগুনে তাতানো সাঁড়াশী দিয়ে বারবকের হাত চেপে ধরেছিল।

সাধুনীর হাসি একটু থামতে, দরবেশকে বলেছিল, 'তুমি যাও, ওকে আমি দেখছি।'

দরবেশ চলে গিয়েছিল। বারবক, যার এত বড় শরীর, শাহীমঞ্জিলে আজ এই রাত্রে যে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেও যেন কেমন ভয়ে অসহায় বোধ করছিল। ঘোর দুপুরে, মান্দারণের সেই জঙ্গলে, এমন স্তব্ধতা নেমে এসেছিল, যেন পাখিরা ডাকতে ভুলে গিয়েছে। ঝিঁঝিঁ নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল।

সাধুনী তাকে হাত ধরে টেনে ডেকেছিল, 'আয়।'

একহাত দিয়ে বারবকের কোমর জড়িয়ে ধরে, গাছের ডালপালা পাতায় তৈরি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। দিনের বেলা বলেই, ভিতরে একটু আলো ছিল। সেই আলোয় দেখা গিয়েছিল, ঘরের মধ্যে নরমুণ্ডের কয়েকটা কঙ্কাল এক কোণে স্তূপীকৃত। বেতের তৈরী, গাবের আঠা লাগানো সাপের ঝাঁপি। দেখেই শুধু বোঝা যায়নি যে, ঝাঁপিগুলোর মধ্যে সাপ আছে। বন্ধ ঝাঁপির ভিতর থেকে হিস্‌হিস্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এক কোণে, মোটা মোটা বাঁশ ঘিরে খাঁচা তৈরি করা ছিল। সেই খাঁচার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা অজগর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়েছিল। ঘরের প্রায় মাঝখানেই একটা কুকুর শুয়েছিল। কুকুরটা একবার মাত্র চোখ তুলে বারবকের দিকে তাকিয়েছিল। অচেনার কৌতূহল মাত্র। আবার মাথা নামিয়ে চোখ বুজে পড়েছিল। গোটা ঘরের মধ্যে একটা আঁশটে গন্ধ।

বারবক অবাক চোখে সবই দেখছিল। তার সঙ্গে একটা ভয় মেশানো অস্বস্তি।

নতুন আর অচেনা পরিবেশের ভয়। তখন তার কাছে কোন অস্পষ্ট ছিল না। একটা গুপ্তিও না। সে বুঝতে পারছিল না, সাধুনী তাকে নিয়ে কী করবে। দরবেশ শুধু জানিয়েছিল, জিম্মি সাধুনী তাকে পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেবে। তার বংশধর জন্মাবে।

সাধুনীর বুকের ঢাকা তখন ছিল না। কোমরে জড়ানো সামান্য কাপড়ের বাকীটুকু মাটিতে লুটোচ্ছিল। বারবক সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখতে চাইছিল। সাধুনী হাসতে হাসতে বলেছিল, 'কীরে, ভয় পাচ্ছিস? অজগর দিয়ে তোকে খাওয়াব.আমি।'

বারবক সাধুনীর.দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। একেবারে যেন অবিশ্বাস করতে পারেনি। বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। সাধুনী হেসে লুটিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে হাসি রঙ্গিনীদের মতো নয়। বিবি বেগমদের মতো নয়। সেই হাসির মধ্যেও ভয়ংকর কিছু যেন ছিল। তার রক্ত কষায়িত চোখে, হাসির দোলায় থরথরানো রক্তাক্ত বুকে, একটা ভয়ংকরতা ছিল।

হাসতে হাসতেই সাধুনী ঘরের এক কোণে গিয়ে, বেড়ার গায়ে ঝোলানো বেতের কুনকে তুলে নিয়েছিল। তার ভিতর থেকে ন্যাকড়ায় বাঁধা কী একটা বের করে, এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'এটা নে, খা।'

বারবক শাহীমঞ্জিলের খাওয়াজা সেরা। সেখানে সন্দেহ অবিশ্বাস পদে পদে। খা বললেই কিছু খেতে আরও দ্বিধা আছে। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী এটা?

—যা দিচ্ছি, তাই খা।

সাধুনী ধমকে উঠেছিল। বারবকের চোখের দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সাধুনীর চোখে কী যেন ছিল। বারবক অবাধ্য হতে পারে নি। হাত বাড়িয়ে ছোট রুদ্রাক্ষের মতো একটা বড়ি নিয়েছিল। রুদ্রাক্ষের মতই রক্তিম, অমসৃণ, গোল বটিকা। বারবক আবার তাকিয়েছিল সাধুনীর চোখের দিকে। সাধুনি বলেছিল, 'চিবিয়ে খা, আমি জল দিচ্ছি। মুখে দে।'

বারবক মুখে দিয়েছিল। সেই হুকুম অমান্য করতে পারে নি সে। মুখে দিয়ে, চিবোতে গিয়ে, সেটা ভেঙে গুড়িয়ে যায় নি। অনেকটা হাকিমী হজমী গুলির মতো মনে হয়েছিল। সাধুনী মাটির ভাঁড়ে জল এনে দিয়েছিল। জলের রং যেন অনেকটা পানা পুকুরের জলের মতো সবুজ। গন্ধতেই বুঝতে পেরেছিল, কাঁচা ভাঙ্ পাতা নিঙড়ানো জল। ভাঙের গন্ধ বারবকের চেনা। জলটা সে

যখন চকচক করে খাচ্ছিল, তখন সাধুনী উচ্চারণ করেছিল, 'রক্ত, বীজ, বিষ্ঠা কালবিষ। জয় মা! জয় গাজী!'...

তারপরেই সাধুনী সম্পূর্ণ উলঙ্গ হবার জন্যে বারবককে হুকুম করেছিল। কিন্তু সে হুকুম হারেমের জোলেখা বিবির হুকুম নয়। সে হুকুম সাপিনীর হিস্‌হিস্‌ বাঘিনীর গর্জন নয়। এমন কি, জলালুদ্দীন ফতেশা'র হুকুমও নয়। তার চেয়েও ভয়ংকর, ভীষণ কিছু। সাধুনী তাকে স্পর্শ করে দেখেছিল। তারপরেই শিশুকে আদর করার মতো, আদর করে বলেছিল, 'আছে আছে। গাজীর কথা কখনো মিথ্যা হবার নয়। দরবেশ ঝুটা স্বপ্ন পায় নি। আমি ঝুটা হুকুম পাই নি।'

তারপরে শুরু হয়েছিল, বিচিত্র অদ্ভুত সব ক্রিয়া। প্রায় হারেমের বিবিদের মতোই আচার আচরণ করেছিল সাধুনী। অথচ বিবিদের মতো ভাব ভঙ্গি, কামবিকৃত লালসা' তার মধ্যে ফুটে উঠে নি। সব সময়েই সে বিড়বিড় করে যেন কী বলছিল।

একবারই মাত্র বারবক তার নষ্ট অঙ্গে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করেছিল। মনে হয়েছিল, সে বেহুঁশ হয়ে যাবে। কিন্তু হয় নি। বরং তার রক্তের ধমনীতে বহু দূরে, বহুদূরে অস্পষ্ট স্তিমিত কী একটা যেন চলে-ফিরে বেড়ায়, যা সে অনেকবার অনুভব করেছে তাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার শরীরে অদ্ভুত বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। সাধুনী যে কি করছিল, কিছুই যেন সে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তার শরীরে মনে, পরিবর্তন ঘটছিল, এবং সহসা সাধুনীর উৎফুল্ল চিৎকারে সে নিজেও আবিষ্কার করেছিল সে পুরুষ। সে বীর্যবান।

সাধুনী বলেছিল, 'এক মাস রোজ এই বড়ি খাবি। ভাঙের জল খাবি। তোর পুরুষত্ব এখনো অনেক দূরে আছে। ঠিক সময়ে সে দেখা দেবে। এই নে আঙ্‌টি। কখনো আঙুল থেকে খুলবি না। দিন রাত পরে থাকবি। আমি তোকে খালি জানিয়ে দিলাম, তুই চাক্ষুষ করলি, তোর পুরুষত্ব আছে। সময় যখন আসবে, আমাকে মনে করিস। যে মেয়ে তোর বংশধরের জন্ম দেবে তাকে আমি মন্ত্র দেব।'

একটা আশ্চর্য সুখ, বিস্ময়, কৌতূহল অথচ অবসন্নতা বোধ করেছিল বারবক। বিদায় নিতে গিয়েও সে দাঁড়িয়েছিল। সাধুনী জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর কি চাস?'

বারবক বলেছিল, 'আপনাকে কী দেব?'

—আমাকে?'

সাধুনী খলখল্ করে হেসেছিল। বলেছিল, কী দিবি। নিজেকেই দিবি। চিরদিন আমার বান্দা হয়ে থাকবি। পারবি না ?'

—পারব। আমি, আজ এখন থেকেই আপনার বান্দা হয়ে থাকতে চাই।

সাধুনি আবার হেসেছিল। তারপরেই গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'স্বাদ পেয়েছিস, না ? দরবেশের কথা ভুলে গেছিস, না ? শীগ্গির পালা এখান থেকে। গাজীর মর্জি পালন কর গিয়ে, সেটাই তোর কাজ।'

বারবক চলে এসেছিল। এই সেই আঙ্টি! অন্ধকারে এখনো সে হাত দিয়ে অনুভব করছে।

জন্নত রুদ্ধশ্বাস সরু গলায় বলে উঠল, 'আর কি মনে আছে, কেমন দিনে ফতেশার জীবন যাবে ?

বারবক যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় দ্রুত বলল, 'মনে আছে, মনে আছে, এই মাসের শুক্লাসপ্তমীতে, কিন্তু যদি আকাশে চাঁদ না দেখা যায়, যদি মেঘ করে, যদি বাজ পড়ে, চিকুর হানে, সেই রাত্রে...।'

নিষ্কম্প তীক্ষ্ন গলায় জন্নত বলে উঠল, 'আজ সেই রাত!'

—আজ সেই রাত!...

বারবক উচ্চারণ করা মাত্র শাহীমঞ্জিল কাঁপিয়ে ভয়ংকর শব্দে আবার বাজ পড়ল। একবার—দুবার—তিনবার, পর পর ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল। বহি-কক্ষের পর্দা ভেদ করে যেন বিদ্যুল্লহরী ঝিলিক হেনে গেল। আর সেই মুহূর্তে বহির্কক্ষ থেকে ভিতর-প্রকোষ্ঠে যাবার দরজার কাছে যেন একটি ছায়ামূর্তি চকিতের জন্যে দেখা গেল। বারবক বলে উঠল, 'কে ওখানে ? ওখানে কে ?'

সাড়া না পেয়ে বারবক ডেকে উঠল, হিদ্না!

বামন খোজা হিদ্নার গলা শোনা গেল, 'দেখছি।'

বলেই সে নিঃশব্দে ক্ষিপ্রবেগে তার ছোট্ট দেহ নিয়ে ছুটে চলে গেল। মনে হল একটা শিকারী হিংস্র কুকুর পায়ের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। বারবকও স্থির হতে পারল না। ভিতর-প্রকোষ্ঠের দিকে গেল। সেখান থেকে ছোট দরজা দিয়ে শাহীমঞ্জিলের অন্যান্য কক্ষে বেরিয়ে যাওয়া যায়। ভিতর-প্রকোষ্ঠেও অন্ধকার

ছিল, এবং বারবক সেখানে যেতেই একটি চাপা আর্তনাদ শোনা গেল। ভারী কিছু পতনের শব্দ হল।

বারবক ততক্ষণে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিয়েছে এবং অন্ধকারে মানুষের একটা অবয়বও যেন সে দেখতে পেয়েছে। হিদনার গলা শোনা গেল, 'হুজুর, এ পালাতে চাইছিল আমি ওর পায়ে কামড়ে ধরেছি।'

বারবক বলল, 'আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। তোর কাছে চকমকি আছে?'

—আছে হুজুর।

—ওকে ছেড়ে দে, চকমকি ঠোক!—কিন্তু তুই যেই হোস, আমার হাতে খোলা তলোয়ার। উঠিস না, মুণ্ডু ধড় ছাড়া হয়ে যাবে।

একটু পরেই চকমকি জ্বলে উঠল। দেখা গেল, লোকটি হিদনার দংশিত স্থানে হাত চেপে বসে আছে। বাতি জ্বালা মাত্র ভীত চোখ তুলে বারবকের দিকে তাকাল। বারবক দেখল চেনা লোক, ইফতিয়ার। অমাত্য জহান খাঁর তাঁবে কাজ করে।

বারবকের রক্তাভ চোখ স্থিরনিবদ্ধ হয়ে রইল ইফতিয়ারের ওপর। খাপের মধ্যে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল সে। বলল, 'ওঠ ইফতিয়ার।'

ইফতিয়ার উঠে দাঁড়াল। বারবক স্বরহীন গলায়, বলল 'সব কথা শুনেছ না?'

ইফতিয়ার কম্পিত অসহায় গলায়, বলল 'কোন কথা শুনি নি।'

বারবক সে কথায় কর্ণপাত করল না। একই সুরে বলল, 'তোমাকে জহান খাঁ পাঠিয়েছে খবর যোগাড় করবার জন্য। আমি কোথায়, আমি কী করছি। জহান খাঁর কানে হয়তো কিছু গেছে, তাই না?'

ইফতিয়ার ভীত গলায় বলল, 'আমি কিছু জানি না।'

বারবক ইফতিয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সে ইফতিয়ারের চোখের থেকে চোখ সরাল না। মুহুর্মুহুঃ বাজ পড়ার পরেই এখন বৃষ্টি বেশ জোরে বইছে। বৃষ্টির শব্দ আসছে। জন্নত বুড়ি এসে সামনে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে ইফতিয়ার যেন আরো ভয় পেয়ে গেল। সে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

জন্নত বলল, 'কে এটা?'

বারবক বলল, 'ইফতিয়ার। ওকে দেখা মাত্রই বুঝেছি, জহান খাঁ ওকে পাঠিয়েছে। ও আমাদের কথা যা শুনেছে, এখুনি গিয়ে তাকে বলবে। কিন্তু আমি ভাবছি, জহান খাঁ সংবাদ পেল কী করে? কিছু একটা সংবাদ সে নিশ্চয় পেয়েছে, তাই সন্দেহ করে ওকে পাঠিয়েছে।'

বারবক কথা বলছিল, কিন্তু একবারও চোখ নামায়নি ইফ্‌তিয়ারের চোখ থেকে। এবার আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে সে যেন ইফ্‌তিয়ারকে মাপল। ইফ্‌তিয়ারের মাথা ছিল তার চিবুকের কাছে। অনেকেরই থাকে। সুলতান ফতেশারও থাকে। সে আবার বলে উঠল, 'কিন্তু ওকে আমি ছেড়ে দেব না।'

ইফ্‌তিয়ার চমকে কেঁপে উঠল, প্রায় কান্নাজড়ানো স্বরে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, বারবক, শাহীমঞ্জিলে বিনাহুকুমে ঢোকবার জন্যে আমি সুলতানের কাছে মাপ চাইব।'

বারবক ইফ্‌তিয়ারের কাঁধে হাত দিল। বলল, 'সুলতান তোমাকে মাপ করবে। কিন্তু জহান খাঁর কাছে তোমাকে ফিরে যেতে আর দেব না।'

ইফ্‌তিয়ার প্রায় ককিয়ে উঠল, 'কী করবে তবে?'

বারবক বলল, 'কয়েদ করব না।'

—তবে!

বারবক সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'গত বছরের এক দুপুরের কথা মনে আছে ইফ্‌তিয়ার? তুমি আমি খিজির শরফ, আমরা পনি হাঁকিয়ে মৌলানাতলীর মাঠে গেছলাম?'

ইফ্‌তিয়ার ভয়ের মধ্যেও অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?'

—সেই কথাগুলো মনে পড়ছে। আমরা সরাব খেলাম। ছুটোছুটি করলাম তুমি আবার ঘোড়া হাঁকিয়ে, কাছের গাঁ থেকে একটা মেয়েমানুষকে ধরে নিয়ে এলে, তোমরা তিনজন পরপর তার সঙ্গে শুলে, আমাকেও বললে মজা দেখবার জন্যে, কারণ জানতে আমি খোজা। কেন জানি না, তোমাদের ব্যাপার দেখে, আমার এই খোজা-শরীরের মধ্যে একটা কী রকম করছিল, এমন কি আমার শরীরে সেই প্রথম আমি একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম।...কিন্তু যাই হোক, আমি সেই বেচারীর গায়ে হাত দিই নি। মেয়েমানুষটি ভাবল, আমি খুব ভাল লোক, আমার পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তোমাদেরও ভয় হল, যদি মেয়েমানুষটি কাজীর কাছে যায়। মেয়েমানুষটি নিজেই জানাল, সে কাজী দূরের কথা, ঘরের পুরুষকেও বলবে না, তাকে ছেড়ে দিলেই যথেষ্ট। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা ফিরে এলাম।'

ইফ্‌তিয়ার ভয়ার্ত বিস্ময়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু সে আওরত তোমার তো, কেউ হয় না, তুমি তার কথা বলছ কেন?'

বারবকের গলায় সুর ছিল না, যেন তার গলার ধমনী ছিঁড়ে গিয়েছে, তাই

একটা অদ্ভুত সুরহীন স্বরে সে কথা বলছিল এবং ক্রমেই তার মুখটি যেন ফুলে উঠছিল। তার নিশ্বাস পড়ছিল না যেন। সে ইফ্‌তিয়ারের দাড়ি আলতো করে নেড়ে দিল, একটু হাসবারও চেষ্টা করল। বলল, 'এমনি, বলছি, এখন মনে পড়ছে সেই কথা, তোমার সঙ্গে কত ঘুরেছি। সেই একবার এক আমবাগানে আমরা কয়েকজন মিলে খুব গাঁজা খেয়েছিলাম, মনে আছে?'

—আছে।

—তোমার সঙ্গে আমার দোস্তি ছিল। কিন্তু নিয়তি।...

বারবকের গলার স্বর হঠাৎ ডুবে গেল, তার আয়ত রক্তচোখের দৃষ্টি একবার জন্নতের মুখের দিকে ছুঁয়ে এল। সেই গলকম্বল কাঁপছে নিশ্বাসের টানে, আর মুখের রেখাগুলি কুঁকড়ে উঠছে। তার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল বারবকের প্রতি।

বারবক হঠাৎ রুদ্ধশ্বাস নিচু গলায় বলে উঠল, 'বাতি নিভিয়ে দে হিদ্‌না।'

মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল, আর বারবক তার সুদীর্ঘ শক্ত ডানা দিয়ে, ইফ্‌তিয়ারের গলা চেপে ধরল। পিছন ফিরিয়ে আছড়ে ফেলল তাকে নিজেরই ঢালের মতো প্রকাণ্ড কঠিন বুকে। ইফ্‌তিয়ারের গলায় একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল, 'বারবক!'

বারবকের চাপা গোঙানো স্বর শোনা গেল, 'উপায় নেই ইফ্‌তিয়ার, নিয়তি...! জহান খাঁর লোক তুমি, তুমি যা শুনেছ, তারপরে আর তোমাকে এ রাত্রে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়, নিয়তি...! তোমার সঙ্গে অনেক ঘুরেছি...তোমাকে যদি আমার দলে পেতাম...!'

বারবকের যেন হাঁফ ধরে যাচ্ছিল, এমনি শোনাচ্ছিল তার গলার স্বর। প্রকোষ্ঠের মেঝেয় পা আছড়াবার শব্দ উঠছিল। ইফ্‌তিয়ারের পা, বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টায় সে শূন্যে হাত ছুঁড়ছিল আর পা ছুঁড়ছিল মেঝেয়। কিন্তু গলা থেকে আর টুঁ শব্দটি বেরুবার উপায় ছিল না। বারবকের কঠিন ডানার চাপে, তার শক্ত বুকের মধ্যে গলাটা ক্রমেই পিষে যাচ্ছিল।

বারবক যেন কষ্ট করে, দমবন্ধ গলায়, তখনো বলছিল, 'কাঁটাদুয়ারের দরবেশের ভবিষ্যৎবাণী, গাজী ইসমাইলের কথা...আর আমি নিয়তির হাতের পুতুল..., ইফ্‌তিয়ার কতদিন কত জায়গায়...।'

এই সময়ে জন্নতের গলাও শোনা গেল, 'আঃ, যদি একদিন তুই চুরি না হতিস, তবে এই রাত্রে এখন হয়তো বিবি-বাচ্চাকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমোতিস।'

বারবক যেন দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'কিন্তু নিয়তি...।'

জন্নত বুড়ি বলল, 'তোকে তোর কাজ করাতে নিয়ে এসেছে।'

বারবকের গলা আরো নিচু হল এবং যেন গর্তের ভিতর থেকে শব্দ বেরুল, 'তাবত সংসারের বাসনা।'…

পরমুহূর্তেই তার গলা থেকে একটা দমকা নিঃশ্বাস পড়ল। আর গলার স্বরটা হঠাৎ শোনাল কোলা ব্যাঙের মতো মোটা, 'উপায় নেই…ইফ্‌তিয়ার! আমি নাচার। জন্মের পর থেকে, এই মরণই পিছু পিছু ফেরে। জানি, সে ঠিক এইভাবেই কোন-না-কোন একসময় এসে ধরে। তবু পালাবার জন্য কতই না চেষ্টা। কে জানে, আমাকে—আমাকে সে কখন কীভাবে এসে ধরবে। আঃ! মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে আনা ছেলে ··ফতেশা বলেছিল, খোদার কোন মর্জি আছে। কী বলেছিলে তুমি নানী, আমি তাবত সংসারের বাসনা!…

জন্নত বলে উঠল, 'আবার আলোটা জ্বালা হোক।'

বারবক নিচুস্বরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'না না, আলো চাই না, এই অন্ধকার ভাল। আজ শুক্লাসপ্তমী, কিন্তু চাঁদ ওঠে নি, মেঘে ঢেকে রয়েছে আসমান, বিজলী হানছে, বাজ পড়ছে বাইরে, নানী, আজ এই অন্ধকারই ভাল। তুমি আজ আর কিছু চোখে দেখতে চেয়ো না। আমি তোমাকে বলছি, ইফ্‌তিয়ার এখন আমার বুকে এলিয়ে পড়ে আছে, ওর হাতগুলো ঝুলে পড়েছে। এখনো আমি ওর গলা ধরে আছি, কিন্তু ওর আর নিঃশ্বাস পড়ছে না। ওর গা এখনো গরম। আর আমার কবজিতে এখন ফোঁটা ফোঁটা গরম কী যেন পড়ছে, বোধহয় ওর ঠোঁটের কষ থেকে রক্ত পড়ছে। আর—দাঁড়াও দাঁড়াও আমি হাত দিয়ে দেখে নিই আগে। হ্যাঁ ··ওর চোখদুটো খোলা, মুখটা হাঁ করে রয়েছে। এবার ওকে আমি শুইয়ে দেব।

ইফ্‌তিয়ারকে ছুঁড়ে না ফেলে, আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল বারবক। ইফ্‌তিয়ারের কামিজে কবজি মুছতে মুছতে বলল, 'এই ইফ্‌তিয়ার আর আমি, এক গরমের দুপুরে একদিন একটা সরোবরে চান করেছিলাম। সরোবরের একদিকে অনেক দাম আর পদ্মফুল ছিল। ইফ্‌তিয়ার অনেকগুলো ফুল তুলে এনেছিল, বলেছিল, বিবিকে দেব। বিবি ইফ্‌তিয়ারের। কালো মেয়েটি, দেখতে সুন্দর, তিনটি ছেলেমেয়ে। উজীরে-আজম জহান খাঁর কৃপায়, শহরের ধারে চার ঘরওয়ালা মাটির বাড়ি, গরু ভেড়া মুরগী বেশ ভালই আছে, লাউ-সীমের মাচা আছে, আমি কয়েকবার গেছি… ।'

জন্নতের গলা শোনা গেল, 'কিন্তু সুলতানশাহীর কাছে এ সবের কোনই দাম নেই।'

—দাম নেই ? বারবক বলল।

জন্নত বলল, 'থাকলে, জহান খাঁর চর হয়ে মঞ্জিলশাহীতে আসত না। সে আরো সোনা চেয়েছিল নিশ্চয়, তার বাসনা… ।'

বারবক বলে উঠল, 'বাসনা তাবত সংসারের বাসনা। …হিদনা। ইফ্‌তিয়ারকে দেয়ালের দিকে সরিয়ে দে, ও আজ রাত্রিটা এখানেই থাকুক। কাল ওকে ঘোড়ার পিঠে তুলে, কেউ যেন ওর বিবির কাছে দিয়ে আসে। আর যেন বলে দেয়, ও জহান খাঁর চর হয়ে, রাত্রে মঞ্জিলশাহীতে ঢুকেছিল। ও যদি আমার লোক হত …সুলতানশাহীর এই নিয়ম।'

অন্ধকারে হিদ্‌না ইফ্‌তিয়ারকে সরিয়ে দিল, সামান্য একটু ঘসঘস শব্দ হল। বারবক ডেকে বলল, 'হিদ্‌না সরাব!'

সেই মুহূর্তেই যেন একটি অচেনা স্বর, অদ্ভুত সুরে ডেকে উঠল, 'বারবক!'

বারবক চমকে উঠে বলল, 'কে ?'

—আমি, আমি জন্নতোন্নিসা।

জন্নতের গলা যেন সম্পূর্ণ অন্যরকম শোনাল, উত্তেজিত, রুদ্ধশ্বাস এবং অল্প-বয়সী মেয়ের মতো সরু টানটান।

বলল, 'কাঁটাদুয়ারে দরবেশের আর কোন কথা কি তোমার মনে পড়ছে না বারবক? সেই শেষ কথা ? যে কথা লুকিয়ে শোনবার আগেই ইফ্‌তিয়ার চির-দিনের জন্যে চলে গেল ? সেই কথা কি তোর মনে পড়ছে না ?'

বারবক ফিসফিস করে বলল, 'পড়ছে নানী।'

—কী

—মনে পড়ছে, দরবেশ আমার কপালে হাত রেখে একদিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, আর বিড়বিড় করতে লাগল। তার লাল চোখগুলো বড় বড় হয়ে উঠল, আর বলে উঠল, "সুলতানের রোশনি তোর কপালে দেখছি। বারবক তুই সুলতান হবি, আমি দেখতে পাচ্ছি! সুলতান, সুলতান!"…

বলতে বলতে প্রকোষ্ঠ থেকে বহির্কক্ষের দিকে পা বাড়াল সে। জন্নত বলে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছিস? আমাকে বল, সব কি তোর মনে আছে ?

বারবক দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, 'আছে নানী।'

জন্নত বলল, 'সবকিছুই মিলে গেছে, আর আজ সেই শুক্লা সপ্তমী, কিন্তু অন্ধকার—।'

—মনে পড়ছে নানী। আমার সবই মনে আছে।

কিন্তু সেই কথা কি মনে আছে, ফতেশা তোর মুখে একদিন অনেকের সামনে থুতু দিয়েছিল ?

বারবক চাপা স্বরে গর্জন করে উঠল, 'আছে, আছে।'

—শুধু তোর অপরাধ ছিল, সুলতানের সামনে কথা বলতে গিয়ে কথা আটকে গেছল। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে সুলতানের রাগ-রাগ মুখ দেখে, তোর কথা আটকে গেছল, তাই তোকে নিচু হয়ে হাঁ করতে বলেছিল ফতেশা আর থুক দিয়েছিল। বলেছিল, মুখে যেন আর কথা আটকে না যায়।

বারবক থু থু করে থুতু ফেলল, আর গোঙানোর মতো শব্দ করল, 'হুঁম…।'

শব্দ করতে করতেই সে বহির্কক্ষের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একবার থামল, নিচুস্বরে বলল, 'তুমি হারেমে ফিরে যাও নানী, অবস্থা দেখ। আমি জানতে চাই, ইফ্‌তিয়ার কোনখান দিয়ে, কার চোখ ফাঁকি দিয়ে শাহীমঞ্জিলে ঢুকেছিল। সত্যি সে লুকিয়ে ঢুকেছিল, না কেউ তাকে মদদ্‌ দিয়েছে। সুলতানশাহীর চারদিকে কেবল মোহরের খেলা। যদি কোন নায়েক টঙ্কা খেয়ে থাকে, তাকে আমি খুঁজে বের করব। তুমি যাও।'

জন্নত এগিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু রাত্রি বাড়ছে।'

—জানি নানী।

—আজ রাত্রে!

—আজ রাত্রে…!

বারবক বেরিয়ে গেল অলিন্দে। হিদ্‌না তার পায়ে পায়ে। একবার বলল, 'সরাব চেয়েছিলেন ?'

—হ্যাঁ দে, সরাব দে,।

বারবক পাত্র তুলে গলায় ঢালল।

সুরাপাত্র হিদ্‌নার হাতে ফিরিয়ে দিয়েই দ্রুতপায়ে শাহীমঞ্জিলের পূর্বদিকে এগিয়ে চলল সে। বৃষ্টির ধারা এখন কমেছে। অনেক কমেছে, মনে হয় বৃষ্টি পড়ছে না। আকাশ তেমনিই কালো। বজ্রগর্ভ একটা বিশাল মেঘ নিচে নেমে এসেছিল হয়তো কিছুক্ষণ আগে। এতক্ষণ তারই তাণ্ডব হচ্ছিল। ইফ্‌তিয়ারের

মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করার জন্যই যেন সে এসেছিল। এখন আবার আগের মতই দূরে, দূরান্তে, বিজলী হানছে। তড়িতমালা আঁকা পড়ছে, অদৃশ্য হচ্ছে। আজ শুক্লা-সপ্তমী, কিন্তু অন্ধকার।

বারবক অলিন্দের ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলেছে, আর সেই হাবশীর কাটা মুন্ডটা যেন দেখতে পাচ্ছে। সেই কাটা মুণ্ডের পাশে এখন ইফতিয়ার। 'ইফতিয়ার!' ···বারবক নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে উচ্চারণ করল। এই দ্বিতীয় হত্যা, নিজের হাতে! সুলতানশাহীর সব কিছুতেই রক্তমাখা। কিন্তু এই তলোয়ার, এই হাতের খুনের তৃষ্ণা, কার মুণ্ড, কার গলা লক্ষ্য করে সেদিন ছুটে গিয়েছিল? ইফতিয়ারকে আজ যখন ঢালের মতো বুকে, ডানা দিয়ে গলা চেপে ধরেছিল, তখন বারবক কাকে মারছিল? ইফতিয়ারকে, না আর কারুর মুখ তার চোখে ভাসছিল?

অন্য আর একটি মুখ গৌররক্তিম যার বর্ণ, চোখের তারা ধূসর-কালো, একটু বা পিঙ্গলের আভাস, নিষ্ঠুরতা সুখ ও ঔদ্ধত্য যে চোখে খেলছে মুহূর্তে মুহূর্তে আর মেহেদী রাঙানো আগুনের মতো লাল দাড়ি, বাতাস-কাঁপা আগুনের শিখার মতোই সর্পিল হয়ে উঠেছে। এই অন্য একটি মুখ কি তার চোখের সামনে ভাসছিল। যখন ইফতিয়ার তার বুকে ছিল?

অলিন্দের মেঝেয় থুতু ফেলল বারবক। নায়েকেরা স্থির। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। বারবক চলতে চলতেই বলল, 'বাইরের লোক, জহান খাঁর লোক কী করে ঢুকেছে মঞ্জিলশাহীতে?'

শোনা মাত্র নায়েকদের অনেকের মূর্তি ঈষৎ নড়েচড়ে উঠল। বারবক চলতে চলতেই, এবার আরো জোরে বলে উঠল. 'মৈনুদ্দীন কোথায়?'

সমস্ত অলিন্দের মূর্তিগুলির মধ্যেই একটু চঞ্চলতা দেখা দিল। পূর্বদিকের বড় দরওয়াজার কাছে পেঁছুবার আগেই, কয়েকটা আলো দেখা গেল, দেয়ালে লটকানো। একজন ছুটে আসছে। হিদুনা উচ্চারণ করল, 'মৈনুদ্দীন খাঁ।'

বারবক দাঁড়িয়ে পড়ল। মৈনুদ্দীন কাছে ছুটে এসে, প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমি এইমাত্র খবর পেলাম, জহান খাঁর চর এসেছে। আমি লোক ছেড়ে দিয়েছি ভেতরে তাকে খুঁজে বের করার জন্যে।

বারবক বলে উঠল, 'উল্লুক, তোর আবার সরে-লস্কর হবার শখ। একটু মদ খেলেই মাতাল হয়ে যাস, আর মেয়েমানুষের জন্যে হাতড়াতে আরম্ভ করিস।'

—পীরের দিব্যি বলছি বারবক।

—থাম!

বারবক ধমকে উঠল, 'তোকে আমি চিনি না, না? মদ খেতে চাস তো খা না কত খাবি, শেষে যে নিজেরাই মরবি।

ধমক খেয়ে মৈনুদ্দীন চুপ করে গেল।

'হিদুনা মৈয়নকে সরাব দে।'

হিদুনা পাত্র এগিয়ে দিল। মৈনুদ্দীনের রক্তিম চোখে লজ্জা ও সঙ্কোচ। তবু এক ঢোক গলায় ঢালল। সঙ্গে সঙ্গে বারবক বলে উঠল, 'জলদি বাইরে চলে যা কয়েক জনকে নিয়ে। জহান খাঁর মঞ্জিলের দিকে নজর রাখ্। হাবশ খান আর আলমাস, এই দুই হাবশী ওমরাহ্ তাদের মঞ্জিলে আছে কি না, খবর নিতে হবে। আর গোটা গৌড় শহরের কোথায় কে কি করছে, একবার ভাল করে দেখতে বল্।'

মৈনুদ্দীন বলল, 'এখুনি দেখছি।'

বলে ফিরতে গিয়েই সে আবার থম্‌কে দাঁড়াল। তার দুই উদ্দীপ্ত চোখ বিস্ময় ও ভয়ে যেন চমকে উঠল। সে বারবকের বুকের দিকে তাকিয়েই, চোখের দিকে তাকাল। গলার শিরগুলি ভার ফুলে উঠল। ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল, 'বারবক!'

বারবক তার দৃষ্টি অনুসরণ করে, চোখ নামিয়ে নিজের বুকের দিকে দেখল। কয়েক ফোঁটা রক্ত লেগে আছে বুকের একপাশে। সোনালি বুটি শাদা মেরজাইয়ের ওপরে, তাজা রক্ত এখনো ভেজা। তৎক্ষণাৎ আঙুল দিয়ে রক্ত মুছতে গিয়েও থমকে গেল সে। যেন চেষ্টা করেও রক্ত মুছতে পারছে না। আলোর সামনে সে সহসা যেন অন্য এক জগতে এসে পড়ল। কিছুক্ষণ আগেই যে সে তার বুকের ওপর ফেলে একজনকে গলা টিপে হত্যা করেছে, এ কথা সহসা স্মরণ করতে পারছে না। এবং বারেবারেই হাত তুলে, আঙুল দিয়ে রক্ত ঘষে দিতে চাইল, পারল না।

মৈনুদ্দীন আবার নিচু উত্তেজিত গলায় ডাকল, 'বারবক, বারবক!'

বারবক চমকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ? এই রক্ত—এই রক্ত—?'

হিদুনা পায়ের কাছ থেকে বলে উঠল, 'জাহান খাঁর লোকের। যে ঢুকেছিল শাহীমঞ্জিলে।

বারবকের যেন সহসা স্মরণ হল, বলে উঠল; 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জহান খাঁর লোকের, যে ঢুকেছিল শাহীমঞ্জিলে। এ রক্ত—এ রক্ত ইফ্‌তিয়ারের।'

বারবকের গলা যেন কোন্ অতল গর্তে ডুবে গেল। মৈনুদ্দীন কয়েক মুহূর্ত ভীত বিস্ময়ে বারবকের দিকে তাকিয়ে হুকুম তামিল করতে চলে গেল। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল নায়েকেরা সবাই বারবকের দিকে তাকিয়েছিল। নায়েকেরা

সকলেই তার বশংবদ, সকলেই তার অনুচর, আজ এই রাত্রির সঙ্গী সবাই। কাঁটা-দুয়ারের দরবেশের ভবিষ্যৎ বাণী। এই পাহারারত পাঁচ হাজার নায়েক সকলেই জানে। এই শুক্লাসপ্তমীর রাত, অথচ মেঘবৃষ্টি অন্ধকারের ভয়ংকর রহস্যকথা তারা সকলেই জানে। তবু বারবককে দেখে তাদের চোখে যেন এক অজানা শঙ্কা দেখা দিল।

বারবক বলে উঠল, 'বিশ্রী জঘন্য এই আলোগুলো। তামাম মঞ্জিল আজ অন্ধকার থাকবার কথা। কেন এখানে আলো জ্বলছে?'

একজন নায়েক নেতা বলে উঠল, 'আপনি হুকুম দিয়েছিলেন আলো রাখবার জন্যে।'

—হুকুম দিয়েছিলাম!

আর একবার বুকের কাছে হাত দিতে গিয়েও থেমে গেল বারবক। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সামনে, যেদিকে অন্ধকার, সেদিকে চলে গেল। আলোকিত অংশটা যেন কোনরকমে মুখ ঢেকে চলে গেল। অলিন্দে বাঁক নিয়ে কোমর অবধি আলসে ঘেরা একটি গোল জায়গায় সে দাঁড়াল। একটি মস্তবড় খাঁজকাটা পাথরের স্তম্ভকে ঘিরে এই গোলাকার অংশটি তৈরি। এখান থেকে নিচের দিকে একটি সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। তারপরে একটি বাগান-ঘেরা উঠোন, উঠোনের ওপারে শাহীমঞ্জিলের আর এক অংশ। হারেমের অংশ। ঠিক এখানকার মতোই সিঁড়ি দিয়ে উঠে, আলসে-ঘেরা গোলাকার মণ্ড, মাঝখানে বিশাল স্তম্ভ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, দুটি আলাদা ইমারত। যদিও তা নয়। বারবক এখন যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে অলিন্দ পশ্চিমে এগিয়ে, একটি সুদীর্ঘ বাঁক নিয়ে হারেমের দিকেই গিয়েছে। একই ইমারত, একই অঙ্গ। কিন্তু এই অংশে দরবারকক্ষ, বিভিন্ন উজীর-ওমরাহদের সঙ্গে মিলিত হবার ও মন্ত্রণার নানান ঘর। তাই এমনভাবে, পশ্চিমে বেঁকে গিয়ে সুলতানের আরাম বিরাম ও বিশ্রামের মঞ্জিল তৈরি হয়েছে, যার নিকটেই হারেম রয়েছে, সেই গোটা অংশকে সহসা বিচ্ছিন্ন মনে হয়। এখানকার মতো হারেমের দিকেও অলিন্দ আছে। সে অলিন্দ ঢাকা। চওড়া দেওয়াল দিয়ে আড়াল করা, যদিও অনেক ছিদ্র আছে। যে ছিদ্র দিয়ে বিবিরা বাইরের দিক দেখতে পায়, লোকজন চোখে পড়ে। তাদের কেউ দেখতে পায় না।

বারবক স্তম্ভে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। এখানে অন্ধকার। স্তম্ভের গায়ে বুক ক্ষয়ে, সেই রক্তের জায়গাটা সে ঘষতে লাগল। ঘষতে ঘষতে যখন নিশ্চিন্ত হল, ঠে গিয়েছে, তখন পাথরের ঠাণ্ডা স্তম্ভটিকে সে জড়িয়ে ধরল। উত্তপ্ত গাল

—থাম

চেপে ধরল। গোঙানো স্বরে আরামসূচক শব্দ করল একবার। আবার হায়েমের দিকে ফিরে তাকাল।

শাহীমঞ্জিল। এমন সুন্দর ইমারত আর একটিও নেই গৌড়ে। দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা আসে, দূরে দাঁড়িয়ে এই শাহীমঞ্জিল দেখতে। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের তৈরি এই প্রাসাদ। এই প্রাসাদেই প্রথম কাজ করতে এসেছিল বারবক। তার যখন পনর-ষোল বছর বয়স, তখন এই শাহীমঞ্জিল তৈরি শেষ হয়েছিল। আর বিশ বছর বয়সে সে প্রথম কাজ করতে এসেছিল।...

এই প্রাসাদ আর গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা'—বিরাট অপূর্ব সুন্দর তোরণ রুকনুদ্দীনের স্মৃতি বহন করছে। এই শাহীমঞ্জিলে আসার প্রথম তোরণের গায়ে, পাথরের বুকে কবিতা খোদাই করা আছে। মালেকুশ শোয়ারা (রাজকবি), আমীর জৈনুদ্দীন হরুউয়ি সেই কবিতা লিখেছিলেন। তাঁকে দেখেছে বারবক। প্রথম প্রথম তোরণের গায়ে উৎকীর্ণ সেই শায়ের অনেকেরই মুখস্থ ছিল। বারবকেরও ছিল। আরবীতে লেখা আছে ঃ

তাঁর (রুকনুদ্দীনের) আবাস বাগানের
　মতো, শান্ত এবং আনন্দদায়ক,
তা আনন্দ সঞ্চয় করে
　এবং দুঃখ বিদূরিত করে।
এর নিচে দিয়ে একটি
　জলধারা বয়ে যায়,
স্বর্গের নির্ঝরের কথা
　মনে করিয়ে দিয়ে,
এর বুদবুদগুলি মুক্তোর মতো,
　তারা ভুলিয়ে দেয় দারিদ্র্য ও বেদনা
তার তোরণ আশ্রয় দান করে,
　আত্মাকে-সুগন্ধির-মতো-বন্ধুদের।
শত্রুদের কাছে এ নিষিদ্ধ
　এবং সুদূর।
একটি অনির্বচনীয় তোরণ, তৃপ্তিদায়ক
　ও স্ফূর্তিজনক। যাকে বলা হয়
মধ্য তোরণ, বিশেষ প্রবেশপথ

হিসেবে এটি নির্মিত।
আটশো একাত্তর হিজরায়।
জীবন, আশা এবং বিশ্রামের আবাস।

কবিতাটি মনে মনে বলে, শেষ কলিটি বারে বারে উচ্চারণ করল বারবক, 'জীবন, আশা ও বিশ্রামের আবাস! জীবন—আশা—বিশ্রাম!···আর কিছু নয়? শুধু এই! এই কি সব সত্যি কথা?'

এই সময়ে ঘন ঘন বিদ্যুৎ কষায়, শাহীমঞ্জিল ও বাগানঘেরা সকল দিগন্ত ঝলকে উঠল। মেঘ আবার গড়িয়ে নামছে। চিকুরহানা বাজ পড়ল যেন উত্তরের সরবৃ-গাছের মাথায়। বারবকের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মৈনুদ্দীন বাইরে গিয়েছে অবস্থা জানবার জন্যে। ও কি ফিরে আসতে পারবে? তার মনে সন্দেহ ক্রমে ঘনীভূত হয়ে এল। শাহীমঞ্জিলের বাইরে, এই রাত্রি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নেই। তা হলে ইফতিয়ার এসে ঢুকত না। মৈনুদ্দীনকে পাঠানো বোধহয় ভুল হয়েছে। হাবশীরা নিশ্চয় একটা কিছু আন্দাজ করেছে, তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। অথচ হাবশী আমীর-ওমরাহ্‌রা সব কিছু আগে থেকেই জানতো। বারবকের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি কোন কথা বা বৈঠক না হলেও, সঙ্গীদের সঙ্গে হয়েছে। আজ রাত্রের কথা তারা সবই জানে। তবু যেন জানে না, কিংবা সত্যি কিছু ঘটতে যাচ্ছে কী না, তাদের যেন কোন ধারণা নেই, এমনি একটা ভাব অবলম্বন করেছিল। কিন্তু আজকের, এই রাত্রি যতই এগিয়ে এসেছে, ততই যেন তাদের চোখ মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছিল। বারবকের মনে হচ্ছিল, কোন এক অদৃশ্য অন্ধকারে, আর একটা ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠছে। উঠছে যে, তার প্রমাণ, ইফ্‌তিয়ার। ইফ্‌তিয়ার এসেছিল সেই অদৃশ্য অন্ধকার থেকে। সেই অদৃশ্য অন্ধকার হঠাৎ অত্যন্ত সাবধান সতর্ক হয়ে উঠেছে। ওত্ পাতা বাঘের মতো। লাফ দেবার শেষ মুহূর্তে তার ধারালো নখগুলো খুলে ফেলেছে। অথচ, এতদিন ধরে, আজকের এই রাত্রি যে আসছে, সব জেনেও, সুলতানের কানে ওরা একটি কথাও তোলে নি। কেন না, সুলতানকে ওরাও, হাবশীরা ঘৃণা করে, ভয় পায়। ফতেশা ওদের গলায় শেকল বেঁধে শাসন করে। ওদের ক্ষমতাকে পায়ের তলায় চেপে রেখেছে। সুলতান জানে, হাবশীদের মতিগতি সুবিধার নয়। সুলতানশাহীর চামড়া চাটতে চাটতে,

রক্তের গন্ধে ওরা উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পেরেই, ফতেশা ওদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আজ রাত্রে, হাবশীরা সব কোথায়। কী চায় ওরা? ওদের উদ্দেশ্য কী? না না, মৈনুদ্দীনকে পাঠানো বোধহয় ঠিক হল না। মৈয়ন যদি দলের লোকদের দেখা না পায়, তবে এতক্ষণে হয়তো তার মাথা ধড় থেকে নেমে গিয়েছে। …শুক্লাসপ্তমীর রাত, কিন্তু মেঘ বৃষ্টি অন্ধকার! স্তম্ভের গা থেকে সরে এল বারবক। দরবেশ মুহম্মদের মুখ তার চোখের সামনে ভাসছে! সে যেন শুনতে পাচ্ছে দরবেশের গলা, 'সময় নেই আর, মধ্য-রাত পার হয়ে গেছে। আল্লার মর্জি পালন কর। আর সময় নেই।'

—আর সময় নেই।

গোঙানো অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল বারবক। কিন্তু মৈয়নের জন্যে মনটা খারাপ হচ্ছে। হয়তো শাহীমঞ্জিলের বাইরে তোরণের পাশেই হাবশীরা লুকিয়ে আছে। খবর তারা নিশ্চয়ই পেয়েছে। খবর তারা পেয়েছে বলেই ইফ্‌তিয়ারকে পাঠিয়েছিল। যদিও জহান খাঁ হাবশী নয়, কিন্তু সে হাবশীদের বন্ধু। আর ফতেশা হাবশী আমীর-উজীরদের বরাবরই সন্দেহ করে। ওরা কেউ কেউ দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে অনেকবার। ফতেশার কাছে শাস্তি পেয়েছে, অপমান সহ্য করেছে। ফতেশার বিরুদ্ধে যে ওরা কয়েকবার চক্রান্ত করেছে, সে খবরও বারবকের জানা আছে। একবার সে নিজেই ফতেশার কানে কথা তুলে দিয়েছিল। হাবশী ওমরাহ ইকরার খানের দাড়ি মুঠো করে ধরে, তলোয়ার দিয়ে কেটে দিয়েছিল সুলতান। কিন্তু প্রাণ নেয় নি! বলেছিল, 'এর পরের বার তোমার দাড়ি আর গলায় কোপ বসাতে কোন বাধা দিতে পারবে না। সেজন্যে এবার শুধু দাড়িই কেটে দিলাম।'

ঘটনা ঘটেছিল বারবকের সামনেই। ফতেশা ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছিল। আর ইকরার খানের তলোয়ার কোমর থেকে খুলে নিয়ে বারবককে দিয়েছিল। বলেছিল 'বান্দা, আমিই ওকে দিয়েছিলাম, এখন থেকে তোর কাছে থাকবে।'…

বারবক তলোয়ারের হাতলে হাত দিল! এই সেই তলোয়ার। ইকরার খানের তলোয়ার, ফতেশার উপহার! ফতেশার স্পর্শিত কৃপাণ। এও নিশ্চয়ই খোদার মর্জি।—হাবশীদের তাই চিরশত্রু বারবক। আজ তারা ভাবছে, তাদের মুখের গ্রাস বান্দা বারবকের হাতে। কিন্তু দরবেশ তাদের জন্যে কোন ভবিষ্যৎবাণী করেনি। সুলতানের রোশনি তাদের কারুর কপালে দেখা যায় নি।

তবু মৈয়নের কথাই মনে পড়তে লাগল। মৈয়নকে পথ থেকে তুলে নিয়ে

এসেছিল বারবক। ভিখিরি মৈনুদ্দীন, ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে ছিল। চুরি-ডাকাতি সবকিছুই করেছে। গায়ে কাজীর চাবুকের দাগ এখনো আছে। পরের খাসী চুরি করে খেয়ে ফেলেছিল, ধরাও পড়েছিল। তাকে এনে নিজের অধীনে নায়েকের কাজ দিয়েছিল বারবক। এখন মৈনুদ্দীন পাঁচশো নায়েকের সর্দার, বারবকের বন্ধু। এক সময়ে বারবক ভাবত, মৈনুদ্দীনকে নিয়ে সে ডাকাতদল তৈরী করবে। এই খোজা বান্দার জীবন সে কাটাতে চায় নি। আজো চায় না।

কে দিয়েছিল তাকে এই অতৃপ্তি? যে অতৃপ্তি তাকে এই রাত্রে টেনে নিয়ে এসেছে, এই রাত্রে, এই মুহূর্তে শাহীমঞ্জিলের উত্তর অংশে, যেখান থেকে পশ্চিমে বাঁক নিয়ে, আবার উত্তরে ঘুরে গিয়েছে ইমারত সুলতানের সুখ-বিশ্রামের মহলে।

বারবক চমকে উঠল, গায়ে জল লাগছে তার। বৃষ্টি জোরে এসেছে। বিদ্যুৎচমকেও চারদিক এখন ঝাপসা দেখাচ্ছে। সে পশ্চিমে এগিয়ে চলল। 'মৈনুদ্দীনকে হয়তো এরা মেরে ফেলবে।' মনে মনে আবার বলল। তবু এগিয়ে চলতে লাগল। কারণ, তার কানে তখন আর একটি কথাও বেজে চলেছে, 'সময় নেই, আর সময় নেই।'

বুকের কাছে সে হাত দিল। ইফ্‌তিয়ারের রক্তের ফোঁটায় এখনো ভেজা। কিন্তু এই অন্ধকারে রক্ত স্পর্শ করে তার কোন বিকার হল না। নাকের কাছে হাত নিয়ে এল। রক্তের গন্ধ নেই, মদের গন্ধ তার নাকে। ইফ্‌তিয়ারের রক্তে কোন গন্ধ নেই। কারুর রক্তেই গন্ধ নেই। কিন্তু পা এমন আটকে যাচ্ছে কেন? সত্যি নেশা হয়েছে নাকি? চলতে কষ্ট হচ্ছে কেন? শরীর যেন বড় বেশী ভারী বোধ হচ্ছে। নিয়তিই কি তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে না? ইসমাইল গাজীর ভবিষ্যৎবাণী, দরবেশের মুখ দিয়ে যা উচ্চারিত হয়েছে, তাই কি টেনে নিয়ে যাচ্ছে না? তাবত সংসারের বাসনা-ই কি তাকে দু হাত দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না?

সহসা বজ্রমুষ্টিতে সে তলোয়ারের হাতল চেপে ধরে, চাপাগলায় গর্জন করে উঠল, 'কে?'

অন্ধকারে নায়েকেরা থাকা সত্ত্বেও, একটি মূর্তিকে সে অলিন্দের মাঝখানে, তার মুখোমুখি দেখতে পেল। একজন নায়েকের গলা শোনা গেল, 'বাঁদী জন্নত বুড়ি।'

বারবক দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সে ক্রুদ্ধ নিচুগলায় বলে উঠল, 'সরে যাও আমার সামনে থেকে।'

জন্নতের ভাঙা ভাঙা বুড়ি গলা শোনা গেল, 'শেয়াল ডাকছিল। রাত আর

কতটুকু আছে ?'

বারবক তেমনি গলাতেই বলল, 'আমার পথের থেকে সরে যাও বুড়ি।'

জন্নত সরে গেল একপাশে। আবার বলল, 'পথ খোলাই আছে।'

বারবক তবু দাঁড়িয়ে রইল। পশ্চিম অলিন্দ যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে একটি আলো রয়েছে। বারবকের মনে হচ্ছে তার পা দুটি কেউ ধরে রয়েছে, সে নড়তে পারছে না। যেন দাঁতে দাঁত চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে সে পা টেনে তুলতে চাইছে।

—এখনো অনেক কাজ বাকী।

জন্নতের গলা আবার শোনা গেল। বারবক ডেকে উঠল, 'হিদ্‌না সরাব।'

হিদ্‌না সরাবের পাত্র এগিয়ে দিল। পাত্র উপুড় করে গলায় ঢালতে ঢালতে হঠাৎ তার দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠল, ঝিলিক হেনে গেল। আচমকা নিজের হাতেই পাত্র সরিয়ে নিতে গিয়ে, গলা দিয়ে সুরা বেয়ে পড়ল। কিন্তু তাতে কিছু মনেই হল না তার। সে বলে উঠল, 'হিদনা, ওই আলোটা নিভিয়ে দিতে বল্‌।'

তৎক্ষণাৎ হিদ্‌না, ছুটে গেল। একটু পরেই আলো নিভে গেল। যে মুহূর্তে আলো নিভে গেল বারবক হাত থেকে মদের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দ্রুত এগিয়ে গেল। অলিন্দের বাঁক পেরিয়েই দরজা। দরবারী অংশ শেষ। দরজা দিয়ে সরু একটি গলি চলে গিয়েছে। গলির শেষেই সুলতানের বিরামমহল। সেখানে আলো জ্বলছিল। বারবকের চোখ তখন জ্বলছিল। কিন্তু আলো দেখেই সে আবার হুকুম করলে, 'আলো নিভিয়ে দাও।'

তার পথে যে কটি আলো পড়ল, সবগুলিই একে একে নিবিয়ে দেওয়া হল। প্রত্যেক কোণে কোণে খোজা প্রহরীরা পাথরের মূর্তির মতো খোলা তলোয়ার আর বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বারবক হারেমে প্রবেশের মুখে, একবার নিচু গোঙানো স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সুলতান কোথায় ?'

—শাবেরামহলে।

শাবেরা বেগমের মহলে ফতেশা। জালালুদ্দীন ফতে শাহ্‌। শুক্লাসপ্তমীর রাত, কিন্তু মেঘ বৃষ্টি ঝড় ও অন্ধকারের রাত। শাহ ই-আলম, খলীফৎ আল্লাহ্‌ জিল আল্লাহ্‌ ফি-অল্‌-আলামিন··· ।

এখনো অনেক বেগম জেগে রয়েছে। এখনো রবাব আর দিলরুবা বাজছে, এখনো সংগীত চলেছে কোন কোন মহলে, আর সোনার পাত্রে সুরা ঢালাঢালি। হাসাহাসি, হুল্লোড়, আর মেয়েদের নিজেদের মধ্যেই বিচিত্রবিহারের আয়োজন চলেছে।

শাবেরামহল। হিদ্‌না গিয়ে আগেই আলো নিভিয়ে দিল ঢোকবার দরজায়। শাবেরা মহল স্তব্ধ, সেখানে এখন আর কোন সংগীত ও হাসি নেই। খোজা আগেই ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠল, 'সুলতান ঘুমোচ্ছে।'

বারবক কোন জবাব দিল না, মনে মনে বলল, 'নিয়তি তাকে ঘুম পাড়িয়েছে আজ।'

সে একবার থমকে দাঁড়াল। খোজা-প্রহরীটি যেন নিশ্বাস বন্ধ করে, বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বারবক তাকে বলল, 'আমার আগে আগে চল, সব আলো নিভিয়ে দাও।'

খোজা-প্রহরী মহলের মধ্যে ঢুকে উঠোনের সব কয়টি আলো নিভিয়ে দিল। বারবক ঢুকল। বলল, 'যাও, দরজায় গিয়ে দাঁড়াও।'

প্রহরী সরে যেতেই বারবক দালানে ঢুকল। দালান অন্ধকার, শাবেরা বেগমের সহচারিণীরা সেখানে কেউ নেই। ভিতরে আর একটি দালান, সেখানে আলো রয়েছে। বারবক ভিতর-দালানে ঢুকল। দুটি সহচারিণী বাঁদী একটি ঘররে দরজার দুপাশে দাঁড়িয়েছিল। বারবকের দিকে তারা চোখ তুলে তাকিয়ে আতঙ্কে কেঁপে উঠল। যেন সামনে ভূত দেখেছে। অথচ বারবকের আসায় কোন বাধা নেই। এসেই থাকে। বাঁদীরা তাকে চেনেও। তবু অমন ভয়ে চমকে উঠছে কেন?

তারা ভয় পেয়েছে বারবকের চেহারা দেখে। বারবকের ভাবলেশহীন মুখ, কিন্তু নিষ্পলক চোখদুটি যেন দুই খণ্ড অঙ্গারের মতো ধক্‌ধক্‌ করছে। বারবকের রক্তাভ মুখও যেন আগুনের মতো দপ্‌দপ্‌ করছে। সে জানে, তার আজকের চেহারা দেখে ওরা ভয় পাচ্ছে। কোন কথা না বলে সে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার কোন পাল্লা নেই। ঢোকবার মুখে দুদিকে উঁচু দেয়াল ঘরের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। বাইরের থেকে কিছুই চোখে পড়ে না। ভিতরে আলোর আভাস দেখতে পেল সে।

নিচু গোঙানো স্বরে সে বাঁদীদের বলল, 'বাইরে যাও।'

বাঁদীরা জানে, খাওয়াজা-সেরার হাতেই শাহীমঞ্জিলের সব চাবি। সব জায়গায় তার অবাধ গতিবিধি। কিন্তু সুলতানের শয়নঘরে নয়, সেখানে বেগমের সঙ্গে সে শায়িত। বাঁদীরা নিজ নিজ বেগমের হুকুমই মাত্র তামিল করে, খোজা-প্রধানের

নয়। তবু তারা ভয়ে কোন কথা বলতে পারল না। বাইরে চলে গেল দ্রুতপায়ে। বারবক ভিতরে ঢুকল।

আজ ঠাণ্ডার দিন, বাতাসের প্রয়োজন ছিল না। তাই কেউ পাখা দোলাচ্ছিল না। ফতেশা পালঙ্কে শুয়ে রয়েছে, নিদ্রিত। তার গায়ে সামান্য ঢাকা। শাবেরা বেগমও ঘুমিয়ে পড়েছে। সে নগ্ন, তার গায়ের ওপর ফতেশার পা। কিন্তু বাইরে কি বৃষ্টি থেমে গিয়েছে? আর কি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে না, বাজ পড়ছে না? এমন ভয়ংকর নিঃশব্দ মনে হচ্ছে কেন সব কিছু? ···আর সময় নেই। ইসমাইল গাজীর বাণী, ফতেশা খুন হবে, তার বান্দার হাতে, যে বান্দা খোজা, আর সুলতান হবে সেই খোজা!···

বারবক ফতেশার মুখের দিকে তাকিয়ে তলোয়ার খুলে ফেলল খাপ থেকে। ইকরার খানের তলোয়ার, ফতেশার উপহার। নিয়তির বিধান! আর আমি নিয়তির হাতের একটি পুতুল মাত্র।···দুহাতে তলোয়ারের হাতল শক্ত করে ধরে, উঁচুতে তুলে ধরল সে। যেমন করে মাটির বুকে শাবল মারে, সেইভাবে। প্রৌঢ় ফতেশা বিচক্ষণ সুলতান, শত্রুর পরম ভীতি! এখন সুখে ও নিশ্চিন্তে, নগ্ন যুবতীর ওপর দেহ এলিয়ে নিদ্রিত। নসীরা এমনি করেই একদিন হয়তো শামসুদ্দিন আহমেদ শাকে মেরেছিল। সুলতানশাহী! রক্ত ছাড়া তার বনিয়াদের ভিত গাঁথা যায় না।

আর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখতে পারল না বারবক। তার মুখ ফুলে উঠেছে, বুক প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। দেহের সমস্ত শক্তি এক করে, ফতেশার বুকে তলোয়ার বিদ্ধ করল, আর মুহূর্তে টের পেল, ফতেশার পিঠ অতিক্রম করে তলোয়ার পালঙ্কের শয্যা বিদ্ধ করেছে। একটা চীৎকারের আশা করেছিল বারবক। কিন্তু একটি অস্পষ্ট শব্দ ছাড়া কোন শব্দই হল না। কেবল ফতেশার চোখ দুটি খুলে গেল, এবং উদ্দীপ্ত চোখের দৃষ্টি বারবকের দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হল। মুখ হাঁ হল, জিভ নড়ে উঠল, তবু কোন কথা, কোন শব্দই উচ্চারিত হল না। রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠল, ছিটকে উঠল অনেক উঁচুতে, বারবকের মুখে, বুকে। ছিটকে পড়ল শাবেরা বেগমের গায়ে। কিন্তু আশ্চর্য, শাবেরা বেগমের ঘুম ভাঙল না। সুরার নেশা ও সুখভোগের ক্লান্ত ঘুম তার এখনো গাঢ়। সজোরে তলোয়ার বিদ্ধ হবার সময়, পালঙ্ক কেঁপে উঠেছিল। শাবেরার ঘুমন্ত চেতনায় হয়তো মনে হয়েছিল, সুলতান পাশ ফিরছে। যে রেশমী বস্ত্রখণ্ডটি ফতেশার কোমরে জড়িয়ে লজ্জানিবারণ করছিল, বুক থেকে রক্ত বেয়ে সেটি ভিজে উঠল। আর শাবেরার

কোমরের ওপরে রাখা তার পা আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ল। একটি হাত আপনা থেকেই উঠল, আবার পড়ে গেল শাবেরার ঘাড়ের কাছে। হয়তো অনেক—অনেকদিন পর শাবেরা পুরুষের স্পর্শ পেয়েছিল আজ। তাই সে আজ সুখী। তার গাঢ় ঘুমও সুখের।

বারবক তার মুখটা নামিয়ে নিয়ে এল তলোয়ারের হাতলে মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওপর। দেখল ফতেশার চোখ আধবোজা হয়ে রয়েছে। মুখ বুজে গিয়েছে, কিন্তু দাঁত দেখা যাচ্ছে, এবং দাঁতের ফাঁক চুঁইয়ে রক্ত উঠে এসেছে। ঠোঁটের কষ বেয়ে, রাঙানো দাড়িতে একটু একটু লাগছে। হয়তো আচমকা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতেই, গলনালী দিয়ে রক্ত উঠে এসেছে। বারবক ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছ। তুমি দেখতে পেয়েছ। আমি বারবক।'

বারবক তলোয়ার খোলবার জন্যে টান দিতে, ফতেশার দেহ খানিকটা উঠে এল। তলোয়ার অনেক নিচে পর্যন্ত বিঁধে গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য তলোয়ার টান দিতেই একটি অস্ফুট শব্দ বেরুল আবার ফতেশার গলা দিয়ে। খুব আস্তে, যেন লাগছে তাই আঃ বলে শব্দ করল।

এই সময়ে শাবেরা নড়ে উঠল। যে রক্ত ছিটকে লেগেছিল তার মুখে, নগ্ন কাঁধে বুকে, তা সহসা ঠান্ডা লাগায় এবং হয়তো চুলকে ওঠায় ঘুমন্ত অবস্থাতেই আঙুল দিয়ে মুখে ও বুকে ঘষে দিল। ঘষে হাত সরিয়ে, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গিয়েও, তার ঘুমন্ত চেতনা যেন চমকে উঠল। আঙুলে আঙুলে ঘষতে ঘষতে, চটচটে অনুভূত হওয়ায় হঠাৎ তার চোখের পাতা খুলে গেল। প্রথমেই তার দৃষ্টি পড়ল নিজের আঙুলের ওপর এবং রক্ত দেখে শিউরে উঠল। চকিতে নড়ে উঠে সুলতানের দিকে তাকাতেই, তলোয়ারবিদ্ধ রক্তাক্ত বুক তার চোখে পড়ল। লাফ দিয়ে উঠে বসে প্রথমেই দেখল বারবককে। মুহূর্তে ফতেশার গায়ের রেশমী কাপড়ের টুকরোটি নিয়েই নিজের কোমরে ঢাকা দিয়ে, পালঙ্ক থেকে নেমে গেল।

বারবক তার দিকেই তাকিয়েছিল। শাবেরা পিছু হটে, হঠাৎ বাইরে ছুট দিল, আর উঠোন থেকে তার তীব্র আতঙ্কিত উন্মাদিনী চীৎকার শোনা গেল, 'সুলতানকে খুন করেছে!'

বারবক ঘরের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে উচ্চারণ করল, 'সুলতানকে খুন করেছে।'...

সে দু হাত দিয়ে জোরে টেনে তলোয়ার তুলে নিল। ফতেশার শরীরটা সেই টানে অনেকখানি উঠে আবার পড়ে গেল। ক্ষতস্থান থেকে অনেকখানি রক্ত আবার উপচে পড়ল। বিছানার মখমলের মতো মসৃণ চাদরটা তুলে ফতেশার গায়ে ঢাকা দিয়ে দিল বারবক। বলল, 'ইসমাইল গাজীর ভবিষ্যৎবাণী নিয়তির বিধান… ।'

বারবক বেরিবে এল। দালান পার হয়ে, অন্ধকার উঠোনে দাঁড়িয়ে সে ডাকল, 'হিদনা।'

—হুকুম দিন।

—শাবেরা বেগম কোথায় গেল ?

—কোন ঘরে গিয়ে লুকিয়েছে।

—আর সব ঠিক আছে ?

—আছে।

—দীদারহোসেন কোথায় ?

—খাজাঞ্চিখানার কাছে তাকে থাকতে বলেছিলেন। সেখানে এয়াজুদ্দীন খাঁর ওপরে তাকে নজর রাখতে বলেছিলেন।

বারবক এক মুহূর্তে চুপ করে রইল। তারপরে বলল, 'একজন খোজাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দে, তাকে বলতে বল: ফতেশা খুন হয়েছে। এয়াজুদ্দীন আর তার সঙ্গী যে দুজন শাহীমঞ্জিলের মধ্যে আছে, তাদের তিনজনকেই যেন… ।'

কথা শেষ করল না বারবক। হিদনা বলল, 'এখুনি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি —আপনার কাছেই এখন সবাই আসতে চাইবে।'

বারবক যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে। বলল 'না, আমার কাছে সবাই পরে আসবে। তুই খালি সবাইকে সংবাদ দিয়ে দে। কেউ যেন বাইরে না যায়, নিজেদের লোক ছাড়া যেন কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে। দীদারহোসেন হাবশী এয়াজুদ্দীন আর তার দুই সঙ্গীকে…কিন্তু না কাটা মুণ্ডু যেন আমার কাছে না আসে। দীদারকে তুই খালি বলে দে, যে পাঁচজনকে সে খতম করতে চেয়েছিল, ভোররাত্রের আগেই যেন… । সবাই যেন আমার জন্যে দরবারঘরের বাইরে অপেক্ষা করে। তুই তাড়াতাড়ি চলে আসিস।'

হিদনা বলল, 'কোথায় ? এখানে ?'

—না, ফতেশার খাস বেগমের মহলে। আমি সেখানে যাচ্ছি।

—যো হুকুম।

হিদনা চলে গেল। বারবক দাঁড়িয়ে রইল তখনো। শাবেরা বেগমের মহলের দরজায় খোজা প্রহরীটি চোখের পাতা নামিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। মহলের বাইরের একটি আলোয় তাকে দেখা যাচ্ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে বারবকের গায়ে। কিন্তু তার অনুভূত হচ্ছে না। যদিও থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রপাত হচ্ছে না। নাম-না-জানা একটি ইরানী ফুলের গাছ শাবেরা বেগমের পাঁচিলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। অন্ধকার যেহেতু ঈষৎ পাতলা হয়েছে, সেইহেতু ফেজ-মাথায়-দেওয়া লম্বা একটি মানুষের মতো গাছটিকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। বিবিমহলে বাতাস ঢোকে না, ঢুকলে বেরুতে ছটফট করে মরে। সেইরকম এক ঝলক বাতাস আবর্তিত হচ্ছে।

বারবক ফিস্‌ফিস্ শব্দে বলল, 'দুনিয়াটা তা হলে থেমে নেই। সুলতানশাহী।...রুবা, রুবা।'

খোজা ছুটে এল, বলল, 'হুকুম করুন জাহাঁপনা।'

খোজাটির নাম রুবা, সে হাবশী। কালো পাথরের শরীর। তার কাঁধে হাত রাখল বারবক। রুবার শরীরটা শিউরে উঠল একবার। বারবক বলল, 'বেগম-মহল, গোটা হারেমটা, যেন ঠাণ্ডা গারদঘরের মতো চুপচাপ হয়ে গেছে। বিবিরা কি সব মরে গেছে?'

রুবা জবাব দিল, 'না জাহাঁপনা, সবাই ভয়ে চুপ করে আছে।'

—ভয়ে? ওদের ভয় কেন! মেয়েদের কেউ মারে না, মারতে নেই।

রুবা কোন কথা বলল না। স্তব্ধ হারেমের কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। সব হাসি, মাতলামি, প্রলাপ, গান-বাজনা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য রাত্রিও অনেক হয়েছে। মধ্যপ্রহর অতিক্রান্ত। শেষযামিনীর দিকে তার গতি। অন্যান্য দিন এ সময়ে আস্তে আস্তে হারেম স্বাভাবিকভাবেই নীরব হয়ে আসে। যদিও কোন না কোন মহলে দিনের আলো পর্যন্ত কিছু সাড়া-শব্দ থাকেই। সন্ধ্যা থেকে সকাল, হারেম কখনোই একেবারে নিঝুম হয়ে যায় না। হারেমের হাসি-গান, আরো নানান লীলা, বহুপ্রকারের গালগল্প, মদ্যপান, বিকার-বিকৃতির বিচিত্র চক্র। হারেম দিনে ঘুমায় রাতে জাগে। হারেম দিনে অন্ধকার। রাতে আলোকিত। রাতে এখানে শতাধিক ফুল ফোটে, ফুলের বাগান খোজারা পাহারা দেয়। একজন মাত্র সেই ফুল চয়ন করে। চয়নকর্তা সুলতান। তার চয়নের

ক্ষমতা সীমিত। অধিকাংশ ফুলই ফোটে, শুকায় এবং ঝরে। সেজন্যেই রুবাবে শুধু বেদনার সুরই ধ্বনিত হয়, গজলে কেবল দীর্ঘশ্বাস বহে। এই প্রমোদ ও ভোগভবনেই অশ্রু বেশী।

রুবার কাঁধে হাত রেখেই এগিয়ে চলল বারবক। বলল, 'রুবা, তুই খোজা। আমার আঙুলে যদিও মান্দারনের জিম্মি সাধুনীর আংটি আছে, তবু আমিও খোজা।'

রুবা বলল, 'আপনি সুলতান।'

—তুই প্রথম বললি।

—আপনি শাহ-ই-আলম।

—তুই প্রথম বললি। এই নে, এই তলোয়ার, তুই আমার শিলাহ্দার।

রুবা তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করে, হাত কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন করল বারবককে। বলল, 'আপনার দয়া, আমার জন্ম সার্থক।'

সে বারবকের হাত থেকে তলোয়ার গ্রহণ করল। ফতে শার রক্ত এখনো যে তলোয়ারে লেগে আছে। ফতে শার দেওয়া, ইকরার খানের তলোয়ার। শিলাহ্-দার সে, যে সুলতানের তরবারি বহন করে। হাবশী রুবা এইমাত্র সেই পদ পেল। বারবক তার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল। রুবা রাজকীয় ভঙ্গিতে বারবকের আগে আগে চলল। সুলতানের সঙ্গে শিলাহ্দার চলেছে। যদিও হারেমে শিলাহদারের কোন প্রয়োজন নেই, এবং সে কখনোই বাদশাহের সঙ্গে হারেমে প্রবেশ করে না। এখন নিতান্ত ঘটনাচক্রেই এটা হল, কারণ এই মুহূর্তেই রুবা হারেমের মধ্যেই এই পদ পেয়েছে।

বারবক জমিলা বেগমের মহলে ঢুকল। সেখানে ফিসফিস গুঞ্জন হচ্ছিল। বারবক প্রবেশমাত্র সব স্তব্ধ হয়ে গেল। যে যেখানে ছিল সে সেখানেই রইল। আজ এখন জমিলার চোখে নেশার ঘোর নেই, প্রলাপ নেই, উন্মাদনা নেই। বার-বকের প্রতি নিবদ্ধ তার চোখ যেন মৃত মাছের মতো। সে ভয় পেয়েছে। সকলেই ভয় পেয়েছে, সকলের চোখেই আতঙ্ক, সকলেই রুদ্ধশ্বাস। জমিলার সামনে গিয়ে বারবক দাঁড়াতেই, সে তাড়াতাড়ি উঠে, মাথা নিচু করে অভিবাদন করল। যেমন করে সুলতানকে করা হয়।

এই জমিলার বিকারচক্রের যন্ত্র বারবক। আজ সসম্মানে অভিবাদন করছে। বারবক তার চিবুকে হাত দিয়ে, মুখ তুলে ধরল। জমিলার চোখে আতঙ্ক। বাঁদী এবং সহচরীরা কাঠের পুতুলের মতো নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

দীর্ঘদেহ বাররককে অনেকখানি নিচু হতে হল জমিলার মুখের সামনে মুখ আনবার জন্যে। বলল, ভয় পেয়েছ ?'

জমিলা কথা বলতে পারল না। চোখের পাতা শুধু কাঁপল। বাররক একটু হাসল, বলল, 'নারী অবধ্য জান না ? আমি তোমার সেই লোকই আছি। আমি হারেমের সেই বাররকই আছি সবাইকে বলে দিও। শাবেরা কোথায় ?

জমিলার চোখে যেন আস্তে আস্তে বিশ্বাস ফিরে এল। বলল, 'ভয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে।'

—সবাইকে বলে দাও, কোন ভয় নেই। আমি সকলের সব আনন্দের ব্যবস্থা করব। কিন্তু—কিন্তু তুমি অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছ কেন ? কী আছে আমার মুখে ?

জমিলা প্রায় চুপিচুপিস্বরে উচ্চারণ করল, 'রক্ত।'

—ফতেশার।

বাররক বলল এবং মুখের ওপর দু হাত দিয়ে ঘষল। বলল, 'মুছিয়ে দেবে ?

বলে সে বসবার জায়গা খুঁজল। একজন বাঁদী তাড়াতাড়ি একটা কুর্শি এনে দিল। বাররক বসল।

জমিলা তৎক্ষণাৎ নিজের হাতে সুগন্ধি রেশমী রুমাল নিয়ে এসে, ঘষে ঘষে মুখের রক্ত মুছিয়ে দিল। মুখের, গলার, হাতের রক্ত ঘষে ঘষে তুলে দিল। তারপরে বলল, 'জমাদারকে ডেকে পোশাকটা বদলান।'

জমাদার, সুলতানের পোশাক-পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধায়ক। বাররক বলল, 'বদলাব, একটু পরেই বদলাব।'

তারপর যেন সহসা তার কোন কথা মনে পড়ে গিয়েছে, এমনিভাবে চমকে উঠে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। বলতে বলতে গেল, 'দেরি হয়ে গেছে দেরি হয়ে গেছে।'

হারেম যেখান থেকে শুরু, সেইদিকে সে দ্রুত চলতে আরম্ভ করল। রুবাও চলেছে। অন্যান্য খোজারা রুবার দিকে তাকাচ্ছিল, সম্ভবত ঈর্ষাবোধ করছিল।

বাররক এসে দাঁড়াল খাসবেগমের মহলের দরজায়। ফতেশার খাসবেগম, বিবাহিত বিবি, যার সন্তান ফতেশার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। খাসবেগমের মহল অনেক বড়। সুলতানের সঙ্গে সময় কাটাবার আর সংসার চালাবার আলাদা ব্যবস্থা এই মহলে। খাস বেগমকে জামানি বেগম বলেই সবাই জানে।

দরজায় খোজাকে জিজ্ঞেস করল বাররক, 'বেগম কোথায় ?'

—অন্দরেই আছেন।

খোজা সসম্মানে জবাব দিল। বারবক ভিতরে ঢুকল। সেখানে থামের ও দেয়ালের আড়ালে অন্তরালে অনেকগুলি ছায়া এদিকে ওদিকে সরে পড়ল নিঃশব্দে। ভীত ত্রস্ত বাঁদীদেরই ছায়া ওগুলো। বারবক উঠোন পেরিয়ে, দালানের মধ্যে ঢুকল। দেখল, বহির্দালানে বাঁদী ও সহচরীরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বারবক জিজ্ঞেস করল, 'বেগম কোথায় ?'

একজন বলল, 'ভিতরে আছেন।'

—ছেলে ?

—বেগমের কাছে।

বারবক পা বাড়াতেই, সকলে পথ করে দিল। খাসবেগমের ঘরের দরজায় গিয়ে সে দাঁড়াল। দেখল, খাসবেগম ছেলেকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। ফতেশার ছেলে, দু বছর বয়স। সুলতানের বংশধর। উত্তরাধিকার। বারবককে দেখা মাত্র জামানি বেগম উঠে দাঁড়াল। অভিবাদনের জন্যে নয়, ভয়ে। ছেলেটি জেগেছিল। সুন্দর কচি নিটোল, ফর্সা কপালের ওপর চুলের একটি গুচ্ছ পড়ে রয়েছে। রক্তাভ ফুলো ফুলো ঠোঁট দুটির ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। গায়ে মসলিনের একটি হাঁটু ঢাকা পিরান। গলায় সোনা দিয়ে মোতি বাঁধানো হার। হাতে পায়ে মেহেদীর রঙ। ইরানী মায়ের মতো দেখতে হয়েছে ছেলেকে। খাসবেগমেরও বয়স হয়েছে। সম্ভবতঃ চল্লিশের কাছাকাছি। সামনেই সোনার পাত্রে সুরা পড়ে আছে। খাওয়া হয়নি শেষটুকু। সোনার বাটায় সুগন্ধি পান। রুপোর পিকদানি।

সুলতান এই মহলে আসবেন না, এ খবর আগে জানা ছিল বলেই, কোন মদের পাত্র নিয়ে বসেছিল। ফতেশা বিবিদের মদ খাওয়া পছন্দ করতেন না। নিজেও যে খুব পছন্দ করতেন, তা নয়। বয়স্যদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে অল্পসল্প পান করতেন। একটু আধটু ভাঙ্ পছন্দ করতেন। কখনো বা হেকিম-বদ্যিদের তৈরি করে দেওয়া হীরক আর স্বর্ণ চূর্ণ দিয়ে, বিশেষ কোন উত্তেজক দাওয়াই। যে-দাওয়াইয়ের উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য এক, ক্ষমতার অধিক নারী ভোগ। ফতেশা একটু বেশী বয়সেই সুলতান হয়েছেন। তাঁর আগে যে সুলতান ছিল, সে ছিল তাঁর ভাইপো। তিনি খুল্লতাত। অথচ ভোগের বাসনা কিছুমাত্র কম ছিল না। কোন সুলতানেরই থাকে না। রাজসিংহাসন যদি ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ নজীর, হারেম তবে সেই ক্ষমতার মদ। সুলতান তা গন্ডুষে গন্ডুষে পান করেন। সিংহাসন যেমন চাই, হারেমও তেমনি চাই। আর হারেম রাখতে গেলেই, সুরা, ভাঙ্, নানা-

রকমের দাওয়াই চাই। কেবল চোখের নেশায় তৃষ্ণা মেটে না। রক্তে তৃষ্ণা জাগে, কিন্তু পান করবার ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। হারেমের আরো মজা, তাতেও যদি সুলতানের রক্ত না জাগে, তখন বিবির নাক কেটে রক্ত বের করে তার দেখতে ইচ্ছা করে। আগুনের ছ্যাঁকা দিতে ইচ্ছা করে কোমল অঙ্গে। সুলতানের কোন দোষ নেই।

বারবক তার রক্তাভ চোখে তাকিয়েছিল দুই বছরের শিশু শাহজাদার দিকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, খানিকক্ষণ দেখে, পায়ে পায়ে সে কাছে এগিয়ে গেল। বেগমের সর্বাঙ্গ শক্ত। দু হাত দিয়ে আরো ভাল করে জড়িয়ে আঁকড়ে ধরল সন্তানকে। মুখ কার্পাসের মতো শাদা হয়ে গিয়েছে। নিশ্বাস যেন বন্ধ, কেবল প্রথম রাত্রে খাওয়া পানের লাল ছোপধরা শুকনো ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। সুরার আবেশ সামান্য মাত্রও আর নেই। কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না।

বারবক বলল, 'এত রাত্রে ও জেগে রয়েছে। ঘুমোয় নি ?'

বেগম জবাব দিল না। পিছনে সরতে চাইল, কিন্তু পালঙ্কের বাধা। বারবক হাত তুলল, শিশুর কপাল স্পর্শ করল। বেগম তখন কাঁপছে থর্‌থর্‌ করে। বারবক শিশুর গলায় তার প্রকাণ্ড হাতটা স্পর্শ করল, মোতির হারটা দু একবার নাড়াচাড়া করল। শিশুটি তার দিকেই অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। বারবক তার ফুলো গালে একটি আঙুল দিয়ে একটু টিপল। গালের সেখানটা লাল হয়ে উঠল। তারপর দু-হাত বাড়িয়ে দিতে, বেগমের কম্পিত হাত শিথিল হয়ে গেল। ছেলে যেন পিছলে পড়ে গেল তার হাত থেকে। শিশুকে বারবক নিজের হাতে তুলে নিল, বুকের ওপরে নিল। মুখের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'এই বয়সে আমি কোথায় ছিলাম ? তুই জানিস শাহজাদা ?'

জামানি বেগমের দুই চোখ উদ্দীপ্ত। কিন্তু শিশুর দিকে তাকাবার সাহস নেই। সমস্ত শক্তিকে দাঁতে দাঁতে টিপে সে শুধু শিশুর মৃত্যু চিৎকার শোনবার অপেক্ষায় আছে।

শিশুটি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। বারবক হঠাৎ তার গালে চুমা খেল, এবং বেগমের বুকের ওপর ফিরিয়ে দিল। বলল, 'আপনি শাহীমঞ্জিলে থাকতে চান, না বাইরের কোন শাহীইমারতে থাকতে চান ? আপনার যা ইচ্ছে, তাই হবে।'

খাসবেগম বিস্মিত সন্দেহে তাকল বারবকের দিকে। তার ফ্যাকাশে মৃত মুখে হঠাৎ যেন একটু রক্ত দেখা দিল। ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়া বা জামানিকে সম্মান দেখিয়ে কথা বলা, কোনটাই সে আশা করে নি! কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না।

বারবক আবার বললে, 'আপনি ইচ্ছে করলে এখানেই থাকতে পারেন। আপনি আমার খাসবেগম হিসেবেই থাকতে পারেন। যদি নিকায় রাজী থাকেন, আপত্তি নেই। সুলতানের বেগমরা আবার সুলতানেরই বেগম হয়।'

জামানি বেগম বারবকের চোখের দিকে তাকিয়েছিল, এবং একটু যেন সাহস ফিরে পেল। সে বারবকের সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে দেখল। তার চোখের তারায় যেন একটা ঝিলিক হানল। চোখের পাতায় নিবিড়তা। অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'লাভ ?'

বারবকও নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, নিজের বুক হাত পা। বলল, 'তা ঠিক, সুলতানের খাসবেগমের পরিচয় ছাড়া আর কোন লাভই হয় তো নেই। আমি খোজা।'

জামানি বেগমের দৃষ্টি চোখের কোণে। জিজ্ঞেস করল, 'হয় তো ?' তাঁর ঠোঁটের কোণেও যেন বক্রতা। এই মুহূর্তে জামানি বেগমকে দেখে, যেন বিশ্বাস করা যায় না, তার সুলতান স্বামী ফতেশা, একটু আগেই নিহত হয়েছে। আর সেই হত্যাকারী বারবক তারই সামনে দাঁড়িয়ে।

বারবক বলল, 'হ্যাঁ, হয় তো। খোজাদের মধ্যে অনেক সময় পুরুষত্ব ফিরে আসে। সে নিজেকে গোপন রাখে। খোজা জলীলের কথা আপনি জানেন, ফতেশা যখন জানতে পেরেছিল, সে পুরুষত্ব ফিরে পেয়েছে, তখনই হাতীর পায়ের তলায় ফেলে মেরে ফেলা হয়েছিল।'

বলে সে ডান হাতের মধ্যম আঙুল তুলে, মান্দারনের জিম্মি সাধুনীর দেওয়া আংটিটা দেখল। এই পাথর নাকি রক্ত জমানো, আর মাঝখানে সাদা চিহ্ন পুরুষের বীজ ধারণ করে আছে। বারবক পুরুষত্ব ফিরে পাবে! পুরুষত্ব!

জামানি বেগমের দুচোখ ভরা বিস্ময়। বলে উঠল, 'তা হলে তোমারও— আপনারও পুরুষত্ব ফিরে এসেছে, এতকাল গোপন ছিল।

আংটি থেকে চোখ না সরিয়েই, যেন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে বারবক বলল, 'না। তবে, একবার আমি সারা শরীর দিয়ে বুঝেছি; আমার আছে, ফিরে যেতে পারি। এক জিম্মি সাধুনী আমাকে দেখিয়েছে, সে যেন কী জানে। আমিও বুঝতে পারি, কী যেন আছে।'

জামানি বেগম বিস্ময়ে ও সন্দেহে চেয়ে রইল।

কিন্তু তার চোখ দুটি জ্বলে উঠল হঠাৎ। নিরপরাধ একটি চুরিকরা শিশুকে অঙ্গহানি করার কথা তার মনে পড়ছে। আর সব থেকে নিষ্ঠুর পন্থায় অধিকাংশই

মরে যেত। কোন অঙ্গই তার দেহ-চ্যুত করে বাতিল করা হয় নি। কেবল থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। সবাই জানে, একশোটা ছেলেকে খোজা করতে গেল, আটানব্বইটা মরে যায়, দুটো বাঁচে। তাতেই লাভ। পাণ্ডুয়াতে যে লোকটা খোজা তৈরি করে, গত বছর সে তিনশো ছেলেকে খোজা করেছিল। তার মধ্যে এখন বেঁচে আছে মাত্র তিনজন। বারবকও সেই বহুর মধ্যে একজন বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু সুলতানের হারেম পাহারা দেবার জন্য খোজা তৈরি হতেই থাকবে।

বারবক ফতেশার শিশুছেলের দিকে ফিরে তাকাল। বেগমের চোখে আবার আতঙ্ক ফুটে উঠল। বারবক নিচু অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'এই বাচ্চাকে খোজা করলেও, একদিন সুলতানের হুকুমবরদার হবে।'

কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার সে চোখ ফিরিয়ে নিল। পিছন ফিরে চলে যাবার উদ্যোগ করে বলল, 'আপনার মতামত জানিয়ে দেবেন।'

কিন্তু চলে গেল না। সরাবের পাত্র তুলে দিল জামানি বেগমের হাতে। কোলে শিশু, তবু হাত বাড়িয়ে পাত্র নিতে হল। বারবক চোখ তুলে মহলের অন্য অংশে তাকাতেই, সব বাঁদীরা চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন ছুটে এল। পোষাক দেখেই বোঝা গেল, সে আম্মা আয়া, শিশুর পালিকা। সে বেগমের কোল থেকে শিশুকে নিয়ে, সেখান থেকে সরে গেল।

বারবক বলল, 'বিবি বেগমরা সবাই সরাব খায়, আমি জানি। হারেমে সরাব নিষেধ। আমি সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেব। লুকিয়ে পান করবার নেই, আমার সামনেই সবাই খাবে। তবে পরিমান বেশী নয়, তা হলে বিবিরা মদ খেয়ে দিন রাত্রি বেহুঁস হয়ে থাকবে।'

জামানি বেগম সুরাপাত্র ধরে রইল, চুমুক দিল না। বারবক লক্ষ্য করলে দেখতে পেত, বেগমের চোখেই শুধু চিন্তা নয়—তার কপালের রেখায়, মুখের ভাবে, এক গভীর অন্যমনস্কতা। তার চিন্তামগ্নতার মধ্যে একটা অভিসন্ধির ছাপ। বারবক পা বাড়াল।

বেগম বলে উঠলেন, 'তু—আপনি আমাকে বাইরে থাকবারই ব্যবস্থা করবেন।,

বারবক তখন চলতে আরম্ভ করছে। দরজার কাছ থেকে তার কথা শোনা গেল, 'তাই হবে। রাত পোহালেই ছেলেকে নিয়ে আপনি চলে যাবেন, আমি সেই ব্যবস্থার হুকুম দিচ্ছি।'

বারবক হারেমের এলাকা ছেড়ে, দরবারমহলের দিকে অগ্রসর হল। রুবা আগে চলছে। কে যেন ছুটে আসছে দূর অলিন্দের ওপর দিয়ে। বারবক হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল, 'কে আসছে ?'

শাহীমঞ্জিলের দেয়ালে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হল, 'কে আসছে ? কে আসছে ?...

এই প্রাসাদে এইরকম রাত্রে কখনো কেউ এমন চীৎকার শোনেনি। বারবক নিজেও কখনো চীৎকার করে ওঠে নি। একটু কান পাতলে শোনা যেত মঞ্জিলের বাইরে পায়রাদের পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গলায় তাদের জিজ্ঞাসু বক্‌বকম্‌। তারাও চমকে উঠেছে। আর বারবক নিজে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার বুকের মধ্যে স্পন্দন বেড়ে উঠেছিল। আশ্চর্য আশ্চর্য, তার মদরক্ত চোখে যেন ভয়ের ছায়া।

মূর্তি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেখান থেকেই বলে উঠল, 'শাহ আলম্‌, আমি দীদার খান

বারবক ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে উচ্চারণ করল, 'দীদার খান! দীদার আমার বন্ধু, অনেক মদদ্‌ দিয়েছে।'...

সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল দীদার খানের কাছে। দীদার খান বলল, 'আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

—কেন ?

—সংবাদ দিতে। আমাদের সবাই শাহীমঞ্জিলে জড়ো হয়েছে!

—সংবাদ দিতে ?

বারবক কথাটা বলেই, আবার জিজ্ঞেস করল, 'মৈনুদ্দীন ফিরেছে ?'

—ফিরেছে।

—আহ্‌, আচ্ছা, আর মুন্না খাঁ ?

—ফিরেছে।

—কিন্তু দীদার, তুমি কোথায় সংবাদ দিতে যাচ্ছিলে আমাকে ? হারেমে ?

দীদার খান বলল, 'না, আমি খোজাকে দিয়ে খবর পাঠাতাম আপনাকে।'

বারবক বলল, 'আমি তাই ভাবছিলাম, তুমি কোথায় ছুটে আসছ ? আমি তো সবে এই বিরামমহল পার হয়েছি। হিদ্‌না কোথায় ?'

পিছন থেকে জবাব এল, 'এই যে আমি এখানে আছি।'

হিদ্‌না যে কখন এসেছে, সে টের পায় নি। হিদ্‌না বরাবরই এরকম পায়ে পায়ে ঘুরছে। ডাকলেই সাড়া দেয়, খুঁজে দেখতে হয় না। কিন্তু বারবকের

মুখে ক্রমেই ভাবান্তর হচ্ছে কেন ? তাকে কোনরকমেই প্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে না। তার স্বপ্নঘোরের মধ্যে একটা যে উৎকর্ণতা রয়েছে। কী শুনতে চায় সে ? তার চোখে যেন একটি সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণতা। কী খুঁজছে সে।

বারবক বলল, 'হিদ্‌না, চাবির গোছাটা কোথায় ?'

হিদ্‌না সামনে এসে তার কোমর থেকে বিরাট চাবির গোছা খুলে দিল। বারবর হাতে করে তুলে নিল। কিছুক্ষণ আগেও সে খাওয়াজা-সেরা ছিল, প্রাসাদের সকল চাবি যার কাছে থাকত। সমস্ত কক্ষের চাবি সংখ্যায় শতাধিক। লোহার সরু বেড়িতে চাবি ঝোলানো। তার আগমন-নির্গমন এই চাবির গোছার শব্দেই বরাবর শাহীমঞ্জিলের লোকেরা জানতে পারত। সে ছিল সুলতানের বিশ্বস্ত খোজা। বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত ! নসীরা বান্দা কি সে বিশ্বাস রেখেছিল। গণেশ ? তার আগেই গিয়াসুদ্দীন আজম শা ?

কিন্তু তারা কেউ খোজা ছিল না। বারবক খোজাদের নিয়ে যদি বা দল গঠন করতে পারত, তাও হবে না। কারণ, খোজারা অধিকাংশই হাবশী। হাবশীদের সঙ্গে তার অনেক মিল আছে, সে জন্য অনেকেই ভুল করে তাকে হাবশী ভাবে। তাই হাবশীরা তার বিরুদ্ধেই দল পাকাবে। সুলতান ফতেশার সঙ্গে ওদের মুখোমুখি লড়তে হল না। গৌড়ের প্রজাদের সামনে, উজীর ওমরাহ মুলুকপতিদের সামনে তারা বলতে পারবে, সুলতান হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় তারা। এবার তারা সুলতানের বিশ্বাসী বংশবদ সাজবে, সুলতান-প্রেমিক হবে। হাবশীরা এটাই চেয়েছিল। হাবশীরা দলে ভারী, অনেক শক্তিশালী। তারা বারবককে বলে, 'বাঙালী খোজা। বারবক বাঙালী।'

তার কোন দল নেই। নাসিরুদ্দীন পেরেছিল, সে পাঠানদের বিশ্বস্ত ছিল। গণেশ পেরেছিল, সীমান্তের রাজারা, হিন্দু আমীর ওমরাহ সবাই তার দলে ছিল। সৈফুদ্দীন হামজাশাহের পর শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ দুর্বল সুলতান ছিল। গণেশ ছিল তাদের আমীর। কিন্তু চতুর ! সে শিহাবুদ্দীনকে হত্যা করে, আগেই নিজে রাজা হয় নি। শিহাবুদ্দীনের ছেলে আলাউদ্দীনকে সুলতান করে সে নিজেই দেশ শাসন করেছিল। তারপর যখন বুঝেছিল, আলাউদ্দীনকে বসিয়ে রাখার আর কোন দরকার নেই, তখন তাকে শেষ করে দিয়ে নিজেই সিংহাসন দখল করেছিল।

কিন্তু মুসলমান দরবেশের নেতা নূর কুৎব্‌ আলম তাকে সহজে ছাড়ে নি। জৌনপুরের সুলতান, ইব্রাহিম শর্কীকে সে ডেকে এনেছিল, কাফের গণেশকে শায়েস্তা করবার জন্য।

ইব্রাহিম এসেছিল। আসবার পথে, মিথিলার রাজা শিব সিংহের কাছে বাধা পেয়ে, তাকেও বন্দী করেছিল। কিন্তু গণেশ আরো চতুর। তার ছেলে যদু আগেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। ইব্রাহিম আসছে শুনে, ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল।

ইব্রাহিম দেখেছিল, বাংলার সিংহাসনে আবার একজন মুসলমান বসেছে। তাই সে আক্রমণ না করে জৌনপুরে ফিরে গিয়েছিল। সেও ফিরে গিয়েছিল, গণেশও সঙ্গে সঙ্গে ছেলে জালালুদ্দীনকে সরিয়ে আবার নিজে রাজা হয়েছিল। যদিও ছেলের হাতেই তাকে মরতে হয়েছিল, তবু সে অনেকদিন রাজা ছিল। কারণ তার অনেক বড় দল ছিল।

বারবকের সেরকম দল কোথায় ? বেপরোয়া ভাগ্যান্বষী, ডাকাত দলের সর্দার, পেশাদার খুনীরা ছাড়া, তার কে আছে। হাবশীরা তার আর কেউ নয়। সে কাকে বিশ্বাস করবে ?

চাবির গোছাটা চোখের সামনে তুলে নিয়ে দেখল বারবক। আজ সন্ধ্যায় সে হিদ্‌নার হাতে তুলে দিয়েছিল চাবির বেড়ি। দরবারমহল থেকে শুরু করে হারেম, সব জায়গার চাবি এতে আছে। এক একটা গোছা আলাদা আংটায় ঝোলানো। এমনি একটা গোছা মুঠো করে ধরে সে হিদ্‌নার হাতে দিয়ে বলল, 'তখত্‌ঘরের একটা মাত্র দরজা খুলে দে।'

দরবার আর সিংহাসন ঘর আলাদা। সুলতানের বিরামমহলের এক অংশেই থাকে সিংহাসন কক্ষ। দরবারে যখন বসতে হয়, তখন সেখানের বাহকেরা সিংহাসন নিয়ে যায়।

হিদ্‌না চলে গেল। বারবক দীদারের কাঁধে হাত রাখল। বলল, 'এখন কী করা হবে দীদার।'

দীদার খান এতক্ষণ অস্বস্তি ও কিছুটা ভীত সংশয়ে চুপ করেছিল। বারবক তাকে স্পর্শ করতে সাহস ফিরে পেল। বলল, 'আপনাকে সবাই এখনই মসনদে দেখতে চাইছে। আর—।'

—আর ?

—আর দুশমনদের সবাইকে খতম করে ফেলা হয়েছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।

বারবক অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'নিশ্চিন্ত !'

তারপরে আবার বলল, 'তোমার পাঁচহাজার সিপাইকে তুমি প্রস্তুত রেখেছ ; যদি কোনরকম গোলমাল হয়, মোকাবিলা করার জন্যে তারা প্রস্তুত আছে ?'

দীদার খান বলল, নিশ্চয়ই আছে। এই 'খিট্‌টাহ্‌ গৌড়ের সমস্ত সৈন্য আপনার জন্যে প্রস্তুত আছে। আমার পাঁচহাজার, আপনার পাঁচ হাজার নায়েক, শায়দুলের দশ হাজার, সবাই, এই খিট্‌টাহ্‌ গৌড়ের সব সৈন্যই আপনার।'

খিট্‌টাহ্‌ হল দুর্গযুক্ত শহর। গৌড় দুর্গযুক্ত শহর, শাহীমঞ্জিলের অদূরেই তা বিশাল প্রাকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে লক্ষাধিক সৈন্য থাকবার ব্যবস্থা আছে। সত্তর হাজার ঘোড়া আছে, ছয় শো হাতী আছে। যদিও সৈন্যবাহিনীর বিশাল অংশ এখন রাজ্যের সীমানায় রয়েছে। কারণ, সামন্তরাজ রায়েরা বছর-খানেক ধরে উপদ্রব করেছে। হিন্দুরাজা মাত্রেই সুলতানদের কাছে রায়। রায় রাজা তারা কখনো চুপচাপ করে বসে থাকে না। বিশেষ করে, কামরূপ আর উড়িষ্যার সীমানায় অশান্তি প্রায় লেগেই থাকে। তাই গৌড়ের যে সুলতান হয়, সে-ই আগে এই দুই রাষ্ট্রের দিকে লক্ষ্য রাখে। সুযোগ পেলে আক্রমণে অগ্রসর হয়। এইসব সীমান্তে যে সব সামন্ত রায়েরা জমিদারী করে, তারা গোলমালের সুযোগ সবসময়ে খোঁজে। এক বছর ধরে তাই সীমান্তে সৈন্যরা সবসময়ে টহল দিচ্ছে।

এখন অবিশ্যি আলাদা কথা। জালালুদ্দীন ফতেশা সীমান্তের কাফের রাজাদের ভালভাবেই সামলে রেখেছে। কিন্তু হাবশী সর-ই-লস্কর সবাইকেই রাজ্যের বাইরে ফতেশা ইচ্ছে করেই পাঠিয়ে রেখেছে, যাতে তারা এখানে থেকে কোন-রকম ষড়যন্ত্র করতে পারে। সেই জন্যও অনেক সৈন্য, সর-ই লস্কর, লস্কর-ওয়াজীর, সবাইকেই বাইরে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

বারবক বলল, 'বেশ, তোমরা তখ্‌ত মহলে সামনের ঘরে অপেক্ষা কর, আমি যাচ্ছি।'

দীদার খান চলে গেল। বারবক মধ্যরাত্রে হারেমে যে পথে এসেছিল, সেই অলিন্দ ধরেই অগ্রসর হল। আকাশে মেঘ এখন আরো পাতলা হয়েছে। বাতাসের বেগ বেড়েছে। বিজলী চমক অনেক কমে এসেছে। অনেক পরে পরে দূর-আকাশে অস্পষ্ট ঝিলিক হানছে। কোন শব্দ নেই।

বারবক তখ্‌ত মহলের একটি পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকল। ভিতরে কম জোরের আলো। প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে পর পর তিনটি কক্ষ পেরিয়ে, একটি খোলা জায়গায় এসে সে দাঁড়াল। যার চারিদিকে বড় বড় থাম। প্রতি রাত্রে এই অংশে

যেমন কম আলো জবলে, তেমনি জবলছে। তখ্‌ত মহলের পিছনের অংশ এটা। সেখানে নায়েকরা পাহারায় ছিল। নায়েকরা সবাই তার দিকে তাকিয়েছিল। হয়তো এইভাবে সোজাসুজি আর কখনো বারবককে তাকিয়ে দেখা যাবে না।

হিদ্‌না একটি খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। সিংহাসনকক্ষের দরজা। বারবকের বামন সরাবদার হিদ্‌না-ই শুধু সিংহাসন কক্ষের সামনে আসতে পেরেছে, কারণ তার কাছেই সমস্ত চাবি। বাকীদের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত সিংহাসন-কক্ষে ঢুকতে পারবে না। বিরাট কক্ষ, এই কক্ষেই মসনদ, সুলতানের সিংহাসন। রাত্রে এই ঘরে সামান্য একটি আলো জবলে। সারারাত্রি বন্ধই থাকে। কেবল ভোরবেলা একবার খোলা হয়, সুলতান যখন প্রথম অভিবাদন গ্রহণ করে। সে সময়ে সুলতানের চোখ জুড়ে থাকে ঘুমের জড়িমা। হারেমে কাটানো রাত্রের রেশ, অপরিমিত ভোগের ঘোর, সরাবের মমতা নিয়ে এসেই সুলতানকে একবার এই ঘরে আসতে হয়। নায়েকরা কী অভিবাদন করে, নকীব কী হাঁকে, কিছুই শোনা হয় না। নিতান্ত শাহীমঞ্জিলের নিয়মিত দিন শুরু হতে পারে না, তাই একবার আগমন। সিংহাসনে বসবার সময়ও হয় না সুলতানের। কোনরকমে একবার, রাত্রের নায়েকদের ও খাওয়াজা-সেরার অভিবাদনের প্রত্যুত্তর করেই কর্তব্য শেষ হয়।

বারবক কক্ষে ঢুকল। বিশাল কক্ষে একটি মাত্র আলো থাকায়, সমস্ত সিংহাসন ঘরটিকে একটি রহস্যময় পরিবেশ যেন ঘিরে রয়েছে। আলোটি সেখানে জবলছে। যেখানে বেদীর ওপরে একটি স্তম্ভ রয়েছে। পাথরের বেদীর ওপরে কোন কারুকার্য নেই। কোন চিত্র নেই। থাকতে নেই, তা গুনাহ্‌। কিন্তু সিংহাসনের হাতলে, পিছনে, পা রাখবার জায়গায়, সর্বত্রই সোনা মোড়া, রত্ন দিয়ে গাঁথা। সোনার গায়ে বাঙালী শিল্পীর নানান কারুকার্য। সিংহাসনের মর্মরবেদী, দুই পাশে পাথরের স্তম্ভ, স্তম্ভের ওপরে খিলান করে, গম্বুজের ভঙ্গিতে মাথায় আচ্ছাদন করা হয়েছে। স্তম্ভ ও গম্বুজ, সর্বত্রই সোনার কাজ রয়েছে। সিংহাসনের পাদানি থেকে গালিচা নেমে এসেছে ধাপ বেয়ে, প্রধান দরওয়াজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। ধাপের নিচে ডাইনে বাঁয়ে, সীমিত সংখ্যক আসন।

বারবক আস্তে আস্তে গিয়ে সিংহাসনের বেদীর নিচে দাঁড়াল। স্বল্পালোকেও সোনা ও দামী পাথর চিকচিক করছিল। বেদীতে উঠতে গিয়ে, ধাপে পা রেখে থমকে দাঁড়াল। বেদীর মাঝখানটা, যেখানে সিংহাসন, সেখানটা অন্ধকার। স্তম্ভের একপাশে একটি বাতির আলো সেখানে পৌঁছয় নি। মাথার আচ্ছাদনের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু রত্নরাজি জবল্‌জবল্‌ করছিল। বারবক ধাপে

পা দিতেই, ফতেশার মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই মুখ, সেই শেষ মুহূর্তের বিস্মিত ভয়ার্ত দৃষ্টি। সে নিচু চাপা স্বরে বলে উঠল, 'কে ?'

কেউ নয়, সিংহাসন শূন্য। যে-ফতেশা এখানে বসত, গতকালও যে এই সিংহাসনে বসেছিল, আজ সকালেও যার বসবার কথা ছিল, সে এখন হারেমের এক ঘরে মৃত পড়ে আছে। এখানে সে নেই। বারবক ধীরে ধীরে ধাপ বেয়ে উঠল, কিন্তু যেন সিংহাসনটা অস্পষ্ট দেখছে সে। যেন অনেক দূরে, হাত দিয়ে নাগাল পাওয়া যাবে না। অনেক দূর ছুটেও না। কারণ সিংহাসন যেন পৃথিবীর মাটির বুকে গাঁথা নয়, শূন্যে ভাসছে।

মনে পড়েছে, একদিন সে লুকিয়ে গভীর রাত্রে এখানে ঢুকে সিংহাসনে বসেছিল। সে কথা কেউ জানে না। তার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, এই রত্নখচিত উচ্চাসনে বসলে কেমন লাগে, তাই দেখতে। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। এক মুহূর্তের বেশী বসতে পারেনি, যেন আগুনের ওপরে বসতে গিয়েছিল। তার গায়ে যেন আগুনের হলকা লেগেছিল। লাফ দিয়ে নেমে এসে, দূর থেকে দেখেছিল এই রত্নসিংহাসনের দিকে। এই সিংহাসন, প্রাসাদ তৈরির সময়, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্ নতুন করে গড়িয়েছিলেন। রুকনুদ্দীন বারবক শৌখীন ছিলেন, তাঁর কাছে সিংহাসন শুধু মাত্র সুলতানের উচ্চাসন ছিল না, সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা ছিল।

শুধু সুন্দর নয়, একটা গাম্ভীর্যও যেন রয়েছে, এবং সেই গাম্ভীর্যের অন্তরালে একটি ভ্রূকুটি নিষ্ঠুর কুটিল দৃষ্টিপাত করে রয়েছে। এমনকি একটি গন্ধও পাচ্ছে বারবক, যে গন্ধ সুলতানশাহীর গন্ধ। শুধু শিরাজের (ইরানের শহরের) গোলাপী আরকের গন্ধ নয়, তার মধ্যে আরো কিছু, যেন একটা দৃপ্ত অহঙ্কারের গন্ধ রয়েছে।

বারবক শুনতে পেল, কার দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। সে পিছন ফিরে দেখল। বিশাল কক্ষ শূন্য, কেউ নেই। তবে ? সে সিংহাসনের দিকে চেয়ে কান পাতল, এবং শুনতে পেল, তার নিজেরই দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। কেন, সে কি ভয় পাচ্ছে ? ভয় ? বারবক কি কাউকে ভয় পায় ?…সে হাত বাড়িয়ে নিচু হয়ে সিংহাসন স্পর্শ করল, আর সেই মুহূর্তে যেন লোহার শিকলের ঝনঝনা শুনতে পেল। কে ? সে আবার পিছন ফিরে তাকাল। অস্পষ্ট আলো-আঁধার -ঘেরা সিংহাসন ঘর। তবু যেন অনেকগুলি ছায়া সে দেখতে পাচ্ছে। কিসের ছায়া ওগুলি ? অন্ধকারে তো সবই দেখতে পায় বারবক। শ্বাপদের দৃষ্টি

আছে তার। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সে ছিল খাওয়াজাজেরা। শাহীমঞ্জিলের সমস্ত চাবি যার হাতে দিয়ে এই প্রাসাদে সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। পাঁচ হাজার নায়েকদের যে পাহারায় রেখে নিজে সারা রাত্রি অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, তার দৃষ্টি শ্বাপদের মতোই হয়। সে অন্ধকারেও সবই দেখতে পায়। কিন্তু এখন সে কী দেখছে? ওগুলি কিসের ছায়া? অনেকে ঘিরে ধরেছে নাকি তাকে? এখন সে নিরস্ত্র। ঘিরে ধরতে এলে সে বাধা দিতে পারবে না। সিংহাসন ছেড়ে সে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল।

অয় খোদা! জঘন্য! আলো অনেক দূরে বলে, নিচের আসনগুলির ছায়া সারি সারি লম্বা হয়ে পড়েছে মেঝেয়। আর সেই ছায়াগুলিকে বারবক দেখছিল, কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। 'ফতেশার রক্ত এখনো আমার জামায় লেগে আছে।' সে মনে মনে বলল। ফিরে কয়েক পা এগিয়ে সিংহাসনে গা ঠেকিয়ে সে দাঁড়াল। নিচু হয়ে হাত রাখল। বলল, 'আমার জন্যে!' কাঁটাদুয়ারের দরবেশের ভবিষ্যৎ-বাণী তার কানে বাজতে লাগল, 'ফতেশা খুন হবে এক বান্দার হাতে, যে আছে সুলতানেরই পাশে পাশে। সেই বান্দা খোজা। এক শুক্লা-সপ্তমীর রাতে, আকাশে চাঁদ দেখা যাবে না, মেঘ বৃষ্টি হবে, বাজ পড়বে, সেইদিন। আর যে সুলতানকে খুন করবে, সে-ই সুলতান হবে। সে-ই, সে-ই, সে-ই!'

—আমি বসব!

বারবক ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে উচ্চারণ করল, 'আমি বসব এই মসনদে। নিয়তির বিধান, গাজী ইসমাইলের ভবিষ্যৎবাণী···এই মসনদ আমার!'···

ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে বলতে সে সহসা চীৎকার করে উঠল, 'আমার আমার!'···

সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে উঠতেই দূর থেকে আর একটি গলার স্বর ভেসে এল। বারবক কান পাতল। শুনতে পেল, শাহীমঞ্জিলের মোল্লা, তোরণের পাশে যে মসজিদ আছে, সেখান থেকে খোদাকে ডাকছে, 'আল্লাহ্‌ আকবর···!'

হিম্মনার গলা শোনা গেল, 'খোদাবন্দ, রাত শেষ হয়ে এল।'

বারবক তাড়াতাড়ি সিংহাসনের বেদী থেকে নেমে এল। বলল, 'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি সবাইকে ডাক। মুসা খাঁ, দীদার, মৈনুদ্দীন, ইউসুফ হাসুসা (হাবশী উজীর), আবদুল, সবাইকে ডাক।'

ডাকতে হল না। সবাই দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বারবকের কথা শেষ মাত্র তারা সিংহাসন কক্ষের ভিতরে ঢুকে এল। দীদারের গলা শোনা গেল,

'আমরা সব আপনার হুকুমের অপেক্ষাতেই আছি। নায়েকেরা সব আপনাকে সেলাম করার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে।'

ইউসুফ বলে উঠল, 'আমরা আপনাকে এখনই সুলতানের মসনদে বসাতে চাই।'

—আমরা এখনই আপনাকে অভিষিক্ত করতে চাই।

—পোশাকটা বদলানো দরকার। জমাদাব কোথায় ?

আবদুল চীৎকার করে উঠল, 'কেউ তাকে ডাক, এখানেই সুলতানের পোশাক নিয়ে আসতে বল।'

জমাদার হল সুলতানের পোশাকের তত্ত্বাবধায়ক।

—শিলাহ্‌দারকে এখানে আসতে বল।

—নকীব কোথায়, তাকে এখুনি হাঁকতে হবে।

গৌড়ের সুলতানশাহীর এই নিয়ম। আমীর ওমরাহরা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে, সুলতানকে অভিষিক্ত করে তাদের অনুমোদন না থাকলে, কেউ সুলতান হতে পারে না। সেই জন্য এই অনুষ্ঠানের মূল্য অনেক। গৌড়ের অনেক সুলতানকেই আমত্য আর অভিজাতরা, সিংহাসনে বসিয়েছে অথবা ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছে। এ ঘটনা এতই বেশী ঘটে যে সাধারণ প্রজারা শুধু জানে, রাজপ্রাসাদে কী ঘটছে না ঘটছে, তাদের জানবার দরকার নেই। যে সিংহাসনে বসে ঘোষণা করবে, সে সুলতান, প্রজারা তাকেই মেনে নেবে। এ ব্যাপারে তাদের কোন হাত নেই, কোন ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহও তারা করে না।

কিন্তু, ফতেশার আসল আমীর ওমরাহ যারা আছে, অধিকাংশই যারা হাবশী, তারা কেউ আজ এখানে উপস্থিত নেই। একমাত্র ওয়াজীর হাস্‌না হাবশী ছাড়া। তুর্কী বা হিন্দু আমীর অমাত্য কেউ নেই। হিন্দু অভিজাতদের জন্য কোন চিন্তা নেই। গণেশের পরে, কোন হিন্দু অমাত্যই রাজা হতে চায় নি বা ষড়যন্ত্রের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি এখনো। কিন্তু হাবশী তুর্কী হিন্দু, সমস্ত আমীর দবীর ওমরাহরা থাকলে, বারবক নিশ্চিন্ত হতে পারতো। যারা আছে, এরা এখনো কেউ নয়। সকলেরই নতুন পদ এবং বিত্তের জন্য, তাকে সাহায্য করেছে। তারা আমীর ওমরাহের পদ পাবে।

—কিন্তু নাম ? একটা নতুন নাম না হলে, নতুন সুলতান মসনদে বসবেন কী করে।

সবাই কথা বলতে লাগল। চারিদিকে ছুটোছুটি ডাকাডাকি পড়ে গেল।

বারবক যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই সে বলে উঠল, 'কিন্তু মুকুট, মুকুট কোথায়, সেটা চাই যে !,

—হ্যাঁ, মুকুট চাই, সুলতানের শিরোভূষণ। কোথায় সেটা ?

বারবক নিজেই বলে উঠল, ফতেশার বিরামমহলে আছে, কাউকে আনতে বল। আর ঘরের দরজাগুলো সব খুলে দাও। আমার অন্ধকার লাগছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন দরজা খুলতে আরম্ভ করল। আর প্রতি দরজার কাছেই, ভীড় করে আসা নায়েকদের দেখা গেল। পাঁচ হাজার নায়েক, তারা সকলেই দরবারের চার পাশে ভিড় করেছে। এটা নিয়ম নয়। প্রথা হচ্ছে, তারা যে যার স্থানে থাকে, ভোরবেলা খাওয়াজা-সেরা তাদের হয়ে সুলতানকে একলা অভিবাদন করে। কিন্তু আজ তারা ভিড় করে এসেছে। কারণ, শাহীমঞ্জিলের সেই চারিওয়ালা আজ সুলতান হয়ে বসবে, তাদের সেই খাওয়াজা-সেরা। নায়েকরা আজ তাকেই অভিবাদন করবে।

আকাশে মেঘ আরো পাতলা হয়ে এসেছে, ভোরের আলো ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কক্ষের চারিদিকের রেশমী পর্দাগুলি বাতাসে উড়তে লাগল। বাতাস বেশ বেগে বইছে। বারবককে যারা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তারা সকলেই কৌতূহলিত চোখে তাকে দেখছিল। তাদের চোখেমুখে উত্তেজনা ছাড়াও হাসি উপচে পড়ছিল। সকলেই খুশি। বারবক ভাবল। আর সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে, তারও হাসি পেল। সে হাসতে লাগল, আর সকলের মুখের দিকে আলাদা আলাদা করে দেখতে লাগল। তারপর কাছে গিয়ে, কারুর বুকে কিংবা কাঁধে হাত দিয়ে স্পর্শ করল। যেন জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি—আমি সুলতান !' ..

—আপনি আমাদের সুলতান।

বারবক হাসতে লাগল। উচ্চারণ করল, 'সুলতান !...আচ্ছা আর সুলতানের যদি আমি ছেলে হতাম, তা হ'লে আমাকে কী বলা হত ?

—তাহলে আপনাকে শাহজাদা বলা হত।

—শাহজাদা ! শাহজাদা ! বেশ, তা হলে আমি নাম নিলাম সুলতান শাহজাদা।

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, 'সুলতান শাহজাদা।'

একজন বলল, 'শাহ সুলতান শাহজাদা বারবক অল-দুনিয়া ওয়াদ্দীন্।'

বারবক হেসে উঠল,। তার বুকটা ফুলে উঠল, আর হাসতে হাসতে এর ওর গায়ে প্রায় ঢলে পড়ল।

এই সময়ে জমাদার এল প্রায় কুড়িজন খোজার পিঠে সুলতানের পোশাক চাপিয়ে। জমাদার একবার চকিতে বারবকের দিকে তাকিয়েই নত হয়ে বলল, 'শাহ্-ই-আলম, আমি আপনার গোলাম। আপনি হুকুম করুন, কোন্ ইজার আপনাকে পরাব। কোন্ কাবাই, কোন মেজাই?'

বারবক বলল 'সব থেকে বড় যেগুলো, সেগুলোই পরাও, আমার শরীরটা ফতেশার থেকে অনেক বড়।'

জমাদার তাই খুঁজে বের করল। লাল রং-এর কাবাই, সমস্তটাই সোনার বিছের নকশা ও ছোট ছোট পাথর-বসানো। ইতিমধ্যে মুকুট এসে গেল। হাসনো একজন আমীর শ্রেণীর লোক সে-ই রাজমুকুট পরিয়ে দিল বারবকের মাথায়। মোল্লা মৌলভীর কোন দরকারই ছিল না। হিন্দুদের আঁতুড়ে যেমন কোন নিয়ম নেই, বিশ্বের কোন সুলতান- শাহীরও তেমনি কোন নিয়ম নেই। ক্ষমতা সুদৃঢ় হলেই সব রীতিনীতির আবির্ভাব।

কে একজন চীৎকার করে উঠল, 'নকীব হাঁকুক।'

নকীব হেঁকে উঠল, 'শাহ্-ই-আলম্ খলীফা আল্লাহ্ জিল্ আল্লাহ্ ফি অল আল্যামিন শাহ্ সুলতান শাহ্জাদা বারবক অল দুনিয়া ওয়াল-দীন...।'

বারবক তখন সিঁড়ি দিয়ে বেদীতে উঠছে, আর নকীবের কথাগুলি ঠোঁট নেড়ে নেড়ে নিজেই উচ্চারণ করছে,...'ওয়ালদীন্।...আমি সুলতান, নিয়তির বিধান...।'

বসবার আগে সে সামনে ফিরে তাকাল। এই বিরাম মহলের সিংহাসন ঘরে, এইভাবে কোন সুলতানের অভিষেক হয় নি। এই প্রত্যুষের আধো অন্ধকারে। তার চোখের সামনে একবার ভেসে উঠল ফতেশার মুখ, সেই শেষ ভয়ার্ত বিস্মিত দৃষ্টি, যে এখন হারেমের শাবেরা বেগমের শয্যায় রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে।

বারবকের মুখের ভিতরটা ঘুলিয়ে উঠল একটা বিশ্রী স্বাদের অনুভবে, ফতেশার থুতুর স্বাদ। তারপরেই হঠাৎ সে বাঁ দিকের উরুতে হাত দিল, হাত দিয়ে খুঁজতে লাগল সেই কাটা দাগটা। কোথায়? এই—এই যে। প্রায় দুই কড়ের মতো গভীর, দেড় হাত লম্বা ক্ষতের দাগ কোমরের কাছ থেকে জঙ্ঘার দিকে নেমে গিয়েছে।

যারা নিচে দাঁড়িয়েছিল, তার সঙ্গী অনুচরেরা, তাদের মধ্যে একজন নিচুস্বরে বলে উঠল, 'জমাদার কোথায়, জোব্বা ঠিক হয় নি।'

কিন্তু বারবক আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। জোব্বা দেখছিল না বারবক, উরুতের ক্ষত দেখছিল। কিন্তু হঠাৎ তার অন্য কথা মনে পড়ে গেল। দূরে গ্রামের

এক উঠোন থেকে কি কোন মা তার ছেলেকে ডাকছে, 'মানিক! সোনামানিক!'…

বারবক ধপ করে সিংহাসনে বসল। য়ুবা তাড়াতাড়ি বেদীর নিচে এসে দাঁড়াল, হাতে তার সেই তলোয়ার। গৌড়ের সুলতানশাহীর নিয়ম, মুক্ত কৃপাণ কোলের ওপরে রেখে সুলতান বসবে। বারবক য়ুবাকে কাছে আসতে ইশারা করল। য়ুবা পা টিপে টিপে বেদীতে উঠে এল। তার হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে দেখল বারবক। য়ুবা নেমে গেল। বারবক দেখল, তলোয়ারে এখনো রক্তের দাগ। ফতেশার রক্ত। সে কোলের ওপর, লম্বালম্বি করে রক্তাক্ত তলোয়ার রাখল। এই তলোয়ার দুমুখো অর্থাৎ দুদিকেই এর তীক্ষ্ন ধার।

নিচে সকলেই দাঁড়িয়েছিল। গৌড়ীয় সুলতানের এই নিয়ম, তার উপস্থিতিতে কেউ আসন গ্রহণ করবে না। সুলতান শাহ্-ই-আলম, পৃথিবীপতি, তার ওপরে কেউ নেই।

বারবকের মুখের দিকে, তার কোলের তলোয়ারের দিকে সবাই দেখছিল। সে হাবশী উজীর হাসনাকে ডেকে বলল, 'তোমাদের অনুমোদন নিয়েই আমি সিংহাসনে বসেছি। তোমরাই আমাকে সুলতান করেছ। তার ইনাম তোমরা পাবে। এখন তাড়াতাড়ি যা হয় তাই করা যাক। আজ রাত্রে আমরা মিলিত হব, তখন সব বিষয়ে কথাবার্তা বলা যাবে। এখুনি আর কী করা দরকার, তুমি তাই বল।'

হাসনা উত্তর দিল, 'আপনি রাত্রের নায়েকদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। কিন্তু তার আগে, কে তাদের নেতৃত্ব করবে, আপনার আগের পদে কে আসবে, সেটা অন্ততঃ এখন স্থির করুন। কেবল তাকে খোজা হতে হবে, কারণ শাহীমঞ্জিলের সবখানেই তার যাতায়াত থাকবে, হারেম পর্যন্ত।

বারবকের মনে পড়ে গেল, খোজা আবু তোরাবের কথা। সে একজন সাধারণ হাবশী খোজা, শাহীমঞ্জিলের পুরনো লোক। এই লোকটাকে বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী বলা যায় না। তবে খুবই দিলদরিয়া মেজাজের লোক। সরাব পান করতে খুব ভালবাসে। লোকজনকে নিজের খরচে খাওয়াতে ভালবাসে। মাঝে মাঝে অবিশ্যি তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সে সময়ে শহরে গিয়ে কোন পুরুষ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, কিছু সময় কাটিয়ে আসে। কিংবা নায়েকদের কারুর সঙ্গেই বন্ধুত্ব করে। এবং এই সব বন্ধুদের সে প্রচুর টাকা আর খাবার দেয়।

এ সবের থেকেও বড় কথা, বারবককে সে শুধু খাতির করে না, হাবশীরা তাকে প্রশ্রয় দিয়ে যে ফতেশাকে হত্যা করবার প্ররোচনা দিচ্ছিল, এটা সে জানতো, এবং

অনেক সময়েই, অনেক ইঙ্গিতমূলক কথা বলেছে, হাবে ভাবে অনেকবার জানিয়েছে, বারবক যদি কোনদিন শাহীমঞ্জিলে একটা কিছু ঘটাতে চায়, তবে সে তাকে সাহায্য করবে। সাহায্য সে প্রচুর করেছে। নায়েকদের প্রত্যেকের ভিতরের কথা, প্রতিদিন সে তাকে বলেছে। নায়েকদের মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে সে। এরকম লোককেই খাওয়াজা-সেরার পদ দেওয়া উচিত। সে ডাকল, 'আবু তোরাব।'

আবু তোরাব কাছেই ছিল। সে এগিয়ে এসে নত হয়ে কপালে হাত ঠেকাল। বারবক বলল, 'আজ থেকে তুমি খাওয়াজা-সেরা। আমি বিশ্বাস করি, তুমি ঠিক-মতো তোমার কাজ করতে পারবে।

আবু তোরাব বলল, 'শাহ্-ই-আলমের আমি গোলাম।'

—হিদ্না!

বারবকের ডাক শোনা মাত্র হিদ্না ছুটে এল। বারবক তাকে চাবির গোছা আবু তোরাবকে দিয়ে দিতে বলল।

আবু তোরাব জানু পেতে বসে, সুলতানকে অভিবাদন করল। তাকে বিদায় দিল বারবক। আবু তোরাব নায়েকদের নিয়ে বিদায় হল।

বারবক বলল, 'সমস্ত রাজ্যে নিশান (ঘোষণাজারি) দেওয়া হোক, ফতেশা আমার হাতে খুন হয়েছে, আমি নিজেকে সুলতান বলে দাবী করছি। জহান খাঁ আর অন্যান্য আমীর ওমরাহ্ যারা আছে, তারা যদি আগামীকালের মধ্যে আমার কাছে না আসে তবে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। আর—আর আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে আজই দুপুরে একবার কেল্লায় যেতে চাই।'

সকলেই তা সমর্থন করল। ইতিমধ্যে শাহীমঞ্জিলের পাহারাদার অন্য নায়েক দল এসে পড়ল। বারবক ভাবী আমীর ওমরাহ সবাইকে বিদায় দিল। নির্দেশ দিল, সিংহাসন কক্ষ বন্ধ করা হোক। এবং শাহীমঞ্জিলের চারপাশে, দুর্গের এলাকা সহ সূচীভেদ্য পাহারার ব্যবস্থা করা হোক।

সবাই চলে যাবার পর, সিংহাসন কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর, বারবক তেমনি বসে রইল সিংহাসনে। স্তম্ভের একদিকে তখনো তেমনি আলো জ্বলছে। দরজাসমূহ বন্ধ করায়, আবার অন্ধকার ঘিরে এসেছে। দেয়ালের পর্দাগুলি নিশ্চল, অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

বারবক উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ ধরে তার খোলা খাপ কোমরে ঝুলছিল। এখন সে তলোয়ার খাপের ভিতরে রাখল। সিংহাসনের তিনদিকেই পর্দাঘেরা। পিছনে দরজা আছে, বিরামমহলে সোজা চলে যাওয়া যায় সেখান থেকে।

বারবক পর্দা সরিয়ে একবার দেখল, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ফতেশা গতকাল এই পথেই ফিরে গিয়েছিল, তখন দরজা বন্ধ করা হয়েছিল। দরজা খোলা থাকলেও বারবক যেত না। সে দেখতে চায়, শাহীমঞ্জিলের সবকিছু নিয়মিত চলছে কিনা। যদিও তার ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। শরীরটা ঠিক বইছে না, অথচ চোখের পাতাগুলি যেন লোহার মতো শক্ত। তাদের যেন আর কোনদিন পলক পড়বে না। ইচ্ছে করলেও কোনদিন যেন এ চোখ আর বন্ধ হবে না। সর্বদাই খুলে রাখতে হবে। যদিও মৈনুদ্দীন ও দীদার খান সবকিছু লক্ষ্য রাখবার জন্যে ঘুরছে এই শাহীমঞ্জিলের মধ্যে, তবু ভিতরে একটা অস্বস্তি যেন জমাট বেঁধে রয়েছে।

কিসের অস্বস্তি? স্বয়ং সুলতান ফতেশাকে সে নিজের হাতে মেরেছে। বন্ধুরা সবাই দাঁড়িয়ে থেকে তার বশ্যতা স্বীকার করেছে। তার একলার চেষ্টায় কিছুই তো হত না। মুন্না খাঁয়ের মতো লোক পনর লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। সারা দেশব্যাপী তার সুদী কারবার, বিদেশে সে বাণিজ্য করে। টাকা তার অনেক। বারবকের পাঁচ হাজার নায়েককে প্রচুর ঘুষ দিতে হয়েছে। সবই করেছে মুন্না খাঁ, একমাত্র পদের জন্য, সে সৈন্যবাহিনীর বেতনদাতা হতে চায়। আরিজ-ই-লস্কর। চুক্তি অনুযায়ী একটা বিশাল অর্থ সে রাজকোষ থেকে পাবে। তার থেকে সে যে ভাবেই হোক, সৈন্যবাহিনীকে বেতন দিয়ে তুষ্ট করবে। সবাই জানে, তাতেও প্রচুর টাকা রোজগার করা যায়। তাই মুন্না খাঁ এই পদ চেয়েছে। লোকটা বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী। ফতেশার সান্নিধ্যে আসতে চেয়েছিল, পারেনি। বারবকের সান্নিধ্যে এসেছে।···

ইউসুফও তাই। সে এসেছে আরব থেকে। মরু অঞ্চলের ক্ষুধার্ত সরীসৃপ সে, বাংলায় এসে আর নড়তে পারে নি। সামান্য সেনানী থেকে, এক হাজার তুর্কসওয়ার বাহিনীর নেতা নির্বাচিত হয়েছে। অর্থাৎ একশো জন সর-ই-খৈল তার অধীনে আছে। দশজন অশ্বারোহীর যে সৈন্যদল, তার নায়েককেই সর-ই-খৈল বলে। কিন্তু তার স্বপ্ন আরো বেশী, আমীর হতে চায় সে।

হাসনা হাবশী চায় একটা বিশেষ বাহিনীর সরে-ই-লস্কর হতে। হাতীসওয়ার, তুরুক-সওয়ার, পদাতিক আর নৌবহর, এই চারিটি বাহিনী আছে। নৌবহরে হাসনা যাবে না। বাকী তিনটি বাহিনীর যে কোন একটার অধিনায়ক হতে চায় সে। দীদার খান আমীর উল-উমারা হতে চায়। অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী। সকলেই অনেক স্বপ্ন পোষণ করে এসেছে। অন্তরে অন্তরে। বারবক জানে, এরা সবাই বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী। কিছু লুটে নিতে চায়। দলের কেউ কেউ প্রস্তাবও

দিয়েছিল, বারবক সুলতান হবার পর, একদিন গৌড়নগর লুঠ করবার হুকুম দিতে হবে। বারবক রাজী হয় নি। এটা বিশেষ করে আরবী ইউসুফ বলেছিল। তার অভিজ্ঞতা বোধ তা-ই। কিন্তু গৌড় বাংলায় এটা বিশেষ প্রচলিত নয়। কারণ বাইরের কোন সৈন্যবাহিনী এসে যুদ্ধ করে, রাজ্য জয় করছে না। সে ক্ষেত্রে লুটপাট সম্ভব। যদিও কয়েকদিন অরাজকতা চলেই। কয়েকদিন ধরে একটা সংশয় সন্দেহ অস্থিরতা লোকের মনে ঢেউ তোলে। তা বলে গনীমাহ সম্পদ কিছু কম নেই সুলতানের কোষাগারে। গনীমাহ হল লুঠ করা সম্পদ। তার হিসাব আলাদা। সে সবই আসে, অধিকাংশ, আশেপাশের রাজ্য থেকে, সীমান্তের বিদ্রোহী রায়দের শায়েস্তা করে, কখনো রাজ্যের মধ্যেই, বিশেষ কোন অপরাধী ধনী বা সওদাগরের সম্পত্তি লুঠ করে।

বারবক অন্ততঃ এটুকু বোঝে, নগর লুঠ করলেই, প্রজারা অসন্তুষ্ট হবে। শত্রুর সংখ্যা অনেক বেড়ে উঠবে। তাই সে নগর লুঠ করবার অনুমতি দেয়নি।

'কিন্তু আমিই বা কী? একজন বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী-ই নয় কী?

নিজেকে জিজ্ঞেস করল বারবক, 'আমি কী চাই? সোনা? কী করব সোনা টাকা দিয়ে। এখনই তো মুঠো মুঠো নিতে পারি। তবে? সোনার পেয়ালায় মদ খাব? তারপর?...নেশার স্বাদ তো আমি জানি। আমি কী চাই?

সন্ত্রমপূর্ণ নিচু স্বর শোনা গেল, 'জনাব! শাহ্-ই-আলম!'

সম্ভবতঃ হিন্দুনার গলা।

সঙ্গে সঙ্গে বারবক উদ্দীপ্ত চোখে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'শাহ্-ই-আলম! শাহ্-ই-আলম হতে চেয়েছি আমি। আমি চেয়েছি ক্ষমতাবান হতে। শক্তি, ক্ষমতা, এই দুই হাতের মুঠোর মধ্যে এনে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতাকে আমি চেয়েছি। যার ওপরে আর কিছু নেই। সেই শাহীক্ষমতাই আমি চেয়েছি। রাজ্যের সকলের প্রাণ আমার হাতে, ধন আমার হাতে, আমিই সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আমি সুলতান নাজিম (বিচারক)। এখন আমি মাটিতে ভাত খেলেই বা কি, লোহার পাত্রে পিয়াস মেটালেই বা কি। আমার হুকুমই সব!

'মানুষের এই তো বাসনা! নসরতাবাদের সেই একটা রাস্তায় দেখা ভিখিরি ফকিরের কথা আমি ভুলি নি। একদিন যেতে যেতে দেখলাম সে ভিখিরি, কিন্তু তার একটা বউ ছিল। ডান হাতে সে ভিক্ষে করছিল, বাঁ হাতে সে বুড়ি বিবিটিকে মারছিল। বুড়িটা কী একটা অন্যায় করেছিল। বুড়িটা অসহায়ের মতো কাঁদছিল, বলছিল, "খোদাবন্দ্ আর মারবেন না।"

বারবক ভাবছিল, লোকটা খেতে পায় না, তবু একটা জায়গায় তার কত ক্ষমতা! মানুষ এই ক্ষমতা চেয়েছে। ফকির থেকে সুলতান, সবাই ক্ষমতা চেয়েছে। যে ক্ষমতা পায়, সে সবই পায়! আমি রুকনুদ্দিন বারবক শাকে দেখেছি, ফতেশাকে দেখেছি, সবকিছুই তাদের পায়ের তলে? এবার আমি, আমি!... কেউ বেয়াদপি করলে, আমি শিলাহ্‌দারের হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে তার কোমরে আঘাত করব। কেউ ভাল করে কথা বলতে না পারলে, তার মুখে থুতু দিয়ে দেব। আমি সুলতান।'...

কথাগুলি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে বলতে বারবক হঠাৎ হেসে উঠল। হাসতেই লাগল। নিঃশব্দে কিন্তু উচ্ছ্বসিত বেগে, হাসতে হাসতে সে দুমড়ে পড়ল। যেন তার পেট ব্যথা হয়ে যাচ্ছে হাসতে হাসতে।

আবার নিচুস্বরে ডাক শোনা গেল, 'জনাব, শাহ্‌-ই-আলম!'

—কে? কে তুমি?

বারবক হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল। বেদীর নিচে থেকে জবাব এল, 'আমি হিদ্‌না, আপনার গোলাম!'

বারবক চোখ বড় বড় করে তাকাল। কোথায় হিদ্‌না? বামন-খোজাটাকে দেখা যাচ্ছে না। বেদীর নিচে, অন্ধকারে ঢাকা পড়ে রয়েছে। বারবক নিচে নেমে আসতে আসতে বলল, 'কে বলে তুই গোলাম। আমি যদি বলি তুই গোলাম নোস, এহলে তুই গোলাম নোস্‌। আমি যা বলব, তাই সত্যি!'

হিদ্‌না বলল, 'বেশাখ্‌ জনাব, আপনি যা বলবেন তাই সত্যি।'

—তুই গোলাম নোস্‌, তুই—তুইও খোজা, তুই আমার বন্ধু।

হিদ্‌নার কাছে এসে, ঝুঁকে পড়ে চুপি চুপি শব্দে বলল বারবক, 'কিন্তু কাউকে বলিস না যেন। লোকে জানবে, তুই আমার সরাবদার।'

সুলতানের পানীয় মদের যে তত্ত্বাবধায়ক, তাকে বলে সরাবদার। হিদ্‌নার গলা শোনা গেল, 'আমি বরাবরই তাই ছিলাম।'

—তখন ছিলি খাওয়াজা-সেরার, এখন সুলতানের।

বলে সে রুবাকে ডাকল। কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ার খুলে তার হাতে দিল। পুরনো সুরে ডেকে বলল, 'হিদ্‌না, সরাব!'

হিদ্‌না পাত্র এগিয়ে দিল। সেই পুরনো পাত্র থেকে নতুন সুলতান একই ভঙ্গিতে গলায় মদ ঢেলে দিল। তারপর দরবারের বাইরে এল। নতুন নায়েকরা শাহীমঞ্জিলের চারদিকে পাহারায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সুলতানের ব্যক্তিগত ভৃত্যরা

হুকুমের অপেক্ষায় নতমস্তকে সারি বেঁধে অপেক্ষমান। উজীর আবদাল্লা ছুটে এসে অভিবাদন করল। জানাল, সিংহাসন-ঘর অন্ধকার দেখে সে ভেবেছিল, সুলতান মসনদেই বিশ্রাম করছেন। তাই সে বিরক্ত করে নি।

বারবক মনে মনে বলল, 'আমি সুলতান, আমাকে বিরক্ত করার সাহস নেই উজীর আবদাল্লার। গতকালও সে আমাকে তুমি বলেছে। আজ সম্মান করছে। ক্ষমতা, ক্ষমতা এমন জিনিস!'

উজীরকে সে বলল, 'খোজাদের পাঠিয়ে যেন হারেম থেকে এখুনি ফতেশার মৃতদেহ এনে, আগেকার সুলতানদের সমাধিক্ষেত্রেই কবরস্থ করা হয়। একাজের দায়িত্ব আমি তোমাকেই দিলাম।'

আবদাল্লা কুর্নিশ করে জানল, তাই হবে। অন্যান্য মৃতদেহের কথায়, জানাল, ইতিমধ্যে আর সমস্ত মৃতদেহই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ইফ্‌তিয়ারের মৃতদেহ তুরুকের পিঠে চাপিয়ে তার বিবির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—ইফ্‌তিয়ার!

নামটা একবার উচ্চারণ করে বারবক তার বুকে হাত দিল। কিন্তু রক্তের দাগ সেখানে আর ছিল না। তার গায়ে বহু মূল্যের কাবাই। তার মাথায় এখন মুকুট। সে শাহীমঞ্জিলের অনেকখানি অংশ আবদাল্লার সঙ্গে পরিক্রমণ করল। তারপর বিরামমহলে গিয়ে ঢুকল। সেখানে ভৃত্যরা তার সেবার জন্য অপেক্ষা করছিল। জমাদার তাকে নতুন পোশাক পরাবার অনুমতি ভিক্ষা করছে। সেই সময়ে হঠাৎ তার স্মরণ পড়ল, ফতেশার বেগমের কথা। সে জানতে চাইল, বেগম চলে গিয়েছে কিনা। জানা গেল নতুন সুলতানের সরকারি অনুমতি না পাওয়ায়, শাহীমঞ্জিল থেকে বেগমকে যেতে দেওয়া হয়নি। আবদাল্লাকে ডেকে অনুমতি দিয়ে দিল বারবক, আর বেগমকে জানিয়ে দিতে বলা হল, শত্রুদের সঙ্গে কোনরকম ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করলে, পরিণাম খারাপ হবে।

আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুটতে লাগল। মুয়াজ্জীনের নমাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। এখন চারিদিকেই শানাই আর ঢোলকের শব্দ। কেবল শাহীমঞ্জিলের নহবত নয়। তার বাদ্য বাদক, সকলই সুলতানী। কিন্তু এখন সারা গৌড় নগরেই, কাঁসি শানাইয়ের দল বেরিয়ে পড়েছে। এই হচ্ছে গৌড়ের প্রতিদিনের সাধারণ নিয়ম। বাদকের দল, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যত ধনী অভিজাতদের বাড়ি আছে, সেখানে দরজার কাছে গিয়ে বাজনা বাজাবে। শানাই কাঁসি আর ঢোল। এখন বাজিয়ে চলে যাবে। তারপরে আসবে খাবারের সময়।

তখন তাদের সাধারণ প্রাপ্য, খাবার আর পয়সা নিয়ে চলে যাবে।

শাহীমঞ্জিলের থেকে একটু দূরেই, প্রাকারের বাইরে, সুলতানশাহীর নিজস্ব ভবনেই আমীর ওমরাহদের বাস। বাদকের দল, প্রতিদিনের মতোই সেখানে বাজাচ্ছে। যদিও, শাহীমঞ্জিলের শানাইয়ের শব্দ ছাপিয়ে তা শোনা যায় না, কিন্তু এই ভোরে চারিদিকেই বাজনা বাজছে।

ফতেশা নিহত হয়েছে রাত্রে, বারবক সিংহাসনে বসেছে, কিন্তু গৌড়ের জীবন-যাত্রা এক রকমই। কাল ভোরেও যেমন ছিল; যেমন ভাবে দিন শুরু হয়েছিল, আজও তেমনি শুরু হয়েছে। যেন কোথাও কিছু ঘটে নি, যা ঘটেছে, তা কেবলমাত্র বারবকের জীবনেই ঘটেছে।

সারাদিনের মধ্যে নানাভাবে সংবাদ এল। বারবকের প্রথম ভয় ছিল, নগরের মধ্যে যে সব আমীর ওমরাহেরা আছে, তারা হঠাৎ কেউ বিদ্রোহ করে বসবে কি না। তাড়াতাড়ি দল পাকিয়ে যদি তারা অতর্কিতে আক্রমণ করে, তা হলে কী হয় বলা যায় না। তাছাড়া যারা সব সময়েই একটা দুর্যোগের সুযোগে থাকে, একটা কিছু ঘটলেই গোলমাল শুরু করে দেবে, তাদের সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছিল না। এবং যেটা আরও সন্দেহ ছিল, গৌড় নগর ছেড়ে ফতেশার আমীর ওমরাহ উজীরেরা কেউই চলে যায় নি। সকলেই আগামীকালের দরবারে আসতে স্বীকৃত হয়েছে। এমন কি খান জহানও। তবে খান জহান জানিয়েছে, সে কয়েকদিনের জন্য সীমান্ত থেকে গৌড়ে এসেছিল, অনুমতি পেলে আবার যেতে পারে। কারণ, সীমান্ত খুব নিরাপদ নয়। তাকে সুলতান ফতেশা ডেকে পাঠিয়েছিল বলেই সীমান্ত ছেড়ে তাকে চলে আসতে হয়েছিল। তার সৈন্যবাহিনী এখনো সেখানে রয়েছে। সুলতানের হুকুম পেয়েই, নিজের শীলমোহর দিয়ে, স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠিয়েছে সে। গৌড়ের এটাই নিয়ম, আমীরেরা নিজস্ব শীলমোহর ব্যবহার করতে পারে।

বারবক জানে, আমীর-উল-উমারা (প্রধান অমাত্য) হাবশী মালিক আন্দিলকে আর খোজা খান জহানকে ফতেশা ইচ্ছে করেই গৌড়ের বাইরে দূরসীমান্তে রেখেছিল। এদের কর্মক্ষমতায় খুশি হয়ে ফতেশা এদেব প্রধানমন্ত্রিত্ব ও জংদারের সম্মান দিয়েছিল। জংদার সেনাপতি। কিন্তু এদের চোখের ভিতরে সে লোভের যে কুটিল হিংস্রতা দেখেছিল তাতে এদের বিশ্বাস করতে পারেনি। তাদের ব্যবহারে বাইরের লোকে জানে, সুলতান এইসব আমীর-ওমরাহদের হাতের পুতুল।

বিশেষত হাবশীরা পদে ও দলে ভারী। জালাল্‌দ্দীন ফতেশার পরেই রাজ্যে যার ক্ষমতা ও খ্যাতি সব থেকে বেশী, সে হাবশী মালিক আন্দিল। রাজনৈতিক ব্‌দ্ধি শ্‌ধ্‌ নয়, মালিক আন্দিল গৌড়ের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। হাবশী উজীর আমীর প্রধান হাবস খাঁ, আলমাস্‌, ফির্‌ক, সিদ্দিবদর, সকলেই তার অঙ্গ্‌লিসংকেতে চলে। আর খান জহানের ক্‌টনৈতিক চালের স্‌নাম সকলেই জানে। ফতেশার সে-ই সব থেকে বিশ্বস্ত ছিল।

কিন্ত্‌ খান জহান বারবককে অবাক করে দিয়ে, তাকেই স্‌লতান অল দীন বলে সম্বোধন করে চিঠি দিয়েছে। খান জহান! প্রধান মন্ত্রী ফতেশার, বারবককে সর্বশক্তিমান বলে নতি জানিয়েছে।

বারবক খবর দিয়ে পাঠাল, সীমান্তে খান জহান যাবে, তার আগে তাকে দেখা করতে হবে নত্‌ন স্‌লতানের সঙ্গে। কারণ গতকাল রাত্রে ইফ্‌তিয়ারকে যে সে-ই পাঠিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না বারবকের। তাই সে খান জহানের ম্‌খোম্‌খি হয়ে শ্‌নতে চায়। যদি বিশ্বাস করতে না পারে, তবে তাকে বন্দী করবে, নয় তো—নয় তো—না, নিজের হাতে বারবক হত্যা করবে না। সে দায়িত্ব এবার অন্য কাউকে দেওয়া হবে।

বারবকের কেল্লা পরিদর্শন করতে যাবার আগেই, প্রধান অমাত্য এল। খান জহান এসেই, নতজান্‌ হয়ে, বারবককে শাহ-ই-আলম বলে অভিবাদন করল।

খ্‌শি হল বারবক, অথচ তার ভিতরে একটা অস্বস্তি। দেখল, খান জহানের ম্‌খে ভয়ের ছাপ। চোখের কোণ বসা। জোব্বা পিরান কাবাই সবই রাজকীয়, কিন্ত্‌ মেহেদী রাঙানো দাড়ি উচ্ছ্‌ঙ্খল। ভাল করে আঁচড়াতে পারে নি।

বারবক তখন সিংহাসনেই বসেছিল। বলল, 'ত্‌মি তা হলে আমাকে স্‌লতান বলে স্বীকার করছ?'

খান জহান বলল, 'আপনি এই মঞ্জিলে সিংহাসনে বসে আছেন, আর কাকে আমি স্‌লতান বলতে পারি!'

—এতে ত্‌মি স্‌খী না অস্‌খী?

—যিনিই স্‌লতান হন, তাঁর ত্‌ষ্টিবিধানেই আমার স্‌খ।

খান জহান খ্‌বই চালাক। বারবক বলল, 'ত্‌মি আমার ত্‌ষ্টিবিধান করতে চাও?'

খান জহান বলল, 'সর্বক্ষণ শাহ-ই-আলম।'

—তবে তুমি কাল রাত্রে ইফতিয়ারকে ল্‌কিয়ে এখানে পাঠিয়েছিলে কেন?

—শাহ্-ই-আলম, আপনি বিশ্বাস করতে পারেন—'

বারবক নিজের গলার স্বর ও কথা শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল যেন। সে বলে উঠল, বিশ্বাসযোগ্য কথা বল আমীর উল আমারা।'

খান জহান অত্যন্ত দ্রুত, কিন্তু প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলল, ফতেশা শুনে হতে পারেন, একথা হঠাৎ শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই ইফতিয়ারকে পাঠিয়েছিলাম। তার জন্যে কোন গোস্তাকি হলে মাপ করবেন।'

বারবক যেন অবাক হয়ে বলল, 'হঠাৎ কেন শুনবে ? তুমি বা হাবশ বা ফিরুক বা সিদ্দিবদর, এমন কি মালিক আন্দিল, তোমরা কেউই একেবারে কিছুই কি জানতে না ?'

খান জহান একমুহূর্তের জন্য থমকে গেল। বারবক তার মধ্যেই আবার বলে উঠল, 'হাসনা বা ইউসুফের মারফত, সব সময়েই কি তোমাদের সঙ্গে খবর দেওয়া নেওয়া হয় নি ? তোমরা কি কাটাদরোয়ারের গাজির কথা কিছুই শোন নি ?'

খান জহান আরো ভয় পেল। বলল, 'জানতাম শাহ্-ই-আলম। কিন্তু ঠিক গতকাল রাত্রেই যে ঘটনা ঘটবে তা সঠিক জানা ছিল না। তাই আমার কাছে যখন খবর গেল, শাহীমঞ্জিলে আজ কিছু ঘটবে, তখনই আমি ইফতিয়ারকে পাঠিয়েছিলাম।'

—কার মারফত খবর পেয়েছিলে ?

—আপনি জানেন খলিফত, প্রধান অমাত্যের নানা কারণে বিশ্বাসী গুপ্তচর রাখতে হয়। তাদেরই একজনের মারফত খবর পেয়েছিলাম।

—কী খবর পেয়েছিলে ?

—শাহীমঞ্জিলের অনেক আলো নেভানো, সেখানে কিছু ঘটতে পারে।

—ঘটলেই বা তোমার কী করার ছিল খান জহান।

খান জহানের মুখ করুণ আর অসহায় হয়ে উঠল। বলল, 'কিছুই না শাহ্-ই-আলম। আজ যদি আপনার সম্পর্কে কোন খবর পাই, তা হলেও আমি কাউকে খবর পাঠাব। সেটাই আমার কর্তব্য। সেইজন্যেই ইফতিয়ারকে পাঠিয়েছিলাম। নতুন সুলতানকে কেউ হত্যা করতে চাইলে, গতকাল রাত্রে যা করেছি, আজও তাই করব। আমি কোনরকম বাধা দিতে চাই নি।

বারবক বিশ্বাস করল, আর হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল। এতটা খুশি যে, সে তার আবেগের সামঞ্জস্য রাখতে পারল না। বলে উঠল, 'আমি জানি, জানি, আমার বিরুদ্ধে যাবার সাহস কারুর নেই। গেলে, আমি তাকে, তাকে এই দুনিয়া থেকে

আর এক দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেব। ইফ্‌তিয়ার সেই দুনিয়ায় গেছে। তোমার জন্যে। খান জহান, ইফ্‌তিয়ার অন্য দুনিয়ায় চলে গেছে।'

খান জাহানের মেটে রং-এর মুখ লাল হয়ে উঠল। অপমানেও ভয়ে, সে মাথা নত করে রইল। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বারবকের মুখও যেন বদলে গেল, 'ইফতিয়ার, ইফতিয়ার, আমার বন্ধু! জানতাম না কবে থেকে সে তোমার অনুচর হয়েছে। তুমি যদি নিজে সরাসরি আসতে তাহলে আর তাকে মরতে হত না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে হঠাৎ নিশ্বাস ফেলে বলল ,'নসীব! ঠিক আছে, তুমি যাও, সীমান্তে যাও। আমি খবর দিলে চলে আসবে।'

খান জহান বলল, 'আমি আপনার হুকুম-বরদার।'

সে বিদায় নিল। বারবক তার চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। সে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর, বারবক কিছুক্ষণ পর হঠাৎ গলা খুলে হাসতে লাগল। বলে উঠল, 'খান জাহান ভয় পেয়েছে।'

তারপর কেল্লায় যাবার আয়োজন শুরু হল। যদিও শাহীমঞ্জিলের সীমানার মধ্যেই কেল্লা, তবু ভিন্ন ইমারত। দুইটি ইমারতই আলাদা আলাদা জলপূর্ণ পরিখার দ্বারা বিভক্ত। অথচ প্রধান তোরণ একটিই। নগর প্রাকারের পর শাহীমঞ্জিলের প্রাকার আলাদা। সেই জন্যই বাইরের লোকের কাছে শাহীমঞ্জিল আর কেল্লার কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। তাদের কাছে সব মিলিয়েই শাহীমঞ্জিল।

প্রায় অপরাহ্ন বেলায় কেল্লা পরিদর্শন হল। মুন্না খাঁ চতুর লোক, সে পূর্বাহ্নেই কেল্লার সমগ্র বাহিনীর মধ্যে নেতৃস্থানীয়দের টাকা এবং অন্যান্যদের সুপ্রচুর পান-ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল। বিশেষ করে, খোজা নায়েক ও অধিনায়কেরা যেন বিশেষভাবে খুশি হয়েছিল। বারবক যখন কেল্লায় পৌঁছেছিল, তখন সকলে স্ব স্ব বাহিনী নিয়ে, কেল্লার ময়দানে সামরিক রীতি অনুযায়ী সারি সারি দাঁড়িয়েছিল। তূর্য আর দামামা ধ্বনি দ্বারা সুলতানকে অভিবাদন করেছিল। তারপরে রীতি অনুযায়ী সকল বাহিনীর নায়েকরাই, সুলতানকে বিশেষভাবে সামনে দিয়ে যাবার সময় অভিবাদন করেছিল।

ফিরে আসবার সময় বারবক রাজকীয় হাতীর হাওদায় চেপে ফিরে এল। বারো হাজার খোজা সৈন্য তাকে ঘিরেছিল। ঘোড়সওয়ারবাহিনীর সকলেই প্রায় মিছিলের মতো যোগ দিল। তুরঙ্গের পায়ে তুলাগুটি বাজিয়ে গৌড়ের আকাশ ভরে তুলল।

নতুন সুলতানের সম্মানে সমস্তবাহিনী আপন আপন রাজকীয় বেশে বারবককে অভিবাদন করল। নানা বর্ণের টুপি, নানান বাহিনীর মাথায়, সাদা কালো লাল। সজ্জিত হস্তীযূথের দল আগে রাজকীয় বেশে স্বয়ং শাহ্‌নাফীল। শাহ্‌নাফীল—সুলতানের হস্তীশালার অধ্যক্ষ। হাজার হাজার কাড়া নাকাড়া দামামা বেজে উঠল, এমনকি, হাতে বালা কানে সোনা, খালি গা হাজার হাজার ঢালি আকাশ কাঁপাল, পায়ের নূপুরে শব্দে ধরিত্রী কাঁপাল। পাইকদের কোমরে ঘাগর, হাতে ঢাল খড়্গ, ধনুর্ধরেরা বেরিয়েছে ধনুশরবাহিনী নিয়ে। শাহীমঞ্জিলের দূর প্রান্তর থেকে জনতা এই দৃশ্য দেখছিল। যদিও পূর্বে নিশান (ঘোষণা) ছিল না, তবু সাধারণ মানুষ চিরদিন কৌতূহলী।

—আমি সুলতান!

বারবক মনে মনে বলছিল। বাদশাহী হাতীর সোনার স্তম্ভযুক্ত হাওদায়, দুলতে দুলতে বারবক মনে মনে বলছিল। 'আমি সুলতান।'

কিন্তু হিদুনা কি পরিমাণ ভাঙ্ মিশিয়েছিল শরবতে?

'আমি এত টলছি কেন?'

আসলে এই একটা কাজ কখনো হয় নি তার, হাতির পিঠে কখনো চাপে নি বারবক। সেইজন্য কিছুটা বেসামাল বোধ করতে তার এরকম মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সে বড় বেশী টলছে। হিদুনাকে সে নির্দেশ দিয়েছিল, যেন সামান্য পরিমাণ ভাঙ্ শরবতে দেওয়া হয়। হিদুনা তাই দিয়েছিল। আসলে, ক্ষমতা ও গৌরবের আবেশে, অল্প সিদ্ধিতেই নেশা ধরেছে। আর হাওদায় টলে টলে পড়ছে।

সে যখন সামান্য খোজা ছিল, তারপরে যখন কাল রাত পর্যন্তও খাওয়াজাসেরা ছিল, তখন সে পান করলে প্রায়ই একটা গান করত। আরবী ভাষায় সেই গানের মানে, 'পক্ষীরাজ ঘোড়া পেলে, রাতের আসমানে আমি যেতাম, নক্ষত্রগুলোকে সব থলের ভরে নিয়ে আসতাম।'

হাওদায় বসেও সে অন্তত বারদুয়েক গুনগুনিয়ে উঠেছে, 'পক্ষীরাজ ঘোড়া পেলে…।' এবং পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। মনে মনে বলেছে, 'আমি সুলতান! আমি সর্বশক্তিমান!'… হাওদার ওপরেও তার সামনে খোলা তলোয়ার। দরবারের মতোই, সুলতানশাহীর নিয়ম রাজকীয় মিছিলে খোলা তলোয়ার থাকবে কোলের কাছেই।

—শাহ্ সুলতান শাহজাদা জলাল অল্-দীন ওয়াল-দুনিয়া!…

কাছের থেকেই একজন উচ্চৈস্বরে বলে উঠল। বারবক তাকিয়ে দেখল, দীদার

খান। বারবক হাসল, আর মনে মনে পুনরাবৃত্তি করল, 'সুলতান শাহজাদা ধর্মের বিশ্বের গৌরব!'

খোজারা জয়ধ্বনি করল।

একদল অশ্বসওয়ার আগেই ছুটে গিয়েছিল নগরের পথে। তাদের সং তূর্যনাদ করতে করতে আর একদল। তাদেরও পিছনে সশস্ত্র ঢালবাহিনী। গৌড়ে সুলতানশাহীর ঢালীরাও সশস্ত্র যোদ্ধা। এই কালো শক্ত পেশীবহুল ঝাঁকড়া চু বাহিনীকে সকলেই ভয় পায়। তারা এই গৌড়বঙ্গেরই অধিবাসী।

এই সমস্ত দল, নগরের পথে পথে আগেই ঘোষণা করল, সুলতান শাহজাদ নগর পরিদর্শনে আসছেন, সব তফাত যাও, পথ করে দাও।

প্রাকার-বেষ্টিত নিরাপদ নগরী, দুইটি তার প্রধান প্রবেশ তোরণ। তোরণে সশস্ত্র প্রহরীরা আছে; তাদের কাছে আগেই সংবাদ গিয়েছে, অতএব নগরের তোরণদ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইরের কেউ এখন আর নগরে ঢুকতে পারবে না যারা রয়ে গিয়েছে, সেইসব বহিরাগতদের এখন আর বেরিয়ে যাবার উপায় নেই প্রশস্ত রাজপথ, বাঁকাচোরা প্রায় নেই, যেদিকেই ফিরবে, নাক বরাবর সোজা।

শাহী হাওদার ওপরে দাঁড়িয়ে। দূর থেকেই বারবক দেখতে পায়, বড় বড় দোকানপাট অনেক, ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক পথচারী হঠাৎ হুড়মুড় করে, ধাক্কাধাক্কি করে, গলির মধ্যে ঢুকে পড়ছে। ওরা ভয় পেয়েছে। পাওয়াটাই স্বাভাবিক। গতকাল রাত্রে সুলতানকে হত্যা করে, নতুন সুলতান সৈন্যবাহিনী নিয়ে নগর ভ্রমণে বেরুলে, একটা অবিশ্বাস মনে আসতে পারে, হয়তো লুঠ করতে আসছে। তাছাড়া, সাধারণ মানুষ, শাহী-ফৌজকে ভয় পায়। সুলতানকে তার চেয়ে বেশী।

কিন্তু সকলেই পালিয়ে যাচ্ছে না। অনেকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়েছে তারা কৌতূহলী জনতা। ভয় তাদের কম। তারা সব দেখতে চায়। যদিও সৈন্যবাহিনী, রাস্তার দু-পাশেই সুরক্ষিত দেওয়ালের মতো জনতাকে আটকে রেখেছে, যাতে তারা কোনরকমেই রাস্তার মাঝখানে চলে আসতে না পারে। ভোজনাগার পানাগার, আর স্নানাগারগুলোর কাছেই জনতার ভীড় বেশী। নগরের সমস্ত পানাগার ভোজনাগার আর স্নানাগারই বারবকের বিশেষভাবে পরিচিত। এসব জায়গায় তার রীতিমতো যাতায়াত ছিল। ওগুলো অনেকটা আড্ডা আর মজলিসের জায়গা। অনেকেই নিশ্চয় বারবকের পরিচিত। যাদের সঙ্গে বসে সে অনেক গল্প

করেছে, সরাব পান করেছে, গোসল করেছে। শাহীমঞ্জিলের সে খাওয়াজা-সেরা ছিল। সকলেই তাকে খাতির করতো। তার পয়সায় অনেকে খানাপিনা করতো। মোসাহেবের দল বেশ ভারী ছিল। তারা নিশ্চয় ভিড় করে আছে, পুরনো সাথীকে আজ শাহীহাওদার ওপরে সুলতান বেশে দেখবে বলে।

বারবক মনে মনে জিজ্ঞেস করে, ওরা কী ভাবছে? খুব অবাক হচ্ছে নিশ্চয়ই। ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে নি, এই লোকটা সুলতান হবে। ভাবছে, এত ক্ষমতা ছিল লোকটার, ফতেশাকে হত্যা করে নিজে সিংহাসনে বসেছে!

হ্যাঁ, তা-ই বসেছে বারবক। তবু সেনাধ্যক্ষরা নিশ্চয়ই যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখেছে। কারণ, কিছুই বলা যায় না, ফতেশার দলের কেউ কেউ কোথাও ভিড়ের মধ্যে ওত্ পেতে থাকতে পারে। হয়তো একটা বর্শা বা বল্লম, যে কোনদিক থেকে বারবককে লক্ষ্য করে ছুটে আসতে পারে। যদিও বারবকের প্রায় বুক পর্যন্ত হাওদায় ঢাকনা আছে। কিন্তু মাথায় এসেও বিঁধতে পারে।

'শাহ্ সুলতান শাহজাদা জলাল অল্-দীন্ ওয়াল্-দুনিয়া!'

সুলতানের জয়ধ্বনি ওঠে। বহু কণ্ঠেই তার প্রতিধ্বনিও বাজে। জয়ধ্বনি যেন মদের মতো নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। রক্তের মধ্যে ঢুকছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। মাতাল হয়ে যাচ্ছি আমি, তাই টলছি। নাকি হিদ্না সত্যি বেশী পরিমাণে ভাঙ্ দিয়েছে। কিন্তু কিন্তু ওটা কে গোসলখানার দরওয়াজার কাছে? বারবক চমকে উঠল। ইকরার খান। বারবকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই যে লোকটা হেসে উঠল?

পরমুহূর্তেই ভুল ভেঙে গেল বারবকের। না, ইকরার নয়। দিনের বেলা নগরে প্রকাশ্যে থাকতে সে সাহস পাবে না। অনুচরদের সবাইকেই জানানো আছে, যেখান থেকেই হোক, ইকরারকে ধরতে হবে। কারণ, ইকরার খান হল আহত বাঘ, মুখের শিকারও যার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। বারবকের কথাতেই, ফতেশা তলোয়ার দিয়ে ইকরার খানের দাড়ি কেটে দিয়েছিল। তলোয়ারটা দিয়েছিল বারবককে। বারবককে সে সহজে ছাড়বে না। তাই বারবকই আগে তাকে হাতে পেতে চায়। যাতে একেবারে শেষ করে দেওয়া যায়।

আবার জয়ধ্বনি উঠল। মুহুর্মুহুঃ উঠতে লাগল। কিন্তু বারবকের মনের মধ্যে আবার একটা চকিত চমক লাগল। হঠাৎ তার মনে হল, কেবল হাবশীদের জন্যই সে দুশ্চিন্তা করছে। মাহ্মুদ শাহী বংশের অনেক পুরুষই তো এখনো জীবিত। তারা কি সবাই নিশ্চেষ্ট বসে আছে? তারা কি বারবককে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র করছে না? মনে হতেই, দীদার খানকে সে কাছে ডেকে বলল,

'ফিরে চল তাড়াতাড়ি, আমার ভাল লাগছে না। আমার কয়েকটা কথা মনে আসছে। আমি এখনই খবর চাই, মাহ্‌মুদশাহী বংশের সবাই এই মুহূর্তে কে কোথায় আছে। না হলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।'

দীদার খান সেই মুহূর্তেই তার নির্দেশ পালন করে। সে শাহন্ ফীলকে, শাহী জৌলুস প্রত্যাবর্তনের জন্য সুলতানের হুকুম জানায়। শাহন ফীল, যে সুলতানের মাহুত বলা যায়, হস্তীশালার রক্ষক, সে তৎক্ষণাৎ আগের হস্তী-বাহিনীকে নির্দেশ পাঠায়। সেখান থেকে পদাতিক ও অশ্বসওয়ারদের। মিছিলের গতি সহসা দ্রুত হয়।

দীদার খান একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'এর জন্য আপনার চিন্তার কিছু নেই। শাহ্‌বংশের যারা বেঁচে আছে, তারা কেউ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস করবে না। সেরকম পুরুষ কেউ নেই।'

বারবক বলল, 'ফতেশা ইস্‌কান্দারকে রাতারাতি পাগল বানিয়ে দিলেও ,আমি জানি, ইস্‌কান্দারের এক ছেলে আছে। সে বেশ বড় হয়েছে। সিংহাসনের দিকে তার নজর থাকতে পারে। তাকে আমরা চাই।

বারবকের চোখের দিকে তাকিয়ে দীদারের বুক কেঁপে ওঠে, বলে, 'তাকে পাবেন।'

—কিন্তু তার কথা আমাকে কেউ মনে করিয়ে দেয় নি কেন ?

দীদার কোন জবাব দিতে পারল না। বারবক আবার বলে উঠল, 'হাসনা মৈনুদ্দীন এরা কেউ আমাকে একবারও মনে করিয়ে দেয় নি। কেন ? দীদার-এর মনে কি কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?'

দীদার খান খানিকটা সংশয়ের সুরে বলল, 'আমার মনে হয় না। বোধহয় কারুর মনে ছিল না। হাবশীদের নিয়েই সবাই বিশেষভাবে হুঁসিয়ার ছিল। মাহ্‌মুদশাহী বংশের কথা কেউ ভাবে নি।'

বারবকও ভাবে নি। এখন, এইমাত্র তার মনে পড়েছে। ইস্‌কান্দারের ছেলে, কী নাম যেন তার ? আলাউদ্দীন ফয়জুল্লা শাহ্। ফতেশা তাকে দেখতে পারত না। কারণ, সে সিংহাসনের ভাগীদার হতে পারে। ফতেশা বেঁচে থাকলে, যে কোন ভাবেই তাকে মরতে হত। যদিও ফতেশা তাকে প্রচুর ভোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, যাতে সে বিবি আর সরাব নিয়ে অকালেই নিজেকে শেষ করে দিতে পারে, কিন্তু ফয়জুল্লা ঠিক তা নয়। শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ্‌র মতই তার চেহারা। ফতেশার আগে যে সুলতান ছিল, সেই শামসুদ্দীনের সে ছিল খুবই প্রিয়পাত্র।

য়ুসুফ শাহ্-এর যেমন ধর্মে মতিগতি ছিল, আলাউদ্দীন ফয়জুল্লারও তা-ই। য়ুসুফ রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্-এর ছেলে। সে তার বাবার সঙ্গে কয়েক বছর যুক্তভাবে রাজত্ব করেছে। ধর্মপ্রাণ, শাসনদক্ষ য়ুসুফ। বিদ্বান আর কৌশলী সুলতান। তার রাজত্বে কেউ প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে পেত না। আলিমদের ডেকে সে স্পষ্ট বলে দিয়েছিল, 'ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে, নিষ্পত্তি করতে গিয়ে যদি তোমরা বিশেষ কারো পক্ষ নাও, তা হলে তেমাদের আমি দুশমন মনে করব, শাস্তি দেব।'

শুধু তাই নয়, যেসব জটিল আর সূক্ষ্ম বিচারে কাজীরা কিছুতেই কিছু ঠিক করতে পারত না, সে সব য়ুসুফ শাহ্ নিজে বিচার করতো। আর তা সবই হত অত্যন্ত সুবিচার।

তবু সে ছিল মনে মনে সাম্প্রদায়িক, ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়ামি ছিল। তা না হলে, সপ্তগ্রামের কাছে, পাণ্ডুয়ার হিন্দুদের নারায়ণ আর সূর্যমন্দির ভেঙে, তার সময়েই মসজিদ তৈরি হত না। পাণ্ডুয়ার মিনার তৈরি হত না। বাইশ দরওয়াজা মসজিদ, হিন্দুদের শিলাস্তম্ভ আর ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তৈরি হত না। কদমরসুল মসজিদ য়ুসুফের তৈরি। সাকোমোহন মসজিদও তারই কীর্তি। দরাসবাড়ি জামী মসজিদ, তাঁতীপাড়ার মসজিদও তার আমলের। শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ্ কেবল মসজিদ আর মিনার তুলে গিয়েছে, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে। সে তার বাবার মতো অসাম্প্রদায়িক ছিল না। আর তারই শিক্ষায় ধর্মে বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত আলাউদ্দীন ফয়জুল্লা শাহ্। পাগলা ইস্কান্দারের ছেলে। জলালউদ্দীন ফতেশা, তাকে যতই ভোগের সামগ্রী জুটিয়ে দিক, এ ভবী ভোলবার নয়। সম্ভবত এই সতর-আঠারো বছরের আলাউদ্দীন, হাবশীদেরও মনে মনে ঘৃণা করে। মাহ্-মুদশাহী বংশের রক্ত তার শরীরে। অল্প বয়সে তার বাবাকে সে নির্মমভাবে পাগল হতে দেখেছে। মাত্র দুদিনের জন্য সুলতান হয়েই, তার বাবা ইস্কান্দারকে পাগল হতে হয়েছিল। সমস্ত কিছুর প্রতিশোধ সে নিতে চাইবে। না, না, ফয়জুল্লাকে ছেড়ে রাখতে পারেব না বারবক। তাকে তার চাই-ই চাই। ফতেশার ছেলের বয়স এখন মাত্র দু বছর। জামানি বেগমের কাছে সে আছে। জামানি বেগম যদি কোন ষড়যন্ত্রে না থাকে, তাহলে সেই শিশুকে নিয়ে বারবকের এখনই কোন ভাবনা নেই। আর জামানি বেগম যদি ষড়যন্ত্র করেও, সে কখনো ফয়জুল্লার সঙ্গে করবে না। কারণ, ফয়জুল্লার বাবাকে ফতেশা পাগল করেছিল। ফতেশার ছেলেকে সে বাঁচতে দেবে না। জামানি বেগমকে সে ক্রীতদাসীদের দলে ফেলে দেবে।

জামানি বেগম যদি কখনো ষড়যন্ত্র করে, তবে তা হাবশীদের সঙ্গেই করবে। অতএব, ফয়জল্লা—আলাউদ্দীন ফয়জল্লা শাহকেই বারবকের আপাতত চাই।

সে যতই এসব কথা ভাবতে থাকে, ততই মনের মধ্যে কী রকম একটা অস্বস্তি হতে থাকে। কীসের অস্বস্তি, সে বুঝতে পারে না। এই মুহূর্তের জন্য তার সহসা মনে হয়, সুলতানশাহী কী ভয়ংকর কুৎসিত। তার চারিদিকে কেবল অন্ধকার আর কেমন যেন একটা নিরন্তর যন্ত্রণা। যেন ভিতরে সব সময়, কতগুলো হিংস্র ধারালো নখ আঁচড়াতে থাকে।…'আচ্ছা, অন্যান্য সুলতানদেরও কি এরকম মনে হত না? তারাও কি এরকমই অনুভব করত না? কারণ, ন্যায় পথে, কজনই বা সুলতান হতে পেরেছে। তাদেরও নিশ্চয় চারপাশে নানা ষড়যন্ত্র, শত্রু ছিল। অথচ সুলতানশাহীর লোভ প্রতি মুহূর্তে হিংস্র করে তুলতো।'…

পরমুহূর্তেই মনে হয়, না, তাদের এসব কথা মনে হত না। বারবক একটা খোজা, সে বারবক বাঙালী, একটা ক্রীতদাস, খাওয়াজা-সেরা, তাই তার এসব কথা মনে হচ্ছে। সে ভীরু, সে সুলতান হবার যোগ্য নয়, তাই তার এসব কথা মনে হচ্ছে। যার মনের মধ্যে সুলতানের বাস, তার এসব চিন্তা আসে না। সুলতান-শাহীর কোন অস্বস্তি ভয়-ভাবনা দ্বিধা বিবেক থাকে না। ওসব ভুয়া, মিথ্যা। সুলতানশাহী তার ক্ষমতার জন্য সব কিছুই করবে। রক্তপাত থেকে শুরু করে অগ্নিকাণ্ড, কোন কিছুতেই তার থেমে থাকলে চলে না। ক্ষমতা, ক্ষমতা, ক্ষমতাই সব কিছু। ক্ষমতাই ঈশ্বর। খোদা, অল্-দীন, ওয়াল্-দীন। না, কোন দ্বিধা নয়, আলাউদ্দীন ফয়জল্লা কোথায়, তা এখনই দেখতে হবে। আর দেরি নয়।

বেলা প্রায় পড়ে এল। আজকের দিনটা মোটামুটি শুকনো, আশা করা যায়নি। ছড়ানো ছিটানো মেঘের গায়ে, বেলা শেষের রক্তিম আলো পড়েছে। লাল লাল মেঘগুলো দেখে মনে হয় যেন রক্তাক্ত মৃতদেহ ছড়ানো যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে, কেবল রক্তের নদী বইছে, রক্তাক্ত দেহগুলো পড়ে আছে। সেই রক্ত মেঘেরই ছায়া পড়েছে সৈনিকের মুখে। ঘোড়াগুলোর ঝলকানো চোখে, হাতির সোনা রুপোর হাওদায়।

বারবক আর কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করে না। কেল্লার দরজার কাছ থেকেই অভিবাদন গ্রহণ করে সে। সৈনিকদের দশ হাজার খোজার উল্লসিত জয়ধ্বনির মধ্যে বিদায় নিয়ে আসে। নগর প্রাকার ছাড়িয়ে, এখন তারা কেল্লার অপর শাহীমঞ্জিলের আলাদা প্রাকারবেষ্টিত এলাকায় প্রবেশ করেছে। এই এলাকার মধ্যেই, আমীর ওমরাহ, শাহীবংশের অন্যান্যদের প্রাসাদ ইমারত।

বারবকের সঙ্গে প্রায় হাজারখানেক সশস্ত্র নায়েক শাহীমঞ্জিলের দিকে এগিয়ে চলে। দুই দল অশ্বসওয়ারও তার মধ্যে আছে! অর্থাৎ কুড়িজন। দীদারকে বারবক নির্দেশ দেয়, 'নায়েকদের সবাইকে তাদের নিজেদের জায়গায় চলে যেতে বল। তুরুক সওয়ারদের থাকতে বল আমার সঙ্গে।'

হাওদায় মুখ বাড়িয়ে, চিৎকার করে সেই নির্দেশ জারি করল দীদার খান। নায়েকরা শাহীমঞ্জিলের দিকে গেল। বারবকের গলা যেন রুদ্ধ হয়ে এল, তার মুখটা ক্রমাগত ফুলে উঠতে লাগল, বলল, 'ইস্‌কান্দার ইমারত চল।'

শাহীমঞ্জিলের আলাদা প্রাকার, পরিখা এবং গড়। তার বাইরেই ইস্‌কান্দার ইমারত। সহসা যেন একটা স্তব্ধতা নেমে আসে। তুরুক সওয়ারদের চলার শব্দ কমে যায়, তারা ধীরগতি হয়ে আসে। ইসকান্দার ইমারতের সামনে, সুলতানের স্বর্ণখচিত হাওদাবাহী হাতি এসে দাঁড়ায়। শাহন ফীল্‌-এর ইঙ্গিতে হাতি হাঁটু মুড়ে বসে। বারবক মই বেয়ে নেমে এল। তার আগে, সুলতানের বর্ম আর তলোয়ার নিয়ে, রুবা নেমে এল। দীদার তার সঙ্গে। তুরুক সওয়ারেরা ইস্‌কান্দার ইমারতের চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল।

ইমারতের দেউড়িতে গিয়ে দীদার সুলতানের আগমন ঘোষণা করবার আগেই, বারবক পেঁছে যায়। 'আমি কি এখনো টলছি?' বারবক মনে মনে বলল। এখনো যেন সে টলছে। রুবার পিছনে পিছনেই বারবক ইমারতে ঢুকল। কোনদিকে দৃকপাত না করে, সে অন্দরমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ইমারতের প্রহরীরা কেউ বাধা দিতে সাহস পেল না। একজন খোজাকে সে নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'ফয়জুল্লা কোথায়?'

খোজা সেলাম করে জানাল, 'বিরামমহলে।'

এখানেও বিরামমহল। সবই শাহীমঞ্জিলের ধরনে তৈরি, ছোট আর বড়। উজ্জ্বল আর অনুজ্জ্বল। বারবক বলল, 'নিয়ে চল আমাকে।'

ইতিমধ্যে সুলতানের সশস্ত্র তুরুক সওয়ারের কেউ কেউ ইমারতে ঢুকে পড়েছে। সবাইকেই নিরস্ত্র হতে নির্দেশ দিয়েছে। রুবাকে সামনে রেখে বারবক ইমারতের বিরামমহলে এসে ঢুকল। বারবক অবাক হয়ে দেখল, সেখানে নাচ-গানেরই আসর চলছে। তখনও কয়েকটি নাচওয়ালী, গুটিকয় বেগম আর ফয়জুল্লার ইয়াররা বসেছিল। কিন্তু অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বারবককে দেখে, সবাই স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। সবাই তার দিকে তাকিয়েছিল। তারপরে যেন সহসা মনে পড়ে

গিয়েছে, এমনিভাবে সবাই উঠে, নিচু হয়ে কুর্ণিশ করল। কিন্তু ফয়জুল্লা তখনো বসেছিল।

বারবক প্রত্যেকটি মেয়ে পুরুষের মুখ ভালভাবে নিরীক্ষণ করল। আশ্চর্য, এদের কাউকে সে চেনে না। সকলেই অপরিচিত। বেগম বিবিরা যদি অপরিচিত হয়, হতে পারে। কিন্তু এইসব পুরুষ কারা? কোথা থেকে এসেছে?

সহসা দীদার খানের বজ্রগম্ভীর গলা, 'এখানে শাহ সুলতান শাহজাদা উপস্থিত হয়েছেন। ফরজুল্লা শাহ্, আপনি উঠে দাঁড়ান।'

ফয়জুল্লা বারবকের দিকে তাকিয়েছিল। তার দৃষ্টি বলছিল, সে একটা খোজা ক্রীতদাসের দিকে তাকিয়ে আছে। সে বলল, 'আমি বিবি বেগমদের নিয়ে, আমার বিরামমহলে রয়েছি। এ সময়ে—।'

দীদার খান আবার বলে উঠল, 'সুলতান শাহ্-ই-আলম আপনার সামনে।'

ফয়জুল্লা জিজ্ঞেস করল, 'কেন।'

মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা চকিত ঝলকে কী ঘটে গেল, কেউ দেখতে বা বুঝতে পারল না। সবাই দেখল, ফয়জুল্লার বুকে একটা ছুরি গিয়ে সজোরে বিঁধল। তার বুকের পোষাকের বাইরে কেবল একটা কারুকার্যখচিত সোনার ছুরির বাঁট। বাকীটা আমূলবিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। দেখা গেল, বারবকের কটিবন্ধের কাছে, ছুরির শূন্য খাপ রয়েছে। সে বলছে, 'সুলতানশাহীর তা-ই নিয়ম।'

বিবি বেগমদের মধ্যে কারা যেন আর্তনাদ করে উঠল। ফয়জুলা বুকে বেঁধা ছুরির বাঁট চেপে ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। পারল না, উপুড় হয়ে পড়ল। তার বন্ধুরা হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। বারবক বলল, 'না, কেউ ধরবে না।'

সবাই থমকে গেল। ফয়জুল্লা গালিচার ওপর পড়ে গেল। বিবি বেগমরা ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি কান্নাকাটি আরম্ভ করল। বারবক বলল, 'দীদার খান, দেখ তো।'

দীদার খান নিচু হয়ে ফয়জুল্লাকে দেখল। ফয়জুল্লাকে চিত করে শুইয়ে দিল। বলল, 'খতম।'

খতম। বারবক মনে মনে উচ্চারণ করল। সুলতানশাহীর আর একটা তৃষ্ণা মিটল। ক্ষমতা চাই, অপরিসীম ক্ষমতা। ক্ষমতার এক গণ্ডূষ তৃষ্ণার জল, এই মাহমুদশাহী বংশের একজনের রক্ত। উপায় নেই। সে বলল, 'এদের বলে দিও, মাহমুদশাহীবংশের সকলের সঙ্গেই যেন একেও কবর দেওয়া হয়। আর—আর

এদের সবাইকে বন্দীঘরে পাঠিয়ে দাও, সমস্ত পুরুষকে। বিবি বেগমদের হারেমে। ছুরিটা ওর বুক থেকে খুলে আমাকে দাও।'

দীদার খান ফয়জুল্লার বুক থেকে ছুরিটা টেনে বের করল, মৃতের পোষাকেই মুছে পরিষ্কার করল, তারপরে বারবককে দিল। বারবক ছুরিটা নিয়ে একবার দেখল। মনে মনে বলল, 'নিজের হাতে এই চারজন গেল। প্রাকার প্রহরী প্রথম, দ্বিতীয় ইফ্‌তিয়ার, তৃতীয় জলালুদ্দীন ফতেশা, চতুর্থ আলাউদ্দীন ফয়জুল্লা শাহ। উপায় নেই, সুলতানশাহীর এই নিয়ম।

বেরিয়ে আসবার সময় সে দীদার খানকে বলল, 'শাহীমঞ্জিলে আলো দিয়ে সাজাতে বল আজ।'

'জরুর।'

সন্ধ্যা রাত্রে শাহীমঞ্জিল আলো দিয়ে সাজানো হল। নতুন সুলতানের হুকুম, কোথাও একটু অন্ধকার থাকবে না। কোন অলিন্দে, কোন প্রকোষ্ঠে, শাহীমঞ্জিলের বিভিন্ন মহলে যাওয়া-আসার কোন গলি-পথে, বাগানে, তোরণদ্বারে, কোন রন্ধে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকবে না।

তবু যখন রাত্রি এল, বারবকের মনে হল, অন্ধকার যেন কিছুতেই কাটতে চাইছে না। শাহীমঞ্জিলে যে আগে এত অন্ধকার ছিল, তার ধারণা ছিল না। একি, আলো থাকলেই সবকিছুর ছায়া পড়ে। এবং সেই ছায়ায় অন্ধকার বোধ হয়। সে নিজে ঘুরে ঘুরে, যতই আলোর সংখ্যা বাড়ায়, ততই মনে হয়, অন্ধকার কিছুতেই ঘোচে না। যেন আলোগুলির প্রতিই তার ক্রোধ বাড়তে থাকে। ঘৃণা জন্মায় মনের মধ্যে। নিজের ছায়াটার দিকে তাকিয়েও তার বিরক্ত বোধ হয়। ছায়া পড়ে কেন ?

বিরামমহলের মসৃণ দেয়ালে, নিজের ছায়াটাকে সে কাছে দূরে ডাইনে বাঁয়ে নানাভাবে দেখল। যেন চেষ্টা করলে সরানো যেতে পারে। তারপর চীৎকার করে তওয়াচীকে (বাতিদারকে) ডাকল। তওয়াচী ছুটে আসতেই সে বলল, 'এই ছায়াটাকে যদি তুমি সরাতে পার, তবে তোমাকে মুঠো ভরে মোহর দেব।'

তওয়াচী থমকে দাঁড়িয়ে এই বিচিত্র কথা শুনল। এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'শাহ্-ই-আলম যদি এখানেই একটু দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি চেষ্টা করতে পারি।'

বারবক বলল, 'কর।'

তওয়াচী তৎক্ষণাৎ বাইরে গিয়ে আরো অনেকগুলি আলো নিয়ে এসে ছায়ার

সামনে দাঁড়াতেই ছায়া ঝাপসা হয়ে গেল, অদৃশ্য হল প্রায়। বারবক নিঃশব্দে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তার মুখটা ফুলে উঠল। সে মনে মনে বলল, 'সুলতানের হুকুম, ছায়াও নড়ে!'

তওয়াচীকে বলল, 'এই বাতিগুলোও ওখানে রাখ। কাল তোমার ইনাম পাবে।'

তওয়াচী মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সেলাম করে বিদায় নিল। তবু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে যেতে পারল না বারবক। এ কি তার পুরনো অভ্যেসের দায় কিনা, কে জানে। বহুদিন হল, এই শাহীমঞ্জিলে, তার মহলে মহলে ঘুরে ঘুরে কেটেছে। গতকালও সারা রাত্রি সে একটুও বসে নি। আজও সে বসতে পারছে না। শাহীমঞ্জিলের প্রতিটি অলিন্দ প্রকোষ্ঠ কক্ষ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে স্থির হয়ে থাকতে পারছে না।

সোনার পালঙ্কে, বিচিত্র বর্ণবাহার পট্টনে ও বালিশে এলিয়ে পড়ে, সোনার পেয়ালায় সে অনেক মদ খেল। সুশ্রী দর্শন যুবতী বাঁদীরা, সোনার বাটায় সুগন্ধি মিষ্টি পান দিল, রুপোর আলবাটি এগিয়ে ধরল পিক ফেলার জন্যে। কেউ পা টিপে দিল, কেউ হাত। চুল আঁচড়ে আঁচড়ে বিলি কেটে দিল। বৃহৎ ময়ূরের পাখা শীতল করল অঙ্গ। তবু চোখের পাতা কেন এক হতে চায় না? চোখের সামনে কেবলি অজস্র ছবি, অনেক মুখ যেন ভেসে চলেছে।

এক সময়ে সে হঠাৎ ডেকে উঠল, 'রুবা, হারেমে যাব।'

শিলাহ্দার তৈরী। সংবাদ গেল। নতুন খাওয়াজা-সেরা হুকুমমাত্রেই হারেমের দরজা খুলে দিল। বারবক হারেমে এসে ঢুকল। চারদিকেই দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। বারবক নিজেও দেখল, বেগমরা কোন কোন মহলে দল বেঁধে আড্ডা দিচ্ছিল। সুলতানের আগমন মাত্র যে যার নিজের মহলে চলে গেল। কোথাও কোথাও যন্ত্র-সংগীতে সুর বেজে উঠল। এক-আধ কলি গান। যেন সবই ঠিক আছে, সবকিছুই প্রত্যহের মতো চলছে, কোথাও কোন ব্যতিক্রম হয় নি।

কিন্তু বারবক কারুর মহলেই ঢুকল না। সে সোজা শাবেরা বেগমের মহলে গিয়ে উপস্থিত হল। দেখল, সেখানে দরজায় খোজা আছে, আলো আছে প্রচুর। কেবল শাবেরা বেগম বা তার বাঁদীরা কেউ নেই। বারবক শাবেরা বেগমের শয্যার সামনে এসে দাঁড়াল। শূন্য শয্যা। নতুন শয্যা রচনা করা হয়েছে। সুরাপাত্র, পানের বাটা, পিকদানি, সবই রয়েছে। বারবক ঝুঁকে পড়ে পালঙ্কের বিছানার

দিকে তাকাল। সেইখানটিতে তাকাল, যেখানে কাল রাত্রে ফতেশা শুয়েছিল সে একবার হাত দিয়ে ছুঁতে গেল, আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল। এবং সে নাসারন্ধ্র স্ফীত করে কোন গন্ধ পেতে চাইল। কিন্তু ফুলের এবং অন্য সুগন্ধির গন্ধ ছাড়া কিছুই পেল না। সরে এসে ঘরের মেঝের দিকে তাকাল। দেখতে দেখতে ঘরের আর একপাশে হেঁটে গেল।··· একটু পরে আস্তে আস্তে তার কুঞ্চিত ভ্রূ সহজ হল। ঘাড় নেড়ে ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে বলল, 'নেই, রক্তের দাগ কোথাও নেই।'

এই সময়ে শাবেরা বেগমের পায়ের নূপুর বেজে উঠল। বারবক চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, শাবেরা তাকে কুর্নিশ করছে। সুলতানকে কুর্নিশ করছে শাবেরা বেগম, ইহলোকে জলাল্লুদ্দীন ফতেশার শেষ শয্যাসঙ্গিনী। গতকাল রাত্রে সে হয়তো এমনি করেই ফতেশাকেও অভ্যর্থনা করেছিল। কয়েক মুহূর্ত যেন অবাক হয়ে বারবক শাবেরা বেগমের দিকে তাকিয়ে রইল।

শাবেরা বলল, 'দয়া করে বসুন সুলতান, বাঁদীর কী সৌভাগ্য!'

ঠিক যেমন গতরাত্রে বলেছিল, যেমন বলতে হয়, আর যা বলতে হয়, তাই তেমন করে বলল সে। বারবকের চোখের সামনে গতরাত্রের সেই দৃশ্যই ভেসে উঠল। ফতেশার গা থেকে সামান্য এক টুকরো কাপড়ে কোনরকমে নিজের নগ্ন দেহ ঢেকে শাবেরা বাইরে ছুটে গিয়েছিল, চীৎকার করেছিল। আজ রাত্রে সে এ মহলে নিশ্চয় প্রবেশ করে নি এ পর্যন্ত। আর এখন এইভাবে কথা বলছে। তাকে 'সুলতান' বলছে। শাবেরা বেগমের চোখের দিকে তাকাল বারবক। আজ নতুন দেখা নয়, এই হারেমে প্রায় চার বছর ধরে সে শাবেরাকে দেখছে। বয়স কুড়ি একুশের বেশী নয়। ফতেশার মেয়ে এর থেকে বড়। বিদেশিনী শাবেরা তুরস্কের মেয়ে, ওমরাহ য়ুগ্রাশ খানের উপহার। তুর্কী য়ুগ্রাশ খান শাবেরাকে উপহার দিয়েছিল সুলতানের হাতে। টকটকে রং, রক্তিম কপোল, কালো চোখ। বারবকের সঙ্গে অনেক দিন অনেক ঠাট্টা করেছে। অনেক অশ্লীল কথাবার্তা বলেছে। সিকান্দরের সেই তুর্কী খোজাটাকে দিয়ে অনেক বিকৃত বাসনা মিটিয়েছে। হারেমে এলেই সেসব শিক্ষা হয়ে যায়, অভ্যাসও হয়ে যায়।

বারবক দেখল, শাবেরার মুখখানি আজ সাদা, চোখে ভয়ের ছায়া। সে আস্তে আস্তে শাবেরার কাছে এসে দাঁড়াল। মেয়ে-মানুষ!···হাত তুলে মান্দারনের সন্ন্যাসিনীর দেওয়া সেই আংটি সে একবার দেখল। তারপরে হঠাৎ বলল, 'আমাকে তুমি সুলতান বলে মানতে পারছ শাবেরা?'

শাবেরা আবার কুর্নিশ করে বলল, 'আপনি শাহ্-ই-আলম।'

—আমি পৃথিবীপতি।

বারবক হঠাৎ হেসে উঠল। শাবেরার কাঁধে হাত রেখে হাসতে লাগল। এবং পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে উঠল হাসি থামিয়ে। ক্ষমতা, ক্ষমতাই সব! ক্ষমতাই ঈশ্বর, খোদা! এই শাবেরা, চোখে যার মৃত্যুভয়, কে জানে, ঘৃণাও হয়তো আছে, সে যাকে চিরকাল একজন সামান্য খোজা-কর্মচারী বলে জেনে এসেছে, তাকে সে আজ শাহ্-ই-আলম বলছে। একটা বিচিত্র দুর্বোধ অসুখের অনুভূতি। ক্ষমতার এত গুণ কেন? শাবেরা কাঁপছে, তবু মুখের হাসি বজায় রাখতে চাইছে, বারবককে খুশি রাখার জন্যে। ক্ষমতা কি হাতেম-তাই-এর জাদু?—তাই যদি, তবে বারবককে কি সে পুরুষত্ব ফিরিয়ে দিতে পারে না? যে পুরুষত্ব নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করা হয়েছে অথচ তার একটা অস্ফুট অনুভূতি রক্তের শিরায়, অন্ধকারে হাল্কা পায়ে যেন চুপি চুপি ফেরে। মান্দারনের জিম্মি সাধুনী তাকে কী করেছিল? সে তো প্রমাণ করেছিল, বারবক পুরুষ। সেই সাধুনী ছাড়া কি আর কেউ তা প্রমাণ করতে পারবে না, আর কোন অওরত।

শাবেরাকে সে সহসা তার প্রকাণ্ড দেহের মধ্যে টেনে নিল, এবং লুকিয়ে যেমন করে সে ফতেশাকে, তার পূর্বে সুলতান রুকনুদ্দীনকে, শামসুদ্দীন ইউসুফকে বেগম-দের গাঢ় আলিঙ্গনে চুম্বন করতে দেখেছে, তেমনি করল। তাতে তার দৈর্ঘ্যের জন্য জানু পেতে বসে পড়তে হল এবং হঠাৎ মুখ সরিয়ে নিয়ে, ভ্রূকুটি বিস্ময়ে শাবেরার মুখের দিকে তাকাল। দেখল, শাবেরার চোখে জল। তার বুকের মধ্যে শাবেরা কাঁপছে থরথর করে। শাবেরার দৃষ্টি পালঙ্কের দিকে।

বারবক শাবেরাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, এবং সেও পালঙ্কের দিকে তাকাল। শাবেরা তার হাঁটু দুটি ধরে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন সুলতান, আমার বড় ভয় করছে এ ঘরে!'

বারবকের তপ্ত ঠোঁট দুটি খোলা, সেখানে যেন ভোরের শিশিরের হিমস্পর্শ বোধ করছিল সে। শাবেরার ঠোঁট ঠাণ্ডা। ভোরের শিশিরের মতো ঠাণ্ডা। কিন্তু এখন সে ভাবছে এই ঠোঁট দুটিতে গতকাল আর একটি লোকের ঠোঁট মধুর সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এই ঘরে, ওই পালঙ্কে। সে এখন মাটির তলায়। তবু বারবকের যেন বুকের মাঝখানটায় কী একটা আটকে রয়েছে। সে শাবেরার ব্যবহারে রাগ করতে পারছে না। হারেমের সেই তুর্কী রসিকা মেয়েটির জন্যে যেন কষ্ট হচ্ছে একটা। আর এই ঘরের আবহাওয়াটা তার কাছেও যেন কেমন অস্বস্তিকর

বোধ হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখন কোথায় থাকছ ?'

শাবেরা বলল, 'আমি অন্য এক বিবির মহলে রয়েছি।'

বারবক বলল, 'তুমি খাসবেগমের মহলে থাক এখন। পরে কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।'

—সুলতানের অসীম দয়া। একটু সরাব দেব আপনাকে ?

—না।

—একটা পান ?

—না।

বারবক বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি। হারেম থেকে বেরিয়ে সে বিরামমহলের দিকে যেতে গিয়েই, সামনে জন্নতবুড়িকে দেখতে পেল। বুড়ি তাকে কুর্নিশ করছিল, বারবক বলে উঠল, 'তুমি এখানে ?'

জন্নতের দ্রুত নিঃশ্বাস বইছে, গলকম্বল কাঁপছে। বলল, 'কাঁটাদুয়ারের দরগার কথা মনে করিয়ে দিতে এলাম। ইসমাইল গাজীর দরগায় সুলতানকে ভেট পাঠাতে হবে না ?'

বারবকের মনে পড়ে গেল কাঁটাদুয়ারের কথা, দরবেশ মুহম্মদের কথা। সে বলল, 'কালই যাবে, ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করে আমি দরগায় ভেট পাঠাব। কিন্তু নানী, দরবেশকে আমার চাই। তাকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

—কী কথা ?

—এখন বলতে পারছি না।

যেখানে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, সেটা একটা আলোকিত গলিপথ। দু পাশে উঁচু প্রাচীর ঘেরা, হারেম থেকে বিরামমহলে যাবার পথ। একমাত্র সুলতানের আর তার খোজাদের যাতায়াতের রাস্তা। খোজা প্রহরীরা একটু দূরে দূরে রয়েছে। কয়েক পা আগে শিলাহ্‌দার রুবা।

জন্নত ফিসফিস করে বলল, 'একটা কথা শুনছি।'

—কী ?

—নয়া সুলতান নাকি পাগলের মতো ব্যবহার করছে।

—কেমন ?

—নিজের ছায়া দেখে দৌড়ুচ্ছে, ছায়াকে ভয় পাচ্ছে।

বারবক বলল, 'হ্যাঁ, অন্ধকার সইতে পারছি না। আলোর মধ্যে ছায়া পড়লে ভাল লাগে না। ছায়া মানেই অন্ধকার।'

জন্নত এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলল, 'বোকা, তাই বলে ছায়া কেউ সরাতে পারে নাকি ? মরণকে কি কেউ রুখতে পারে ? সব মানুষেরই ছায়া পড়ে, কারণ সব মানুষই একদিন যেমন মরবেই, তার ছায়াও তেমনি থাকে। কিন্তু তুই যদি এরকম করিস, সবাই তোকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে।'

বারবক তখন মনে মনে বলছিল, 'সবাই একদিন মরবে। মরবেই, তাই তাই, ছায়া—ছায়া—।'...সে ঘাড় ফিরিয়ে, সরু গলিপথের দেয়ালে নিজের ছায়াটাকে খুঁজল। দেখল ছায়াটা যেন এঁকেবেঁকে মেঝের দেয়ালে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। তার সামনে পিছনে পাশে আলো থাকার দরুনই সেরকম দেখাচ্ছিল। চুপিচুপি গলায়, সে বলে উঠল, 'নানী, মরণ আর ছায়া যদি একই হয়, তবে সে কি আমার পিছু পিছু ঘুরছে ?'

জন্নত বলল, 'দুনিয়ার তাবত মানুষের মরণ আছে। যেমন জন্ম আছে। যেমন মানুষের ক্ষুধা আছে, যেমন আসমানে তারা ফোটে, মেঘ হয়, বিজলী হানে, বাজ পড়ে—।'

—শুক্লাসপ্তমীর রাত্রে—!

বারবক বলে উঠল। জন্নত বুড়ি বলল, 'মরণ আছে সকলেরই। সুলতানের, ফকিরের, বনের বাঘের, গাছের পাখির!'

—অমোঘ, অমোঘ!

কিন্তু ইলিয়াসশাহী থেকে মাহমুদশাহী, কোন্ সুলতান বসে থেকেছে ? যে কর্ম করে যায় সৌভাগ্যকে সে বাকেল-এর হরিণের মতো হারায় না।

—বাকেল-এর হরিণ ?

—হ্যাঁ, জানিস না সেই কিস্সা ? এক ছিল বোকা, তার নাম বাকেল। সে একদিন একটা হরিণ কিনে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা। সে জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকায় কিনলে ?' সে এক হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে দিলে। অর্থাৎ পাঁচ টাকায়। তখন ওই লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলে, 'কত টাকায় বেচবে ?' বাকেল দু হাত তুলে দশটা আঙুল দেখাল। বোকা, হায় বোকা! ওর দু'হাত ছাড়া পেয়ে হরিণটা ছুটে পালিয়ে গেল।

—পালিয়ে গেল।

—পালিয়ে গেল, সৌভাগ্য যেমন করে পালায়।

বারবক সহসা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে, নিচু উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'আমি ধরে রাখব, আমি দু'হাত দিয়ে সেই হরিণটাকে ধরে রাখব।'

জন্নত বুড়ি ঘাড় নেড়ে বলল, 'ধরে রাখ, ধরে রাখ। জীবনমরণ অমোঘ, কিন্তু, দু'হাত তুলে যে হরিণ ছেড়ে দেয়, সেটা তার বুদ্ধির দোষ। ধরে রাখ, ধরে রাখ।'

—ধরে রাখব, ধরে রাখব নানী! কাল যাবে কাঁটাদুয়ারের দরগার ভেট। আমি যাই—।

—কোথায়?

—শাহীমঞ্জিলের দরজায়, ভেতরে বাইরে। আমি দেখতে চাই, কোথায় আছে সেই পুছনেওয়ালা 'কত টাকায় বেচবে!' শাহীমঞ্জিলের দরজায় আমি কোন ফাঁক রাখব না।'

বলতে বলতে সে এগিয়ে গেল। জন্নত বুড়ির চোখে আতঙ্ক, ভীত গলায় সে বলে উঠল, 'ওরে বান্দা, রাতের বেলা শাহীমঞ্জিলে আর তুই ঘুরিস না, আর যাস না!'

বারবক সে কথা শুনতে পেল না। সে এগিয়ে চলে গেল। তওয়াচীদের ডেকে, সঙ্গে নিয়ে, শাহীমঞ্জিলের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। পরীক্ষা করতে লাগল, প্রাসাদ সুরক্ষিত আছে কিনা।

কিন্তু সুরক্ষিত প্রাসাদের মধ্যেও, একটা অদৃশ্য হাতছানি ও তাড়না তাকে ঘুরিয়ে বেড়াতে লাগল। প্রতি রাত্রে সে প্রতিটি নায়েকের মুখের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দ্যাখে! নায়েক, সর্দার, উজীর, আমীরবৃন্দ সকলেই তার বন্ধু। ক্রমাগত, সমস্ত উচ্চপদে খোজা আর যত বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষীদের সে বসাতে আরম্ভ করেছে। যত অস্থিরতা বাড়ছে, ততই পুরোনো, প্রতিষ্ঠিত সম্মানীয় কর্মচারীবৃন্দদের সে সরিয়ে দিচ্ছে। শাহীমঞ্জিলের চেহারা বদলে গিয়েছে। কারণ, সে যেন প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছে ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হচ্ছে তার চারদিকে। যতই অনুভব করছে, ততই বুদ্ধিমান বিদ্বান নীরব উজীর-আমীরদের প্রতি তার ঘৃণা বাড়ছে। দরবারে বসেও সে কথা ঘোষণা করতে তার দ্বিধা নেই। তার মনে হয়, এরা সবাই তাকে অন্তরে অন্তরে অশ্রদ্ধা করে, অবহেলা করে। মাথা নুইয়ে আছে শুধু শক্তির পায়ে। যেদিন সুযোগ পাবে, সেদিন ছাড়বে না। তাই শাহীমঞ্জিলের প্রায় সমগ্র কর্মচারী বদল হয়ে গিয়েছে। তবু তার অস্থিরতা ঘোচে না। তার খোজা ও ভাগ্যান্বেষী বন্ধুদের সে ভয় তেমন করে না, কিন্তু সবাই

দিন-রাত্রি জুটের নেশায় এত মত্ত, নির্বিচার ভোগবাসনায় এতই মত্ত, মাঝে মাঝে চীৎকার করে গালাগাল দেয়। হাত তুলে আঘাত করে বসে। অথচ উপায় নেই, এই দলই তার ভরসা, তার আশা।

যত তার ভিতরে এই অসহায়তা নানান কল্পনায় আবর্তিত হয়ে উঠছে, ততই সোনার সরাবপাত্র তার একমাত্র বন্ধুর স্থান নিচ্ছে। সরাব! সরাব! সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, সরাব চলেছে একবর্গা দরিয়ার স্রোতের মতো। যতই চলেছে, ততই মস্তিষ্কের সঙ্গমে গিয়ে সরাবের স্রোত এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের ঘোর সৃষ্টি করছে। বিষ মন্থন করছে। এবং এমনি দুঃস্বপ্নের ঘোরেই সে একদিন রাত্রে সহসা প্রচুর আলো ও লোকজনসহ শাহীমঞ্জিলের বাইরে এক ছোট রাজকীয় প্রাসাদে ফতেশার খাসবেগমের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। দেখেছিল, নিঝুম পুরীতে বেগম একলা বসে বসে সরাব পান করছিল। শিশু শাহজাদা তখন নিদ্রিত। বেগমের চুল খোলা, পোষাক অবিন্যস্ত, চোখের কোলে গভীর কালি, দৃষ্টিতে এক অস্বাভাবিক তীব্রতা। বারবককে সহসা ঘরের দরজায় দেখে, বেগম চমকায় নি। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেসে উঠেছিল।

বারবক ভিন্নকক্ষে নিদ্রিত শিশুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে কচি সুন্দর মুখ। সুখী ও নিশ্চিন্ত। কেমন গভীরভাবে ছোট ছোট নিশ্বাসে, পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছিল। ফতেশার উত্তরাধিকারী! শিশুর ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল বারবক, হাত তুলে আলগোছে ন্যস্ত করেছিল কোমল গলার ওপর। তার প্রকাণ্ড হাতটা যেন শিশুর সর্বাঙ্গ ঢেকে পড়েছিল। আবার, সেই আগের মতোই, আবার তার কানে একটি ব্যাকুল নারীকণ্ঠের কান্নার ডাক শুনতে পেয়েছিল, 'সোনা মানিক!'…

সে বেরিয়ে এসেছিল। খাসবেগম তার সঙ্গে যায় নি। অন্য ঘরে যেমন বসেছিল, তেমনি নিশ্চল ছিল। বারবক দেখা দিতেই হেসে ফেলেছিল। এবং হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ঠোঁট বাঁকিয়ে বক্র হেসে, আপাদমস্তক দেখেছিল বারবককে। আরবী ছড়া কেটে বলেছিল, 'যে গাছের শিকড় নেই, তা সবুজ দেখালেই বা কী যায় আসে?'

বলে সেই আংটিটার দিকে তেরছা চোখে তাকিয়েছিল। একমাত্র আংটি, মান্দারনের বিধর্মী সন্ন্যাসিনীর দেওয়া। আর কোন আংটিই বারবক পরে না। তার বন্ধুরা, বাঁদীরা, হারেমের বেগমরা তাকে হীরে-জহরতের আংটি পরাতে চায়। তার মনে হয় আংটি পরলে হাত অচল হয়ে যায়।

বেগমের কথা শুনে বারবক নিবিড় অনুসন্ধিৎসু চোখে তার দিকে তাকিয়ে-

ছিল। বেগমের অবিন্যস্ত পোশাকের ফাঁকে, সম্ভবত মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই ঈষন্মুক্ত স্তনযুগল রক্তিম ডালিমসদৃশ বোধ হচ্ছিল। বেগম বয়স্কা, অথচ শাবেরার মতো তার দেহসৌষ্ঠব লক্ষিত হয়েছিল। নারীর অঙ্গের কোন ব্যাখ্যা জানে না বারবক। শাবেরা যুবতী, খাসবেগম প্রৌঢ়া, তবু তখন শাবেরার থেকেও যেন রসিকা তরুণী বলে বোধ হচ্ছিল তাকে। বারবকের রক্তকোষের অন্ধকারে যেন একটা অস্পষ্ট ধ্বনি বেজে উঠেছিল। সে মাথা নামিয়ে বেগমের বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছিল। আর বেগম এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে বঙ্কিম হয়ে, তার দেহকে স্পর্শ করেছিল। ফতেশার খাসবেগম!…জীবনসূত্রের এই বিচিত্র রহস্য বারবকের অনধিগম্য। সে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, 'আপনি খাসবেগমের মহলে এসে থাকুন। বাইরে কেন রয়েছেন?'

খাসবেগমের নিঃশ্বাসে পানের মসলার সুগন্ধি। বলেছিল, 'স্বামীহন্তার খাসবেগম? তা হয় না। তার চেয়ে সুলতান থাক খাসবেগমের এই মঞ্জিলে।

বারবক যেন আকণ্ঠ তৃষ্ণা বোধ করছিল বেগমের দিকে তাকিয়ে। সরাব ও তাম্বুল, উভয়ে সিক্ত বেগমের ঠোঁট, আর রক্তের মধ্যে সরাবের প্রগল্‌ভতায় রক্তিম হয়ে ওঠা বুকের মাঝখানে যেন ডুবিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, ফতেশার খাসবেগম বলে, নতুন সুলতান থাকুক তার মঞ্জিলে? জীবনরহস্যের বক্তা কোন্ দৈব ঘোষণা করছিল? সে হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'আপনার পেয়ালার সরাব পান করব, একটু দিন।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই স্বয়ং সুলতানের সরাবদার হিদ্‌না স্বর্ণভৃঙ্গার নিয়ে ছুটে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে সবসময়েই বারবকের সঙ্গে থাকত, যে কোন অবস্থায়। হিদ্‌না বলেছিল, 'সুলতানের সরাব আমার হাতে, সেজন্যে আমার বেয়াদপি মার্জনা করুন।'

হিদ্‌নার চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গিয়েছিল বারবক। বেগমের ভ্রূলতাও বেঁকে উঠেছিল। হিদ্‌নার চোখে নিষেধের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল। আবার সেই মুহূর্তেই একটি চিরকুট নিয়ে ছুটে এসেছিল অন্য এক খোজা। বারবক চিরকুট হাতে নিয়ে পড়েছিল, 'সুলতানের আর এত রাত্রে বাইরে থাকা উচিত নয়, অবিলম্বে শাহীমঞ্জিলে ফিরে আসুন।—আপনার চিরবান্দা দীদার খান।'

বারবক সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছিল। পেছন থেকে খাসবেগম মাতাল গলায় খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। কিন্তু বারবক তখন শুধু মনে মনে বলছিল, 'বিষ! বিষ!'

সুলতানশাহী যেন এক সুগভীর সর্পিল সুড়ঙ্গ। যতই ভিতরে ঢুকছিল, ততই যেন সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেড়ে উঠছিল। বারবক কাটাদুয়ারে কেবল ভেট পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয় নি। রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলায়, প্রদেশে প্রদেশে, সর-এ-লস্কর, জমিদার ঘৈর সহলী, মুহল্লা-এ-দীগার, সর-এ-খৈল, সকল কর্মচারী প্রধান ও শাসকদের কাছ থেকে বশ্যতাসূচক পত্র গ্রহণ করেছে। রাজ্যের সকল মহল থেকেই তার প্রতি আনুগত্য ঘোষিত। সুলতানী তখত্-এ তার নিশ্চিন্ত থাকার কথা।

তবু—তবু একটি মুখ সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল। একজনের নীরবতাকেই শুধু তার মনে হচ্ছিল যেন সিংহাসনের নিচে, বেদীমর্মের নিঃশব্দ বিষধরের মতো পড়ে আছে। গৌড় রাজ্যের সকলের ছবিই তার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়, সব ঘটনাকেই সে দেখতে পায়। কেবল একটা জায়গায় এসে তার দৃষ্টি থমকে যায়, মন চমকে ওঠে। তার স্নায়ুসমূহ বিকল হতে শুরু করে। অস্পষ্ট এবং বিচিত্র সব দুঃস্বপ্নেরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। শাহীমঞ্জিলের চারিদিকে সে তখন নিশির ঘোরে ঘুরতে থাকে। কী বলে, কেন হাসে, কেন রাগে আর·হঠাৎ থুতু ছিটিয়ে দেয়, বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ প্রহরারত খোজার হাত থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে, তাকেই জিজ্ঞেস করে, 'আমার দিকে তাকিয়েছিলি তুই?'

খোজা ভীত বিস্মিত স্খলিত স্বরে জবাব দেয়, 'না জনাব।'

—তাকাস নি?

ঠোঁট দুটি উল্টে সে মাথা নিচু করে যেন ভাবে, আর বলে, 'দুটো ধক্‌ধকে সাদা চোখ তবে আমি কোথায় দেখলাম?'

খোজার কাছ থেকে জবাবের প্রত্যাশা না করে, তলোয়ার ফিরিয়ে দিয়ে, নিজেকেই নিজে ধমকে ওঠে 'উজবুক। নিজেকে নিজে ভুলে যাই আমি! আমি সুলতান, সব কিছু আমার পায়ের তলায়! সব সব!'···

তবু এই অস্বস্তি কিসের? সবকিছুই তার কাছে সমর্পিত। রাজকোষাগারে ঢুকে সে টাকার ওপর বসে থেকেছে। গনীমা, অর্থাৎ লুণ্ঠিত অর্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঝম্-ঝম্ শব্দ শুনেছে। ঠাণ্ডা সোনার মোহরের গাদায় গাল চেপে থেকেছে, এবং তারপরে বিরক্ত বোধ করেছে, সবই তার! সে শাহ্-ই-আলম, সবকিছুই তার পায়ের নিচে। তবে সে কিসের জন্যে উৎকর্ণ। রাত্রে সে কোন শব্দের জন্যে কান পেতে থাকে।

বিরামমহলের নাচঘরে, ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে যখন ইরানী নাচের মোহ সঞ্চারিত হতে থাকে, গোপালী নেশা যখন ঢোকে ঢোকে, এক এক সময়ে তুর্কী

নাচের নিতম্ব দোলনে মেতে ওঠে, তখনই বারবক হঠাৎ দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ওঠে, 'রুখ্ যা, রুখ্ যা।'

নর্তকী দিশেহারা ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। সঙ্গত নিশ্চুপ। বারবক উৎকর্ণ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখে তীক্ষ্ম দৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত এইভাবে কাটবার পর, শাহীমঞ্জিলেও সে শুধু ঝিঁঝিস্বর শুনতে পায়। আস্তে আস্তে তার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে, আর ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'এত সহজ নয়। সাহস তোমার নেই। যদি থাকত—।'

বলতে বলতেই তার হাসি মুহূর্তে নিষ্ঠুর ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে যেন কারুর গলা টিপে ধরার ভঙ্গিতে বলে, 'এমনি করে তোকে খতম করে দিতাম।'

এমনি নাচের আসর থেকেই একদিন হঠাৎ সে, একটা খোলা তলোয়ার নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। হারেমের দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে সে, গোঙানো স্বরে বলতে লাগল, 'শুক্লাসপ্তমী আজ…শুক্লাসপ্তমী।'…

বলতে বলতে শাবেরা বেগমের মহলে বেগে ঢুকে পড়ল সে। খোজা কুর্নিশ করবার অবকাশ পেল না। দালান পার হয়ে, শয্যাকক্ষে গিয়ে ঢুকল। দেখল, বাতি জ্বলছে, পালঙ্কে বেগম শায়িতা। কিন্তু পাশে কেউ নেই।

আজ কেউ নেই পাশে। কিন্তু আজ শুক্লাসপ্তমী, আর এক শুক্লাসপ্তমী। বারবকের মস্তিষ্কের মধ্যে সারাদিন এই কথা আবর্তিত হয়েছে। মদ্যপান এবং নাচের আসরে মেতে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে হল, আজ শুক্লাসপ্তমী। মনে হওয়া মাত্রই, তার এক মাস আগের রাত্রির নিশি ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে। যেন আজই সেই রাত্রি।

কয়েক মুহূর্ত সে পালঙ্কের শূন্যস্থানের দিকে তীক্ষ্মচোখে তাকিয়ে রইল। তারপর বাইরে কান পেতে নিচুস্বরে বলল, 'বিজলী হাসে না, বাজ পড়ে না, মেঘ ডাকে না। তবে—?'

শায়িতা মূর্তির দিকে তার চোখ পড়ল। শাবেরা তো নয়! একটি অল্প-বয়সী মেয়ে, পোশাকে মোড়া জড়সড়। দু হাতে মুখ ঢেকে রয়েছে। কাঁপছে থরথরিয়ে। হয়তো মুখঢাকা হাতের ফাঁক দিয়ে বারবককে দেখতে পাচ্ছে। উজ্জ্বল শ্যাম রং, কচি স্বর্ণলতার মতো যেন দেহখানি। এখনো যেন অপুষ্ট,

বান্দা—৯

অপূর্ণ, পূর্ণিমার সবটুকু নিটোল হয়ে ওঠে নি। কে এ? এতো শাবেরা বেগম নয়।

—মুখ থেকে হাত সরাও।

বারবক নিচু গম্ভীর স্বরে বলল। হাত আস্তে আস্তে নেমে গেল, বুকের ওপরে ন্যস্ত হল। জোয়ারের প্রথম আবর্ত সে বুকে, দ্রুত নিশ্বাসে কম্পিত ভীরু করুণ বুকে হাতদুটি চেপে বসল। মুখ খুলল, কিন্তু চোখ বোজা। অতি রক্তাক্ত গোলাপের পাপড়ির মতো দীর্ঘপক্ষ্ম আয়ত চোখ বন্ধ। ভয়ে বুজে-যাওয়া চোখ। নাসারন্ধ্র স্ফীত, ঘন ঘন নিশ্বাসে কষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। ঠোঁটদুটি রংহীন, তবু রক্তাভা যায় নি। নাকের ধানীমুক্তা নোলকটি একপাশে এলিয়ে পড়েছে। হীরার নাকছাবি কাঁপছে। চুল আবাঁধা, ঈষৎ লম্বা মুখের চারপাশে সাপের মতো বেষ্টন করে আছে।

বারবক ভ্রূকুটি বিস্ময়ে দেখল। বলল, 'চোখ খোল।'

চোখ খুলে গেল! ভীত শঙ্কিত দুটি কালো মণি বিছানার দিকেই নিবন্ধ। একবার যেন চেষ্টা করল, চোখের পাতা তুলে তাকাতে। পারল না। বন্ধ হয়ে যেতে চায়, জোর করে খুলে রাখা।

বারবক বলে উঠল, 'কে তুমি?'

—মালতী।

একটি ভীরু বালিকা-স্বর উচ্চারণ করল। বারবক উচ্চারণ করল, 'মালতী?'

মেয়েটির ঘাড় ঈষৎ নড়ল। বারবক নিচু উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'তুমি উঠে বসতে পার না? তুমি আদবকায়দা কিছুই কি জান না? আমাকে কি তুমি চেন

মালতী নামধারিণী কিশোরী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। তাকাল বারবকের দিকে। জল এসে পড়েছে চোখে, আয়ত ডাগর চোখদুটি টলটল করছে। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে বলল, 'তোমাকে চিনি না।'

বাংলা বুলি বলল মেয়েটি। সুলতানকে বলছে 'তুমি'। অথচ আদেশ পালন করছে। এবং চোখে জল। প্রায় একহারা দীর্ঘ শরীর এখনো কাঁপছে। এমন সময়ে দরজায় বাঁদীর ছায়া নড়ে উঠল। বারবককে কুর্নিশ করে সে বলল, 'বেগম নয়া, পরশু এসেছে, শাহ-ই-আলমকে এখনো তাই চিনতে পারে নি।

নয়া বেগম! বারবকের সহসা মনে পড়ল, তার কাছে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল এই ছোট মেয়েটির সম্পর্কে। নতুন বেগম হারেমে এসেছে! এ সংবাদ

সুলতানদের কাছে মদের চেয়েও তীব্র আনন্দের। সংবাদ পাওয়ার দিনই সুলতান তাকে একবার দর্শন দেবেই। দুর্ভাগা শুধু বারবক! গত চার-পাঁচদিন হারেমে প্রবেশের কথা তার মনেই আসে নি।

বাঁদী বলল, 'সুলতানকে কুর্নিশ করুন বেগমসাহেবা।'

কিশোরী মেয়েটি চকিতে একবার তাকাল, তারপর একটু পেছিয়ে গিয়ে আদপ অনুযায়ী কুর্নিশ করল। করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু ইতিমধ্যে বারবকের দৃষ্টি সহসা আবার পালঙ্কের ওপরে নিবদ্ধ হল। নয়া বেগম মালতীর দিক থেকে তার চোখ সরে এসেছে। সে বাইরে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। হারেমের প্রাচীরের আড়ালে কোথাও শুক্লাসপ্তমীর চাঁদ ঢাকা পড়ে গিয়েছে। দেখল, তার দেহরক্ষী দুজন খোজা মালতী বেগমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বারবক ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। নয়া বেগমের ঘরে এসে সে ঢুকল আবার। নতুন মেয়েটি তেমনি দাঁড়িয়েছিল। বারবক তাকে প্রায় একবার প্রদক্ষিণ করে, বসবার ফরাসে আসন নিল। সেখানে সরাবের সোনার ঝারি ও পেয়ালা, সোনার পানের বাটা, রুপোর পিকদানি, মুখ দেখার মুকুর, সবই রয়েছে। সুলতানকে ঢুকতে দেখে, বাঁদী ভিতরে চলে গেল।

বারবক ডেকে বলল, 'এখানে এসে বস!'

মালতী ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল। বসল না। বারবক বলল, 'তোমার নাম মালতী কেন? বেগমের তো হিন্দু নাম থাকে না। তুমি কি হিন্দু?'

মালতী বলল, 'হ্যাঁ।'

—কী করে জানলে?

—আমাকে যে ডাকাতেরা ধরে নিয়ে এসেছে।

—সিন্ধুকীরা?

—হ্যাঁ।

—কতদিন আগে?

—গত বছর।

বারবক চুপ করে তাকিয়ে রইল। তার বুকের ভিতর সহসা যেন রক্তোচ্ছ্বাস বেড়ে উঠল। তারপরে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে, দ্রুত বলে উঠল, 'তোমার বাবা মা আছে?'

—আছে। বাবা মা ভাই বোন।

—তবে কেমন করে ওরা তোমাকে নিয়ে এল? কিনে নিয়ে এসেছে?

—না, লুট করে এনেছে। সন্ধ্যাবেলা, পুকুরঘাট থেকে চুরি করে এনেছে।

প্রায় পনর বছরের কিশোরী মালতী বলছিল আর যেন বিস্মিত সংশয়ে চোখ তুলে এক একবার বারবককে দেখছিল। শেষ কথা ক'টি বলতে গিয়ে, তার চোখ ফেটে আবার জল এসে পড়ল।

বারবক বিড়বিড় করে বলছিল, 'বাবা মা ভাই বোন!'...বলতে বলতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'যখন তোমাকে খুঁজে পায় নি তখন সবাই চীৎকার করে কেঁদেছে তো?'

মালতী সহসা বিবির পোশাকের ওড়না দিয়ে মুখ চেপে, ফুঁপিয়ে উঠল। কোন জবাব দিতে পারল না।

বারবক আবার প্রশ্ন করল, 'তোমার মনে আছে, কোথা থেকে তোমাকে এনেছে? কোন গাঁয়ে ছিলে তুমি?'

মালতী কান্নার স্বরে জবাব দিল, 'সুবর্ণপুর গাঁয়ের নাম। পাঁচ দিন নৌকায়, তিন দিন পাল্কিতে করে নিয়ে এসেছিল।'

—ফিরে যাবে সেখানে?

কিশোরীর মুখ থেকে ওড়না খসে পড়ল, জলে ভেজা চোখদুটি চকিত আলোয় ঝিলিক হেনে উঠল।

বলল, 'কোথায়? সুবর্ণপুর?'

—হ্যাঁ।

—বাবা-মায়ের কাছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। গাঁয়ে, বাবা-মায়ের কাছে, যাদের কাছ থেকে তোমাকে ধরে এনেছে?

মালতী কয়েক মুহূর্ত বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ কেঁদে উঠে মাথা নাড়তে লাগল। বলল, 'না না না, আর আমি ফিরে যেতে পারব না, আর আমাকে ফিরিয়ে নেবে না। এরা আমাকে যেখানে রেখেছিল, সেখানে কলমা পড়িয়েছে।'

বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল। ফরাসের নিচে মেঝেয় বসে পড়ে, উপুড় হয়ে কান্নার বেগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। দীর্ঘ রুক্ষ চুলের গোছা ঘাড় ও পিঠের পাশ দিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

বারবক করুণ চোখে দেখল। উঠে দাঁড়াল, আর আপন মনেই বলে উঠল, 'জিম্মিরা এইরকম! ফতেশা রাগ করে একজন হিন্দু উজীরের মুখে, ঠিক আমার মতোই থুতু দিয়ে দিয়েছিল। লোকটা তারপরেই আত্মহত্যা করেছিল! বেঁচে

থাকলে নাকি মুসলমান হতে হত। তাজ্জব! কেন এই নিয়ম?'...

মালতী তখনো কাঁদছিল। বারবক আসনে বসে তার পিঠে হাত রাখল। রাখতেই মালতী কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠে শক্ত হয়ে গেল, নিশ্চল হয়ে গেল। বারবক অবাক হয়ে চেয়ে রইল। হাত সরিয়ে নিয়ে এল আস্তে আস্তে। এবং নিজের হাতের দিকে দেখল।

মালতীও আস্তে আস্তে মাথা তুলল, এবং বারবকের দিকে তাকিয়ে, মেঝেয় ঘষটে ঘষটে খানিকটা পেছিয়ে বসল। তার চোখে আবার ভীরু সংশয়ের ছায়া নেমে এসেছে। বলল, 'কী?'

বারবক অবাক হয়ে বলল, 'কিছু নয় তো, তুমি কাঁদছিলে, তাই! তোমার কি ওরা কোন নাম রাখে নি, যারা তোমাকে কলমা পড়িয়েছে?'

—রেখেছে! খাদিজা বেগম।

—খাদিজা বেগম।

বারবক উচ্চারণ করল। তারপর মালতীর দিকে চোখ তুলে বলল, 'আমাকে তোমার ভয় করছে?' বারবক যখন উঠোনে গিয়েছিল, তখন বাঁদী নিশ্চয় কিছু শিখিয়ে দিয়েছিল। সে বলল, 'আপনি সুলতান।'

বারবক তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুনল। বলল, 'আমাকে সরাব দেবে?'

মালতী এগিয়ে এসে সোনার পেয়ালায় মদ ঢেলে দিল। বারবক বলল, 'তুমি খাবে না?'

মালতী বলল, 'ঘেন্না করে।'

বারবক পেয়ালায় চুমুক দিল। বলল, 'পান দাও।'

পান দিল মালতী। পান হাতে নিয়ে মুখে দিতে গিয়েও আবার বলল বারবক, 'আমাকে তোমার ভয় হয়?'

কিশোরী মালতী নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানাল, সে ভয় পাচ্ছে। বারবক করুণ চোখে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। তার চোখ রক্তাক্ত, তাই সম্ভবত তার করুণ-ভাব চোখে অন্যরকম দেখায়। মালতী বলে উঠল, 'শাহ্-ই-আলম, আমার ওপর রাগ করবেন না।'

ঠিক যেমন করে তোতাপাখি বুলি বলে, তেমনি করে ফারসী ভাষায় কথা ক'টি বলল সে। বারবক অবাক হয়ে তাকিয়ে, হেসে ফেলল। ঝারি তুলে গলায় মদ ঢালল। মালতীর চোখে ক্রমেই আরো ভয়ের উত্তেজনা ফুটতে লাগল।

বারবক বলল, 'আমাকেও নাকি একদিন কারা চুরি করে এনেছিল।'

সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে মালতী বলল, 'চুরি করে ?'

—তাই তো শুনি। আমার মনে নেই, ছেলেধরারা নাকি চুরি করে এনেছিল। আমি বাবা-মায়ের কথা মনে করতে পারি না, তাদের নাম জানি না, কোথা থেকে এনেছে সে জায়গার নাম জানি না। আমাকে যদি কেউ একটু বলতে পারত, আমি কে, আমি—।

বারবক চুপ করল, ঝারি উপুড় করে ধরল গলায়। ইতিমধ্যে কখন বাঁ হাতে সে পানটা চটকাতে শুরু করেছিল। রক্ত মাখার মতো লাল হয়ে উঠেছিল তার হাত। আবার বলল, 'তুমি যদি ফিরে যেতে চাইতে, আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিতাম।'

মালতীর যেন তখনো সন্দেহ ঘুচছিল না, সে সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে, তার আয়ত চোখদুটি আরো বড় করে বারবকের দিকে তাকিয়েছিল। ঈষৎ ঘুরে কাত করে, প্রকাণ্ডদেহী সুলতানকে সে যেন ঠিক চিনে উঠতে পারছিল না। বুঝে উঠতে পারছিল না। অনেকক্ষণ পর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি সুলতান নন ?'

বারবক ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'নিশ্চয় সুলতান !'

—তবে আপনাকে চুরি করে আনবে কেন ?

—ছেলেধরারা যে জন্যে চুরি করে। চুরি করে বিক্রি করে দেয়, বান্দার মতো। তুমি শোন নি, আগের সুলতানকে আমি মেরেছি, তারপর সুলতান হয়েছি ?

মালতী আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বলল, 'শুনেছি, কিন্তু এসব আমি বুঝতে পারি না।'

—পরে হয়তো বুঝবে।

বারবক ঝারি প্রায় শূন্য করে ফেলল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তার প্রকাণ্ড দেহের সামনে মালতীকে খুবই ছোট মনে হচ্ছিল। বারবক তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে দেখে কষ্ট হয়। আমি কী করব! তোমার জিম্মিরা তোমাকে নেবে না।'…

বারবক মালতীর দিকে না গিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দালানে চলে যাবার পর মালতী তার পিছনে পিছনে এল। বারবক উঠোনে নেমে গেল। আবার! আবার সেই মুখ ভেসে উঠল তার চোখে। যে মুখ এবং যার নীরবতাকে তার নিঃশব্দে কাছেপিঠে থাকা সাপের অস্তিত্বের মতো মনে হয়। সে হঠাৎ বলে উঠল, 'হাবশী হাস্না কোথায় ?'

জবাব এল, 'সে তো শাহীমঞ্জিলে এখন নেই জনাব, আপনার হুকুমে সে কখনো আর রাত্রে আসে না।'

বারবক বলল, 'কাল সকালেই তাকে আমার কাছে ডেকে পাঠাবে।'

বলতে বলতে সে বাইরে যাবার দরজার দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। পিছন থেকে মালতীর গলা শোনা গেল, 'আপনি চলে যাচ্ছেন ?'

বারবক ভ্রূকুটি করল একবার। তারপরে অবাক হল। বলল, 'হ্যাঁ। কেন, কিছু বলবে ?'

সংকুচিত জবাব এল, 'না।'

বারবক দরজা পর্যন্ত গিয়ে, ফিরে তাকাল। দেখল মালতী উঠোনে নেমে তাকে দেখছে। বারবক ফিরে এল। মালতীর সামনে এসে বলল, 'কিছু বলবে ?'

মালতী মাথা নেড়ে বলল, 'না। আপনি রাগ করেন নি তো ?'

কিশোরী বালিকা, সুলতানকে এইভাবে চলে যেতে দেখে ভয় পাচ্ছে। ভবিষ্যতে আবার কোন শাস্তি নেমে আসবে কি না, সেই ভয়ে ও সংশয়ে, দিশেহারা ছোট প্রাণ, এই সুলতানশাহীর পরিবেশে, এই দুর্জ্ঞেয় হারেমে, ধুকপুক করছে। সিন্ধুকীদের দ্বারা লুণ্ঠিত একটি গ্রাম্য মেয়ে, হারেমের বেগম হবার সৌভাগ্যে, বেগমের আদবকায়দা শিখতে এক বছরের মধ্যেই হয়তো অনেক বীভৎস নারকীয়তা দর্শন করেছে। সেই রাক্ষসীদের মতো শিক্ষয়িত্রীরা এই কিশোরী দেহ ও মনকে ভয়ঙ্করভাবে নিশ্চয় দলিতমথিত করেছে! সুলতান নামে এক জীবের পরিচয় সে সেখানেই পেয়েছে, যে-জীব অতিমানব। যার সামান্য বিরুদ্ধাচারণে কিংবা মনস্তুষ্টি না ঘটাতে পারলেই ভীষণ বিপদ উপস্থিত হতে পারে। বারবক তার ঘরে বসে, ঝারি থেকে মদ খেয়ে, কথা না বলে চলে যাচ্ছে, তাই সে ভয় পেয়েছে। ভেবেছে, সুলতান রাগ করেছে। হিন্দু কিশোরীটি কোন সুলতানের রাগের চেহারা কোনদিন দেখে নি। পরিচয় পায় নি। যদি পেত, তা হলে এভাবে উঠোনে এসে দাঁড়াত না। সে জানে না, সুলতানের ক্রোধ মানেই প্রলয়। এতক্ষণে কী ঘটে যেত, তার ধারণা নেই।

মালতীর চোখে বিস্ময় ও কৌতূহলের ছায়াও ছিল। যুবতীজনোচিত ব্রীড়া লজ্জা বা ভয়ের ভাব এখনো তার আসে নি। এখনো তার দেহ ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি নয়। এখন তার কূলে কূলে প্রস্তুতি আসন্ন প্লাবনের প্রতীক্ষা। কিন্তু তার সরল, শিশুর মতো আয়ত, চোখদুটিতে বিস্ময় ও কৌতূহলের মধ্যে একটি আশ্বাস ফুটে উঠেছে। একদিকে ভয়, আর একদিকে আশ্বাস। কারণ এক বছরের

অভিজ্ঞতায় সে জানত, আজ এই পুরুষটি তাকে ধর্ষণ করবে। সুলতানের উপস্থিতি মানে, তাই। অথচ বারবকের ব্যবহারে তার কিছুই দেখে নি সে।

বারবক বুঝতে পারছে, মালতী সংশয়ে পড়েছে তাকে নিয়ে। এ মেয়ে কী করে জানবে, বারবক কী ভাবছে। কেন সে এই মহলে এসেছে, কেন এই লুণ্ঠিত মেয়েটিকে দেখে তার করুণা বোধ হচ্ছে, আর কেন অন্যমনস্ক নীরবতায়, স্বপ্নঘোরে চলে যায়।

বারবক মালতীর হাত ধরল। নরম ঠান্ডা হাতটি যেন কাঁপছে বারবকের প্রকান্ড উত্তপ্ত থাবায়। সে বলল, 'রাগ করি নি তোমার ওপরে। চল, তোমাকে তোমার ঘরে রেখে আসি।'

হাত ধরে তাকে ঘরে নিয়ে গেল বারবক। বোঝা গেল, আবার মালতীর চোখে ঈষৎ ভয়ের ছায়া নেমে এসেছে। প্রাণধরে এখনো কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। সুলতানের এই ব্যবহারের মধ্যেও অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, তার ভয়ের মধ্যে সেই সন্দেহ ফুটে উঠেছে। যদিও আগের তুলনায় সে নির্ভয়, সহজ হয়ে এসেছে। এখন সে অসঙ্কোচে বারবকের দিকে দু' চোখ মেলে তাকাতে পারছে। আর এই ভীরু অবোধ চোখদুটির দিকে তাকিয়ে, স্বর্ণলতার মতো রং, পূর্ণিমাগামিনী অপূর্ণচন্দ্রের মতো মেয়েটির প্রতি সে যেন কী এক আশ্চর্য আকর্ষণ বোধ করছে। স্নেহে এবং সোহাগে বুকের কাছে নিবিড় করে নিতে ইচ্ছে করছে। মালতীকে দেখে, তার রক্তকোষের শিরায় শিরায়, অতি অস্পষ্ট ক্ষীণ একটি অপরিচিত পদধ্বনি যেন বাজছে। বুঝতে পারে না, সেই অপরিচিত অস্পষ্ট ক্ষীণ পদধ্বনি কার। কে সেখানে অর্ধমৃত মূর্ছিতের মতো চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। যেন তার শরীরের মধ্যে অতিক্ষীণ এক বিচিত্র অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলছে। নারীর সংস্পর্শে এলেই তার এই দুর্বোধ্য অনুভূতি জেগে ওঠে। অস্পষ্ট, অপুষ্ট, ক্রিয়াহীন। তার অস্তিত্বের একটা সংবাদ শুধু বেজে ওঠে।

মালতীকে ঘরে নিয়ে এসে, তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে, হাত তুলে সেই আংটিটি সে দেখল। মান্দারনের ডাইনীর মন্ত্রপূত আংটি রক্তজমানো পাথরে পুরুষের বীজ-চিহ্নে অঙ্কিত। আংটিটার দিকে তাকিয়ে সে মালতীর দিকে চোখ তুলল আবার। মালতীর চিবুকে হাত দিয়ে, মুখখানি তুলে ধরল। এবং রুদ্ধশ্বাস নিচু গলায় বলল, 'আমাকে—আমাকে ভয় পেও না।'

মালতী ঘাড় কাত করে বলল, 'আচ্ছা।' বারবক মালতীর নোলকে একবার আঙুল স্পর্শ করল, নাকছাবিটি স্পর্শ করল, এবং রক্তিম ঠোঁট দুটির ওপরে একবার বুলিয়ে দিল। মালতীর নিশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে এসেছে। সে দীর্ঘাঙ্গী, তাই বারবকের বুকের কাছ পর্যন্ত তার খোলাচুল মাথা উঠেছে। এখন তার দৃষ্টি বারবকের বুকের ওপর নিবদ্ধ। যেন একটা ভীরু সংশয়ের প্রতীক্ষা তার চোখে।

এই মুহূর্তে আবার হাবসী হাসনার মুখ বারবকের চোখের সামনে ভেসে উঠল। হাবশী হাসনা। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল সে, 'কেন—কেন এই হাবশীর মুখ আমার মনে পড়ছে?'

বিড়বিড় করতে করতে সে মালতীর দিক থেকে হঠাৎ ফিরে, বাইরের দিকে পা বাড়াল। মালতী বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'চলে যাচ্ছেন?'

অ্যাঁ?

বারবক দাঁড়াল, আবার ফিরে এল। মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন সে স্থান- কাল- পাত্র, সবই ভুলে গেল। হাসনা হাবশী আর মালতী এই উভয়ের মাঝখানটায় কয়েক মুহূর্ত একেবারে শূন্যতায় স্থির স্তব্ধ হয়ে রইল। এবং আস্তে আস্তে, তার দৃষ্টি আবার বর্তমানের ওপর ফিরে এল। জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তুমি কিছু বলছ?'

কিশোরী সঙ্কুচিত গলায় বলল, 'আপনি চলে যাচ্ছেন?'

বারবক অনেকটা আত্মগতভাবে বলল, 'জানি না। আমি কোথায় যেতে চাইছি, কেন যেতে চাচ্ছি, কিছুই যেন ঠিক বুঝতে পারি না।...তুমি—তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও? তোমার এখানে কোন কষ্ট নেই তো? তোমার বাঁদীগুলো সব ঠিক আছে? তারা তোমার কথা শোনে?'

মালতী বলল, 'আমার কোন কিছুর অভাব নেই?'

—কই, তোমার তো অনেক গহনা দেখছি না। হীরে মোতি মানিকের হার-চুড়, মাথার টায়রা, কিছুই যে নেই তোমার?

মালতী বলল, 'বাঁদীরা বলেছে, আপনি আমাকে সব দেবেন।

—দেব, গনীমার সিন্দুক খুলে, তোমাকে অনেক জিনিস পাঠিয়ে দেব।

—গনীমা কী?

—লুটের সম্পত্তি।

—গহনা পরে আমি কোথায় যাব?

বারবক অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাবে? হারেমের বিবিরা কোথায় যাবে?

হারেমের বিবিরা কোথাও যায় না।'

মালতী চুপ করে রইল। বারবক আবার বলল, 'আমি যদি কখনো দরগায় যাই, তোমাকে হাওদায় করে নিয়ে যাব।'

—হাতীর পিঠে ?

—হ্যাঁ।

—পড়ে যাব না ?

বারবক হেসে ফেলল। বলল, 'না, পড়বে কেন ? চারিদিকে ঘেরা থাকে যে।'

বলে সে মালতীকে বুকের কাছে টেনে নিল, নিচু হয়ে আলগোছে ঠোঁটের ওপর চুম্বন করল। মালতী হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল। বারবক জিজ্ঞেস করল, 'কী ?'

মালতীর মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখের পাতা নত হল কিন্তু বারবকের দেহ-সান্নিধ্য থেকে সরে যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নিচু স্বরে বলল, 'মদের গন্ধ।'

—ভাল লাগে না ?

মালতী ঘাড় নাড়ল। বারবক বলল, 'তুমিও একটু একটু খেলে গন্ধ পাবে না।,

মালতী চুপ করে রইল। বারবক আবার তাকে চুম্বন করল, এবং দু-হাত দিয়ে মাটি থেকে বুকের ওপর তুলে নিল। দু-হাতে কোমর জড়িয়ে, মুখের সামনে মুখ তুলে, চোখের দিকে তাকাল। মালতীর দৃষ্টি নত, দু-হাত স্খলিত, ঝুলে রইল। বারবক আবার তার মুখ চুম্বন করে, রেশমী জামার কিশোরী বুকে মুখ নামিয়ে নিয়ে এল। মুখ ঘষল। তারপর আস্তে আস্তে পালঙ্কের ওপর নিয়ে গিয়ে, শুইয়ে দিল। যেমন করে শোয়াল, মালতী তেমনি বরেই স্থির হয়ে শুয়ে রইল। আর নির্বাক অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল বারবকের দিকে। এখন আর তেমন আড়ষ্ট শক্ত নয় তার শরীর। মুখের চারপাশ জুড়ে তার সাপ'ল কালো চুল ছড়ানো। বারবক ঝুঁকে পড়ে তার গাল টিপে দিল, গায়ে হাত রাখল। অর্ধমৃত মূর্ছিত স্তিমিত সেই অচেনা অস্তিত্বের পদধ্বনি বাজছে তার রক্তে। আবার সে লাল রেশমী কাঁচুলির বুকে মুখ নামিয়ে নিয়ে এল। গন্ধ শুঁকল বুকের, তারপরে কান পেতে বলল, 'তোমার ভয় করছে ?'

মালতী অস্ফুটে বলল, 'না।'

—তবে বুকের মধ্যে এমন জোরে বাজছে কেন ?

মালতী বলল, 'জানি না।'

বারবক দেখল, মালতীর চোখ-মুখ সবই রক্তিম হয়ে উঠেছে। অথচ নিঃশ্বাস যেন পড়ছে না। বারবকের চোখের দিকে তাকিয়ে মালতী জিজ্ঞেস করল, 'কী ?'

বারবকও বলল, 'কী ?'

মালতী যেন ঠোঁট টিপে রইল। বারবক নিজেকে পালঙ্কের ওপর তুলে নিয়ে এসে, মালতীর পাশে শুতে যেতেই সহসা চমকে উঠল। যেন কেঁপে উঠল একবার। এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে নামল। মনে মনে বলে উঠল, 'ঠিক সেইখানে—সেইখানে শুতে যাচ্ছিলাম আমি, যেখানে ঠিক আগের শুক্লাসপ্তমীর রাত্রে আর একজন শুয়েছিল। আর একজন এমনিভাবেই শাবেরা বেগমের পাশে...।'বলতে বলতেই সে বাইরের দিকে ফিরে তাকাল। এবং আবার তার চোখের সামনে সেই হাস্‌না হাবশীরই মুখ ভেসে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ বাইরের দিকে এগিয়ে গেল।

মালতী আবারো বলে উঠল, 'চলে যাচ্ছেন ?'

তার গলায় যেন একটি সংকোচ-জড়ানো আবেগের স্বর ফুটে উঠল। কিন্তু বারবক তার কোন জবাব দিল না।

সে দ্রুতবেগে বিরামমহলে গেল। গিয়েই দীদার খানকে ডেকে পাঠাল। দীদার আসা মাত্রই বারবক বলে উঠল, 'কাল সকালেই হাস্‌নাকে ডেকে পাঠাবে আমার কাছে।'

দীদার খান বলল, 'যো হুকুম।'

তবু সে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, 'অভয় পেলে একটা কথা—!'

—বল ?

—হাস্‌নাকে হঠাৎ তলব কেন ?

—তাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করছে। তার মুখ আমার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে। কেন, আমি তা বুঝতে পারছি না। আমি রাত পোহালেই তাকে দেখতে চাই।

দীদার খান অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

পরদিন সকলবেলা হাস্‌না এসে অভিবাদন করল বারবককে। সারারাত্রি মদ্যপানের পর, তখন বারবক বিরামমহলে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিল। সংবাদবাহকের ঘোষণা শুনে রক্তাভ চোখের পাতা খুলতে না খুলতেই,

সে দেখল হাস্‌নার মুখ। হাবশী উজীর হাস্‌না তাকে অভিবাদন করছে। আস্তে আস্তে বারবকের চোখের পাতা পরিপূর্ণ উন্মুক্ত হল, এবং সহসা যেন চমকে উঠে, সোজা উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল, 'কে তুমি?'

হাস্‌না নতদৃষ্টিতে জানাল, 'আমি আপনার আশ্রিত হাস্‌না।'

—হাস্‌না!

বারবক বিড়বিড় করে কয়েকবার উচ্চারণ করল। কিন্তু তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হাস্‌নার প্রতি। কয়েক মুহূর্ত পরে তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। আবার পরমুহূর্তেই চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল। মনে মনে বলে উঠল, 'সেই জন্যে, সেই জন্যে এই মুখ আমার মনে পড়ছিল। এই মুখ, আসলে আমীর-উল-উমারা, জঙদার হাবশী মালিক আন্দিলের মুখ! যে সৈন্যসামন্ত সহ সীমান্তে রয়েছে হিন্দু রায়দের দমন করবার জন্যে। যে আজ পর্যন্ত বারবককে কোন বশ্যতাসূচক বা অভিনন্দন পত্র পাঠায় নি। যার নীরবতা দুঃসহ হয়ে উঠেছে।—এই হাস্‌না আসলে আন্দিলেরই ভাই, উচ্চতায়, চেহারায় আর সামনের দিকে বক্র দাড়িতে, চেহারাও প্রায় একরকমেরই। কিন্তু হাস্‌না নয়, তাকে আমি রোজ দেখছি বলেই, আসলে যে মুখ আমার চোখের সামনে থেকে থেকে ভেসে ওঠে, তার নাম মনে করে উঠতে পারি না। এই, এই হল আন্দিলের মূর্তির ছায়া। তাই বারে বারে হাস্‌নাকে মনে পড়ে।—কিন্তু হাস্‌না নয়, আন্দিল! আন্দিল! তার চুপ করে থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার চুপ করে থাকা যেন মসনদের নিচে লুকিয়ে-থাকা বিষাক্ত সাপের মতো। মালিক আন্দিলকে আমার চাই।'

হাস্‌নার চোখে ক্রমেই একটা ভীরু সংশয়ের ছায়া ফুটে উঠেছিল। বারবক হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'মালিক আন্দিলের কোন খবর জান?'

হাস্‌নার চোখদুটি যেন চকিত চমকে একবার ঝলকে উঠল। বলল, 'তিনি এখন সীমান্তে আছেন।'

—কোথায়?

—ঘোড়াঘাটে।

—আর খান জহান?

—বোধ হয় একসঙ্গেই আছেন।

বারবক বলল, 'মালিক আন্দিলকে আমি অনেকদিন দেখি নি। তাকে আমি দেখতে চাই।'

হাস্‌নার চোখে আতঙ্কের ছায়া। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'আপনার হুকুম হলেই—।'

কথা শেষ করবার আগেই বারবক বলে উঠল, 'এখুনি ঘোড়াঘাট সীমান্তে খবর দিয়ে লোক পাঠাও আমার হুকুম জানিয়ে। সে চলে আসুক।'

—এখুনি পাঠাচ্ছি।

হাস্‌না পুনরভিবাদন করে বেরিয়ে গেল। বারবক বারে বারে বলতে লাগল, 'আন্দিল! মালিক আন্দিল! তাকে—তাকে আমি—।'

কথা শেষ করল না সে। ছুটে গিয়ে দেয়াল থেকে তলোয়ার তুলে নিল। ইকরার খানের তলোয়ার, সুলতানের উপহার, সুলতানেরই শমন! কোষমুক্ত করে, চোখের সামনে সে তলোয়ার তুলে ধরল। আর চুপি চুপি বলে উঠল, 'হয় আন্দিলকে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে, অন্যথায় এই তৃষ্ণার্ত তলোয়ার আর একবার পিপাসা মেটাবে। আন্দিল! আমি অনেকদিন চুপ করে আছি। গর্তে সাপ আছে কিনা, তা আমাকে এইবার খুঁচিয়ে দেখতে হল।'—

আবার একজন অনুচরকে, ঘোড়াঘাটে পাঠিয়ে দেওয়া হল, যাতে আন্দিল আসছে কিনা, সেই সংবাদ আগেই পাওয়া যায়। রাত্রে নিজের বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শসভায় বসল বারবক। স্থির হল, আন্দিল এলেই, দরবার ডাকা হবে এবং সর্বসমক্ষে তার বশ্যতার কথা শুনতে হবে।

কিন্তু ভোররাতের দিকেই সংবাদ এল, আন্দিল আসছে, তবে একলা নয়। সীমান্ত থেকে তার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে তুলে নিয়ে আসছে। অর্থাৎ প্রায় বিশ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী নিয়ে সে আসছে।

বারবক বলে উঠল, 'যুদ্ধ চায় মালিক আন্দিল?'

দীদার খান বলল, 'যুদ্ধ যদি সে চায়, পাবে। আমরা অক্ষম নই। আসুক, আমরাও ইতিমধ্যে তৈরি হই।'

বারবক জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে তৈরি হবে?'

দীদার বলল, 'শাহীমঞ্জিলের বাইরের তোরণের সীমানা থেকে আমরা চারদিক ঘিরে রাখব।'

বারবক মাথা নেড়ে তারিফ করে বলল, 'ঠিক তাই। তবে যদি আন্দিল

দরবারে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাহলে শাহীমঞ্জিলের খোলা আঙিনায় দরবার বসবে। আমি চাই, 'সেই দরবার ঘিরে রাখবে বারো হাজার নায়েক আর খোজা।'

পরদিন সকালেই আন্দিল গৌড়ে প্রবেশ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে সুলতানকে খবর পাঠাল, নির্দেশমাত্রই সে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু প্রাণভয়ের সন্দেহে সে একলা আসতে পারেনি, তাই সসৈন্যে এসেছে, মাত্র আত্মরক্ষার জন্যে। তাকে যেন আশ্বাস দেওয়া হয়।

বারবক হেসে উঠে, আপন মনেই বলল, 'প্রাণভয়! আন্দিলের?'

সে বিশ্বাস করতে পারল না। তবু পূর্বব্যবস্থা মতোই, শাহীমঞ্জিলের প্রাঙ্গণে দরবার আহ্বান করে, সেখানেই আন্দিলকে উপস্থিত হতে বলা হল। আন্দিল অনুমতি চাইল, অন্তত একশ' সৈন্য নিয়ে যেন তাকে দরবারে যেতে দেওয়া হয়। তাকে সেই অনুমতিই দেওয়া হল।

মালিক আন্দিল যখন দরবারে এল, তখন বারো হাজার সৈন্যের একটি ত্রিকোণ দেয়াল বারবককে ঘিরে ছিল। বারবক জানত, এই আন্দিলকে ফতেশা সন্দেহ করেই সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মালিক আন্দিলের চোখে, বারবক তার নিজের স্বপ্নের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছিল। এই সৈন্যবাহিনী তাই শুধু আত্মরক্ষার্থে নয়, সুলতানী ক্ষমতা প্রদর্শনও বটে। সকলেই যে তার কাছে নতিস্বীকার করেছে, এই কথা জানাবার জন্যে।

বারবক সিংহাসনে বসেছিল, কোলের ওপর তার খোলা তলোয়ার। মূল্যবান পোশাক আর মুকুট তার অঙ্গে ও মস্তকে। সে হাবশী আন্দিলের চোখের দিকে তাকিয়েছিল দূরে থেকে। এই বিশাল দরবারসভায় সবাই দাঁড়িয়েছিল, কেবল বারবক ছাড়া।

আন্দিল দূর থেকেই কুর্নিশ করতে করতে এল এবং বেদীর নিচে নতজানু হয়ে নিয়ম-তান্ত্রিকভাবেই খাপ থেকে তলোয়ার খুলে মাটিতে রাখল। বারবকের শিরায় বেগে রক্তস্রোত বইতে লাগল। একবার দীদার খানের দিকে চকিতে তাকাল, আর নিজের কোলের ওপরে তলোয়ারের প্রতি দৃষ্টি হানল। কিন্তু নিজেকে সে শান্ত করল। ডাকল, 'মালিক আন্দিল।'

আন্দিল চোখ তুলে বারবকের দিকে তাকাল। বলল, 'আদেশ করুন।'

—তুমি জান, আমি জলালুদ্দীন ফতেশাকে হত্যা করেছি।

—আমি শুনেছি।

—এবং আমি সুলতান হয়েছি তার জায়গায়।

—আমি তাই দেখছি।

—এ বিষয়ে তোমার অভিমত ?

আব্দিল আরবী ভাষায় প্রথমে একটি ছড়া কেটে বলল, 'যিনি সুলতান, তাঁকে সবই মানায়।' তারপরে বলল, 'আমীর কখনো সুলতানকে সুলতান হওয়ার বিষয়ে কোন কথা বলতে পারে না। আপনি সুলতান, আমি শুধু এই জানি।'

বারবক কোলের ওপর থেকে তলোয়ার নিয়ে, পাশে রেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি জানি, ফতেশাকে তোমার হত্যা করার মতলব ছিল।

আব্দিল বললে, 'দয়া করে আপনিই সেই কাজ করেছেন।'

—কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

—কী প্রতিজ্ঞা ?

—কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তুমি কখনো আমাকে হত্যা করবে না।

মালিক আব্দিলের হাবশী কালো মুখ নীরেট পাথরেব মতো দেখাল। তার ঈষৎ রক্তাভ চোখের কটা মণি চকিতে একবার আপাদমস্তক বারবককে দেখল। তারপরে কোরান ছুঁয়ে বলল, 'আপনি যতক্ষণ এই মসনদে আছেন, ততক্ষণ আপনার দেহে আমি অস্ত্রাঘাত করতে পারি না, করবও না।'

বারবকের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে নেমে এসে আব্দিলের কাঁধে হাত রাখল। দীদার খানকে যেভাবে নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই পূর্বপরিকল্পনা মতো, তূর্যনাদ ধ্বনিত হল। মালিক আব্দিল যদি বারবককে মেনে নেয়, তবে তাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করা হবে, এই স্থির ছিল। তূর্য ও শঙ্খনাদের মধ্যে ঘোষক ঘোষণা করল, শাহ-ই-আলম খলীফৎ-আল্লাহ্ শাহ্ সুলতান শাহজাদা, আমীর জল্-উমারা মালিক আব্দিলকে প্রীতি ও সুখের সঙ্গে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁকে দশটি তেজী ঘোড়া, দুটি হাতি ও সোনায় মোড়া কাবাই উপহার দিচ্ছেন এবং একটি মণিমুক্তাখচিত দুষ্প্রাপ্য তলোয়ার নিজের হাতে মালিক আব্দিলকে দান করছেন।'—

সভাসদেরা সকলেই সাধুবাদ দিল। অন্যান্য উপহারের আগে বারবক সেই সুদৃশ্য তলোয়ারটি একজন খোজা প্রহরীর হাত থেকে নিয়ে আব্দিলকে দিল।

সভাভঙ্গের পর, বারবক প্রচুর মদ্যপান করে বিরামমহলে শুয়েছিল। সে যেন স্বপ্নের মধ্যে বিড়বিড় করে, আব্দিলের প্রতিজ্ঞাভাষণ উচ্চারণ করছিল। করতে করতে সহসা লাফ দিয়ে উঠে বলে উঠল, 'যতক্ষণ আপনি সিংহাসনে আছেন, এ কথার মানে কী? যতক্ষণ আমি সিংহাসনে আছি! তবে এখন, এই মুহূর্তে যদি সে আমাকে দেখতে পায়?'

বারবক তাড়াতাড়ি দীদার খানকে ডেকে পাঠাল। সব শুনে দীদার খান বলল, 'হ্যাঁ, আপনি এই প্রতিজ্ঞাই করিয়েছেন আব্দিলকে দিয়ে। কিন্তু তাতে ভাববার কী আছে? আব্দিল এই শাহীমঞ্জিলে কখনোই বিনানুমতিতে ঢুকতে পারবে না।'

বারবক অবাক হয়ে হেসে উঠল। বলল, 'আশ্চর্য, আমি সে কথাটা ভুলেই গেছলাম। শাহীমঞ্জিলে সে ঢুকবে কেমন করে?'

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, বারবকের মনে হল, শাহীমঞ্জিলের আবহাওয়ায় যেন একটা নতুন কিছু ঘটছে। বড় বেশী নিঃশব্দ মনে হয় প্রাসাদকে। সে যেন চারদিকেই ফিসফিস কথা শুনতে পায়। সবাই যেন বড় বেশী পা টিপেটিপে চলে। যার চোখের দিকেই তাকায়, প্রথমেই সহসা তাকে অচেনা বলে বোধ হয়। চমকে ওঠে, চিনে উঠতে পারে না।

মালতীর কাছে সে রোজই একবার করে যায়। মালতীর সঙ্গে প্রথম দেখা হবার পর থেকে আরো একমাস পূর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে মালতী বারবকের প্রতি আশ্চর্যরকম অনুরক্ত হয়ে উঠেছে। এখন সে অনেক কথা বলে, হাসে। বারবক চুপ করে থাকলে, হাত ধরে টেনে কথা জিজ্ঞেস করে। নিজের হাতে তাকে সরাব তো দেয়ই, বারবক অনুরোধ করলে, এক-আধ চুমুক খেয়েও ফেলে। বারবক ভালবাসে বলে সে পাকা পান (ছাঁচি) খেয়ে ঠোঁট রাঙায়। বারবক যে খোজা, হারেমে বাস করে, সংবাদটা জেনেও তার রহস্য সে আজও কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না। মালতী, কিশোরী মালতী নিজেকেই বা কতটুকু চেনে। বারবকের সোহাগে আদরে যখন সে আপ্লুত হয়ে ওঠে, তখন তার মনে হয়, কী যেন বাকী থেকে যায়, কী একটা প্রত্যাশা যেন মেটে না। বারবকের বিশাল শরীরে সে অগাধ জলের মীনের মতো ভেসে বেড়ায়। তবু যে কী একটা তৃষ্ণায় তার কিশোরী প্রাণ কাতর হয়, কিন্তু তৃষ্ণা মেটে না। তখন অবুঝ মালতী এই বিরাট দেহধারী লোকটির কণ্ঠলগ্ন হয়ে নানাভাবে নিজের ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। ব্যাকুলতা অভিমানে রূপান্তরিত হয়, তারপর রাত্রে দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়।

বারবক বুঝতে পারে, তাই সে অন্যান্য বেগমদের বিকৃতবাসনা চরিতার্থতার পদ্ধতি অবলম্বন করতে যায়। কিন্তু মালতী, প্রকৃতির সৃষ্টি অপরূপ কিশোরী, যে সত্যি একজনকে পুরুষ ভেবে, প্রেমিক ভেবে, ভালবেসেছে, তার কাছ থেকে বিকৃত ব্যবহার গ্রহণ করতে চায় না। সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, অবাক হয়। তার প্রাণে যে মুহূর্তে ফুল ফুটেছে, সেই মুহূর্ত থেকেই তার দেহও যেন চকিতে মুকুলিত হয়ে উঠেছে। সে বারবকের কোলে মুখ রেখে বলে, 'আপনি আমাকে ভালবাসেন না।'

সে কথার কোন জবাব দিতে পারে না বারবক। সে পালিয়ে যায়। তবু মালতী ছাড়া, আর চারদিকেই যেন বাতাসে বিষের গন্ধ। শাহীমঞ্জিলে সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। মাত্র দু' মাস অতিক্রম করেছে, সে সুলতান হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সব যেন কেমন মৃত বলে মনে হচ্ছে তার চারপাশে। তার প্রিয় বন্ধু ও অনুচরদের চেহারা যেন তার কাছে আজকাল অন্যরকম লাগে। তাদের হাসির মধ্যে কী একটা যেন আছে, সে ঠিক বুঝতে পারে না। হিন্দুনা ছাড়া, হাবশী বাতিদার বাশীকে নিয়ে সে সবসময়ে রাত্রে চলাফেরা করে। তবু সে চমকে ওঠে। প্রতিমুহূর্তেই তার মনে হয়, পিছনে আশেপাশে যেন কার পায়ের শব্দ বাজে। রুবাকে সবসময়ে সে পাশে পাশে রাখে না। সে নিজেই এখন তলোয়ার নিয়ে ফেরে। কারণ, হিন্দুনা তাকে বলেছে, শাহীমঞ্জিল নাকি মালিক আন্দিলের অনুচরে ভরে গিয়েছে। যদি তাই যায়, তাহলে বিশ্বাস করতে হয়, দীদার খান, আবদুল্লা, মুন্না খাঁ সকলেই মালিক আন্দিলের দলে যোগ দিয়েছে। হিন্দুনার নাকি সন্দেহ হয়, স্বয়ং মালিক আন্দিল শাহীমঞ্জিলের প্রাসাদে ওত পেতে থাকে।

যেদিন থেকে বারবক একথা শুনেছে, সেদিন থেকে সিংহাসনযুক্ত দরবারকক্ষই তার সারারাত্রির বাসস্থান হয়ে উঠেছে। মদের ঘোরে যদি বা সে প্রাসাদের কোন অংশে যায়, তাহলে সহসা কোন ছায়া দেখলে ভয় পায়। চীৎকার করে ওঠে, 'কে? কে ওখানে? জবাব পেয়েও সে তৎক্ষণাৎ ছুটতে ছুটতে এসে সিংহাসনের ওপর লুটিয়ে পড়ে। পরে হাঁপাতে হাঁপাতে চুপি-চুপি বলে, 'খবরদার! এখন আমি সিংহাসনে, সিংহাসনে!'...

এখন বন্ধুদের ডাকলে সে সবসময়ে কাছে পায় না। সুলতান হয়েও সে একেবারে একলা হয়ে গিয়েছে। বন্ধুদের যেমন কাছে পায় না, ক্রমাগত তার বিশ্বাসও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। সকলের ব্যবহারের মধ্যেই সে যেন ছলনার ছায়া দেখতে পায়।

একদিন হঠাৎ তার মনে হল, একজন প্রহরারত নায়েক তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ তলোয়ার দিয়ে নায়েকটির মাথা কেটে ফেলল। চীৎকার করে বলল, 'আমি সুলতান। এখনো সুলতান!'

কিন্তু পরমুহূর্তেই কাটামুণ্ডুটা তুলে সে চীৎকার করে বলল, 'এটা সইদুলের মাথা!'

কে একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ হুজুর, ওটা সইদুলের মাথা।'

—সে এক সময়ে আমার নায়েক ছিল। আমার সুলতান হওয়ার জন্যে সে আমার দলের লোক ছিল।...

পরে হিদ্না জানাল, সমস্ত নায়েকরাই বর্তমানে মালিক আন্দিলের ঘুষখোর। অতএব সুলতানের দুঃখ করার কিছু নেই। কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধে। যদিও বারবক জানে, সুলতানশাহীর আবহাওয়ায় অবিশ্বাসের কিছুই নেই। এবং সেই অবিশ্বাসকেই সে আড়াই মাস পূর্ণ হবার আগেই একদিন প্রত্যক্ষ করল।

হতাশা যত বাড়ছিল, বারবকের সরাবের মাত্রাও ততই বাড়ছিল। এখন সে সকাল থেকেই সরাব পান শুরু করে। যতক্ষণ অচৈতন্য না হয়, ততক্ষণ পান করে।

আজও সেইভাবেই সারাদিন কেটেছে। সন্ধ্যার অনেক আগেই মত্তাবস্থায় সে সিংহাসনের ওপর এসে এলিয়ে পড়েছিল। বাশী তওয়াচী এসে বাতি দিয়ে গেল সিংহাসনের স্তম্ভের গায়ে। বারবক জড়ানো গলায় বলল, 'বাশী, দেখ তো আমি মসনদের ওপরেই আছি তো?'

বাশী বলল, 'হ্যাঁ শাহ-ই আলম।'

—শোন বাশী:

—আদেশ করুন।

—তুমি খোজা।

—হ্যাঁ।

—আমিও। আমিও জানি, খোজারা হল সুলতানশাহীর শিকার।

বাশী নিশ্চুপ। বারবক আবার বলল, 'বাশী, আমি তোমাকে উজীরের আসন দেব। আমি...বুঝলে বাশী—আমি তোমাকে...।'

আর কথা বলতে পারল না বারবক। অত্যাধিক মদের ঘোরে সে সিংহাসনের সোনার হাতলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। উপুড় হয়ে পড়ে, দুলতে লাগল। হাবশী দেখল, দেখে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সিংহাসনের পিছন থেকে একটি মূর্তি বেরিয়ে এল। দেয়ালের গা থেকে পর্দা টেনে সে নিজের দেহকে ঢেকে রেখে, নিবিষ্ট চোখে বারবককে দেখতে লাগল। বারবক তেমনি দুলছে। মূর্তি তার মুখ আলোর কাছে নিয়ে আসতেই দেখা গেল, মালিক আন্দিল। তার এক হাতে পর্দা ধরা, আর এক হাত তলোয়ারের হাতলে। সেই তলোয়ার, বারবকের উপহার! যদি পড়ে যায়! যদি বারবক পড়ে যায় সিংহাসন থেকে, তবে আজই সব শেষ। কোরান ছুঁয়ে শপথ করেছিল আন্দিল, তাই এখন সে বারবককে আঘাত করতে পারছে না। সে অনেক দিন সত্যি ওত পেতে থেকেছে। কিন্তু সুযোগ পায় নি। বারবক তার ভাগ্য নিয়ে, ঠিক সিংহাসনের ওপরেই রাত্রিবাস করে।

আজও সেই একই অবস্থা। অথচ আজ বারবক হাতলে দুলছে। একটু ধাক্কা দিলেই পড়ে যায়। একবার হাত তুলল আন্দিল। আবার আস্তে আস্তে ফিরিয়ে নিল। দুলছে না। স্থির হয়ে গিয়েছে। আন্দিল পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে, বেদী থেকে নামতে উদ্যত হতেই, ধপাস্ করে শব্দ হল। তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরেই দেখল, বারবক সিংহাসনের নিচে পড়ে গিয়েছে। দেখা-মাত্র কোষ থেকে তলোয়ার খুলে নিল সে। এবং এই তলোয়ার খোলার সামান্য শব্দেই বারবক চকিত চোখ মেলে দেখল, তার মাথার ওপরে উদ্যত কৃপাণ। চোখের পলকে সে আন্দিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আন্দিল আঘাত করার সুযোগ পর্যন্ত পেল না। তার হাত থেকে তলোয়ার ছিটকে পড়ে গেল। আর ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল।

দুজনের ধস্তাধস্তিতে ধাক্কা লেগে স্তম্ভের আলো নিভে গেল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। বারবক বলে উঠল, 'হাবশী, তোকে আমি ফিরে যেতে দেব না।'

প্রচণ্ড শক্তিধর বারবক আন্দিলকে মাটিতে ফেলে, বুকের ওপর চেপে তার গলা টিপে ধরল। আন্দিল বারবকের চুল টেনে ধরে চীৎকার করে উঠল, 'য়ুগ্রাশ! য়ুগ্রাশ খান!'

অন্ধকারে য়ুগ্রাশ খানের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। গলার স্বর শোনা গেল, 'বলুন মালিক আন্দিল।'

রুদ্ধ গলায় আব্দিল বলল, 'খোজা শুয়োরের বাচ্চাটাকে তুমি তলোয়ার দিয়ে আঘাত কর।'

বারবক বলে উঠল, 'তুমি য়ুগ্রাশ, তুমি বীর, আর এই হাবশীও বীর, তোমরা আমার সঙ্গে লড়, পিছন থেকে মের না।'

য়ুগ্রাশ সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'কিন্তু মালিক আব্দিল আপনি ওর তলায়, ওকে তলোয়ার বিঁধলে আপনার লাগবে।'

আব্দিল বলে উঠল, 'লাগবে না, লাগবে না। ওর বিরাট শরীর, আমাকে ঢালের মতো ঢেকে আছে, শীগ্‌গির মার, নইলে আমাকে ও মেরে ফেলবে।'

—মেরে ফেলব।

গর্জন করে উঠল বারবক, আর সেই মুহূর্তেই তার পিঠে তলোয়ারের কোপ পড়ল। কয়েকবার পড়তেই, বারবকের হাত শিথিল হয়ে গেল। সে ইচ্ছে করেই হঠাৎ আব্দিলের ওপর থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, এবং সর্বাঙ্গ এলিয়ে পড়ে রইল। আব্দিল উঠে কয়েক ঘা লাথি দিয়ে বলল, 'মরে গেছে। চল তাড়াতাড়ি সবাইকে খবরটা দিই।'

য়ুগ্রাশ বলল, 'চলুন।'

ওরা চলে যেতেই রক্তাক্ত বারবক টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বুঝতে পারল, সিংহাসনের সামনে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। যতটা কম আঘাত সে মনে করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী আঘাত লেগেছিল। তখন সে বেদীর অদূরেই দেয়ালের কাছে চলে গেল হামাগুঁড়ি দিয়ে। দেয়ালের গায়ে যে পর্দা ছিল, তাই টেনে নিয়ে নিজেকে আড়াল করল। কাউকে ডাকতে তার সাহস হল না। যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে সে দেয়ালের গা ঘেঁষে, পর্দার অন্তরালে কাত হয়ে পড়ে রইল।

সেই মুহূর্তে আবার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বারবক পর্দা ঈষৎ সরিয়ে চোখ বের করে দেখল, বাতি হাতে বাতিদার বাশী আসছে। বাশী নিচু আতঙ্কিত স্বরে বলছে, 'কী একটা যেন ঘটেছে! আমার মনে হচ্ছে, দুশমনেরা আমার সুলতানকে মেরেছে।'

বাতি নিয়ে সে চারদিক দেখতে দেখতে আবার বলে উঠল, 'এই তো রক্ত! আ খোদা তা হলে সুলতান নেই?'

—আছি।

বারবক বাশীকে বিশ্বাস করে বলে উঠল, 'বন্ধু তওয়াচী, আমি বেঁচে আছি। তুমি তাড়াতাড়ি আমার দলের লোকদের খবর দাও। আন্দিল যেন শাহীমঞ্জিল ছেড়ে না যেতে পারে। আমি এখনো, এখনো তার সঙ্গে লড়তে রাজী আছি। শীগ্‌গির দীদার খান, মুন্না খাঁদের খবর দাও।'

বাশী বারবককে দেখে বলে উঠল, 'হায় খোদা, কী ভয়ঙ্কর! আমি এখনি খবর দিচ্ছি জনাব।'

সেখানে বাতি রেখে বাশী ছুটে বেরিয়ে গেল, এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই তার সঙ্গে আন্দিল আর য়ুগাশ খান এসে ঢুকল। তাদের পিছনে হাসনা হাবশী খান আর সিদ্দিবদর। স্বয়ং বাতিদার বাশীর হাতেও খোলা তলোয়ার! সকলের হাতেই মুক্ত কৃপাণ। সবাই এসে পর্দা সরিয়ে, বারবককে ঘিরে ধরল।

বিশাল শরীরে বারবক চিত হয়ে, সকলের দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকাল। বাশীর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল সে। অস্ফুটে একবার উচ্চারণ করল, 'তুমি—বাশী—।'

আন্দিল চীৎকার করে বলল, 'হানো।'

একসঙ্গে ছয়টি তলোয়ার বারবকের চওড়া বুকে আমূল বিদ্ধ হল। বারবকের চোখ একবার দীপ্ত হল, তারপরে আধ-বোজা হয়ে রইল। ঠোঁট ফাঁক করে সে বলতে যাচ্ছিল, 'আমাকে সবাই মিলে—'তার আগেই তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

বাশী চীৎকার করতে করতে প্রাসাদের ভিতর ছুটে গেল। একটি বাসনা, একটি আকাঙ্ক্ষা, একটি অবুঝ বিক্ষোভ এবং চেতনা ও বুদ্ধিহীন প্রতিবাদ রক্তাক্ত হিম হয়ে পড়ে রইল সিংহাসনকক্ষে। সিংহাসনটা সোনায়, পাথরে, অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছিল।